সারা আকাশ

আদান প্রদান

সারা আকাশ

রাজেন্দ্র যাদব

অনুবাদ

নন্দিতা মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ভূমিকা

রাজেন্দ্র যাদবের 'সারা আকাশ' উপন্যাসটি জনপ্রিয় হয়েছিল। একাধারে সৃজনশীল উৎকর্ষ এবং জনপ্রিয়তার এমন সমন্বয় খুব কম রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়। অনেক উপন্যাসের নাম করা যেতে পারে যেগুলি সৃজনশীল প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোনটিরই এতবার সংস্করণ হয়নি। অবশ্য স্বল্পদৈর্ঘ্য কথাচিত্র রূপায়ণও এর জনপ্রিয়তায় কিছুটা সাহায্য করেছে, একথাও ঠিক।

'নতুন যুগের গল্প' লেখার ক্ষেত্রে খ্যাতনামা কথাশিল্পীদের মধ্যে অনেকেই আবেগ প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েও, প্রায়ই বেশ আবেগে গদগদ কাহিনী নিজেরাই লিখে থাকেন। অথচ রাজেন্দ্র যাদব তরুণ বয়সেই 'সারা আকাশে'র মত পরিণত মনস্ক উপন্যাস লিখতে পেরেছেন। এটা সত্যিই বিস্ময় ও আনন্দের বিষয়। এ প্রসঙ্গে এটিও স্মরণ রাখা দরকার যে, 'সারা আকাশ' উপন্যাসের নায়ক নায়িকা তরুণ বয়সী, তাদের হৃদয় সে কারণে আবেগ মথিত। এই অল্পবয়সী আবেগপ্রবণ তরুণজীবনের বাস্তবচিত্র আঁকতে হলে পরিণত সাহিত্যিক-দক্ষতা প্রয়োজন। আনন্দের বিষয় রাজেন্দ্র যাদব বেশ তরুণ বয়সেই এই দক্ষতা আয়ত্ব করেছেন। অনুমান করা যায়, সংবেদনশীল দৃষ্টি আছে বলেই তিনি এ ক্ষমতা পেয়েছেন। প্রখর সংবেদনশীলতার ধারা যখন ব্যাপ্তি লাভ করে তখনই সৃজনীপ্রতিভার মধ্যে বিশ্লেষণীক্ষমতার সমাবেশ সম্ভব হয়। ব্যাপ্তির প্রাথমিক সর্ত হচ্ছে চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক। যে কোন সাহিত্যকৃতিতে চরিত্র সংখ্যা কত সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কই সেক্ষেত্রে আসল ব্যাপার। সেই সম্পর্কগুলিকে কীভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে, চরিত্রগুলির মনের বাসনা, চেষ্টা, সে সবের পারস্পরিক অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা, বিভিন্ন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, এবং সেই দ্বন্দ্বের বাস্তবনিষ্ঠ চিত্রন — এইগুলিই একটি রচনাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। 'সারা আকাশ' সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে কয়েকটি বিষয় আমার মনে হয়েছে। সে সব নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার।

লেখক ঠিকই বলেছেন, 'এটি মূলতঃ নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের এক যুবকের অস্তিত্ব সংঘর্ষের কাহিনী'। 1952 সালে এই উপন্যাস প্রথম ছাপা হওয়ার সময় এর নাম ছিল, 'প্রেত বোলতে হ্যাঁয়'। 1960 সালে তা 'সারা আকাশ' নামে প্রকাশিত হয়। 1952 সালের কাছাকাছি সময়ে যে সব হিন্দী উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল তার পটভূমিকায় বিচার করলে এই উপন্যাসটির গুরুত্ব বুঝতে সুবিধা হবে। সেই সময়ে রাজনৈতিক উপন্যাসের লেখক বলতে যশপাল, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে ইলাচন্দ্র যোশী, অজ্ঞেয় প্রমুখ প্রসিদ্ধ ছিলেন। জৈনেন্দ্রকুমার তখন খ্যাতির শীর্ষ আসন থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন। ভগবতীচরণ বর্মার 'চিত্রলেখা' তখন বেশ বিখ্যাত। অন্যদিকে পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'বাণভট্টের আত্মকথা' ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। জৈনেন্দ্রের পরেই, হিন্দী উপন্যাসের ক্ষেত্রে, তখন যশপাল, অমৃতলাল নাগর এবং 'ভগবতীচরণ বর্মা'র নাম তখন শ্রেষ্ঠদের দলে। ধর্মবীর ভারতীর 'গুনাহোঁ কা দেবতা' আর রামেশ্বর শুক্ল 'অঞ্চলে'র 'চঢ়তি ধূপ' প্রেমের কাহিনী হিসাবে তখন তরুণ বয়স্ক পাঠকদের আকর্ষণের বিষয়। কিন্তু সেসব ছিল কিশোর সুলভ আবেশে ভরা সস্তা প্রেমের গল্প। প্রেম বিষয়ে কোন জটিল পরিস্থিতির চিত্রণ সেখানে একেবারেই ছিল না।

এই রকম অবস্থায় 'সারা আকাশ' নিয়ে এল এমন এক কাহিনী, যাতে পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নানা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে অবতারণা করা হয়েছে প্রেমের। সেই সময় সাধারণত সাহিত্যে ঘরসংসার এবং প্রেম এই দুটি বিষয়কে একেবারে পৃথক করে রাখা হত। কিন্তু 'সারা আকাশে'র বিশেষত্ব এইখানেই যে, সংবেদনশীল দৃষ্টি ও শিল্পবোধ নিয়ে লেখক এখানে পরিবার জীবনের মধ্যেই প্রেমকে এনেছেন। সেই পরিবারজীবন আবার একেবারেই আদর্শস্থানীয় নয়,— তা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অভাবগ্রস্ত সংসারযাত্রার নানাবিধ সমস্যার বিভীষিকায় ভরা। সেই সব বিভীষিকা থেকে উদ্ভূত বিচিত্র মনোবিকার এবং পরিবারের সদস্যদের কারো কারো আদর্শবাদিতা অথবা নীচতা ইত্যাদি সবকিছু মিশেলে এই উপন্যাস একটি পরিবারের একান্ত বাস্তবনিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য।

নানা রকম সমস্যায় ভরা এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র হল — সমর। তাকে ঠিক চিরাচরিত ধাঁচের নায়ক বলা চলে না। হিন্দী কথা সাহিত্যে, অন্তত সেই সময়ে সমরের মধ্যে এক সম্পূর্ণ নতুনধরণের নায়ককে দেখা গেল। তার চরিত্রে এমন সব বৈশিষ্ট, যা তাকে অনায়াসে প্রতিনায়ক বা এ্যান্টি-হিরো করে ফেলতে পারে। বীর নায়কসুলভ কোন রকম গুণই তার নেই। সে দ্বিধাগ্রস্ত, পরস্পরবিরোধী মনোবিকারের মধ্যে সদা দোদুল্যমান। বেকার, নিরাপত্তাবিহীন এবং সম্ভবত সেই কারণেই নিতান্ত অস্থিরমতি ও দুর্বলচিত্ত। তাই এমন যুবককে সেসময়ের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী নায়ক বলা চলে না।

'সারা আকাশে'র আখ্যান অংশে এই নতুনত্ব, এই দ্বিধা ও স্থৈর্যের সমাহার খুব

স্পষ্ট। সেইজন্যই নায়ক এবং আখ্যান দুইয়ের মধ্যেই অস্থিরতা বর্তমান থাকলেও পরস্পরের মধ্যে বিরুদ্ধতা নেই। এমন সংবেদনশীলতা ও শিল্পগুণের মিশ্রণে কাহিনীটি পূর্ণতা পেয়েছে। একদিকে আশা, উচ্চাকাঙক্ষা এবং অন্যদিকে আর্থিক, সামাজিক ও সংস্কারগত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ক্লান্তি, পরাজয় আর দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে করে একটি প্রার্থিত পথ খোঁজার ব্যাকুল প্রয়াসের কাহিনী এই উপন্যাস। (পঁচিশবছর পরে এখন এই কাহিনীর তাৎপর্য হয়তো আরো বেশী!)

'সারা আকাশ' প্রেমের কাহিনী, সম্পূর্ণভাবেই সাম্প্রতিক সাহিত্যে প্রেমের নামে যে সব কথাসাহিত্য চলছে, সেগুলি অধিকাংশই যেন একহারা সুতোয় গাঁথা, ঠিক ঠিক পাঠকের মন ভরাতে পারে না। কিন্তু দাম্পত্য প্রেমকে ভিত্তি করে লেখা 'সারা আকাশ' পরকিয়া প্রেমের চেয়েও বেশী আকর্ষক ও মর্মস্পর্শী হয়েছে। প্রেম ব্যাপারটির দীপ্তি যে ফুলঝুরির চমক নয়, বরং তা মানবিক, সামাজিক ও যথেষ্ট দায়িত্বশীল আচরণ, সেটি বুঝতে হলে 'সারা আকাশ' পড়া দরকার। সত্যি বলতে কি, এই সাহিত্যকৃতিকে মানবতা, সমাজ সচেতনতা এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ অন্বেষণের এক প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। সে প্রক্রিয়া একান্ত ব্যক্তিগত। কেবলমাত্র একটি পুরুষ ও একটি নারীর মধ্যে সেই প্রক্রিয়া ঘটলেও তাকে সেই সঙ্গে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রক্রিয়াও হতে হয়। দাম্পত্য প্রেমকে সেকেলে জিনিস বলে যাঁরা বিদ্রুপ করেন, তাঁরা অনুল্লেখ রাখেন দাম্পত্যজীবনের পথে বন্ধুরতার কথা। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে দাম্পত্যপ্রেম অর্জন করতে হয় কঠোর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তা অনেকের সারাজীবন নাগালের বাইরেই থেকে যায়। এই ব্যর্থতার কারণ—চিরাচরিত প্রথা, সংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের দাসত্ব। 'সারা আকাশে'র লেখক এই সত্যের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। সুখের বিষয়, ঐ সব কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে রাজেন্দ্র যাদব মনে মনে পোষণ করেন তীব্র ঘৃণা। তিনি প্রথমে এই উপন্যাসের নাম হয়ত তাই রেখেছিলেন, 'প্রেত বোলতে হ্যাঁয়'— নামকরণের মধ্যেই রয়েছে সেই ঘৃণার পরিচয়। ঐ ঘৃণা আজও তাঁর অন্তরে তীব্র। আজও তিনি নারী এবং দলিত সমাজের সমস্যা নিয়ে ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত। 'হংস' পত্রিকায় সম্পাদকীয়গুলি পড়লেই একথা স্পষ্ট হয়। 'সারা আকাশে'ও এ সবেরই ইঙ্গিত। এই উপন্যাসকে নারীবাদী রচনা অবশ্য বলা চলে না, তবু এ কথা মানতে হয়, এ রচনার মধ্যে নারীবাদ সম্পর্কিত বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

এ এমন এক প্রেমের গল্প যেখানে পরিস্থিতি পাত্র পাত্রীকে কাছাকাছি হবার কোন সুযোগই দেয় না, বরং ক্রমাগত তাদের প্রেমের বিপরীত স্রোতে নিক্ষেপ করে চলে। যেন কঠিন কোন পাথরের স্তরের অনেক নীচে রয়েছে প্রেমের বীজ। সেই পাথরকে ভেদ করে প্রেমকে অঙ্কুরিত হতে হবে পল্লবিত হতে হবে। সমরের জিদ, ক্রোধ, বিরক্তি, অস্থিরতার অতলে রয়েছে প্রেম, সেখানেই তা একটু একটু করে বিকশিত হয়ে উঠছে। 'সারা আকাশে' এই প্রেম ভাবনা অত্যন্ত বাস্তবনিষ্ঠ। অনুকূল নয়, বরং প্রতিকূল

পরিবেশে যতই তাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চলেছে ততই সে বিকশিত হয়ে উঠেছে নানা বর্ণে।

এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার বি.এ. পাঠরত কিশোর সমরের দাম্পত্য প্রেমের গল্প এটি। সমর 'রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘে'র সদস্য। পুরাতণ আদর্শে সে অটল বিশ্বাসী। সে ব্রহ্মচারীর মত জীবন যাপন করার স্বপ্ন দেখে। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও তার দ্বিধা নেই। অথচ জোর করেই তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল প্রভার সঙ্গে। পরিবারে পঁচিশ টাকা পেনশন্‌ভোগী রিটায়ার্ড পিতা, আর মা। কেরানী বড়ভাই, বৌদি, ছোটভাই এবং শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িতা ছোটবোন মুন্নী। এই স্বামী পরিত্যক্তা বোনের উপস্থিতি 'সারা আকাশে'র কাহিনীতে একটি গভীর অর্থবহ মাত্রা এনে দিয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের অন্তঃসারশূন্য মর্যাদাবোধকে বিভিন্নদিক থেকে এই উপন্যাসে এত উন্মুক্ততায় চিত্রিত করা হয়েছে যে, সেই মর্যাদাবোধের অসহায়তা এবং নির্বোধ মূর্খতা হয়ে পড়ে অত্যন্ত স্পষ্ট। নববিবাহিত কিশোর কিশোরী স্বভাবতই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা ঘটে না। কেন তা ঘটে না বা ঘটল না সেই প্রক্রিয়াই 'সারা আকাশে'র কাহিনীর মূলে এবং এই অন্বেষণই উপন্যাসকে গভীর ব্যাপ্তি এনে দিয়েছে।

বিয়েতে মত ছিলনা। সে আরো লেখাপড়া করতে চেয়েছিল, ব্রহ্মচারী থাকতে চেয়েছিল — সারা বিশ্ব জেনে গেল, আজ ফুলশয্যার রাত। যে এতদিন শ্লোগান দিত — 'দেশের জন্য প্রয়োজন সাহসী আর কর্মঠ যুবক' সে আজ অকেজো। যে সমর ঝড়বৃষ্টিতেও কখনও বাড়ি বসে থাকত না, সে আজ দুসপ্তাহ শাখাতে যায়নি, একথা কেউ বিশ্বাস করবে? বিবাহ তার জীবনে হয়ে উঠল একটা বিঘ্ন। অথচ হনুমান আর ভীষ্মপিতামহ প্রদর্শিত পথে সে চলতে চায়। ফুল শয্যার রাতে দ্বিধাদীর্ণ সমর মনে মনে সঙ্কল্প করে — 'হ্যাঁ, এইসব বাধা বিপদ গুঁড়িয়েই আমি এগিয়ে চলব। আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকার যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা আমি এখনও দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে চলব।'

নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুযুবকেরা জ্ঞান হতে না হতেই ব্রহ্মচারী হওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে ফেলে। ব্রহ্মচর্যের এই স্থান বহুদিন পর্যন্ত সমাজে প্রবল ছিল। এখন এক ব্রহ্মচারীর বিবাহ হল। ফুলশয্যার রাত্রি থেকেই উপন্যাসের শুরু।

কিশোর মনের এমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব লেখক খুব সহজভাবে চিত্রিত করেছেন। সমরের জিদ এবং সেই জিদের তলায় চাপা পড়া মানসিক দুর্বলতা মাঝে মাঝেই উপন্যাসে উঁকি দিয়ে যায়। এই 'দুর্বলতা'ই সমরের ব্যক্তিত্বকে সহজ, সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করেছে। সমরের অতিরিক্ত আদর্শবাদ যেন বিকলাঙ্গ ব্যক্তিত্বকে সংশোধন করার জন্য। সমরের অহংকারবোধ এবং প্রভার উপস্থিতিতে উৎপন্ন চাঞ্চল্যের দ্বন্দ্বকে রাজেন্দ্র যাদব নিপুন দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সারা আকাশে'র স্বগতোক্তিগুলি গুরুত্বপূর্ণ। সংলাপের ঠিক একতরফা উক্তি যেন

ভিতর থেকে কথা বলেছে দুটি মন। আর সেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে পারিবারিক, সামাজিক এবং আর্থিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি। এক মন দৃঢ়ভাবে বলছে, 'আমি আজও অটল থাকব আমার সেই আজন্ম ব্রহ্মচারী ব্রতের প্রতিজ্ঞায়'। সঙ্গে সঙ্গে আর এক মন বলে উঠেছে, 'কেন বাপু, স্ত্রী কি সব সময় স্বামীর পথের বাধাস্বরূপ? রামের শক্তিকে কি সীতার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব? রাজস্থানের ক্ষত্রিয় নারীরা নিজের হাতে সাজিয়ে তাঁদের পতিদের যুদ্ধে পাঠাতেন না?' এক সময় সমর নিজের মনের সুস্থ স্বভাবিক প্রবৃত্তিকে ভাবছে দুর্বলতা অথচ এই দুর্বলতাই তার মনের সহজ সরল অনুরাগ প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি নিঃশব্দে ঘুমিয়ে ছিল তার অন্তরে। কাহিনী যত এগিয়েছে এই প্রবৃত্তি জেগে উঠে সমরের চেতেনাকে একটু একটু করে ছেয়ে ফেলেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিয়েছে পূর্ণতায়।

পরিবার কি? এতো এক কারাগার। যারা এরমধ্যে আছে তাদের তো অপরাধীর জীবন। প্রথা, অন্ধবিশ্বাস আর লোক দেখানো রীতিনীতি ওদের কষে বেঁধে রেখেছে। এই কারাগার থেকে মুক্তির কোন পথ নেই। সবার মধ্যে জমছে তীব্র পারস্পরিক বিদ্বেষ। কিন্তু চিরাচরিত প্রথার শৃঙ্খলগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের হাল্কা করতে পারছে না।

পরিবারে বিবাহিতা বোন মুন্নী যেন এক করুণ অসংগতি। রাজেন্দ্র যাদব এক মরমী কথাশিল্পী, তিনি এই চরিত্রটিকে প্রভার প্রতি সহানুভূতিশীল রূপে দেখিয়েছেন। অথচ তার অবস্থা প্রভার অবস্থার চেয়েও কষ্টকর। তার স্বামী লম্পট, মাতাল, জুয়াড়ি। মুন্নীকে সে নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে। মুন্নী তাই বাপের বাড়িতে থাকে। একদিন স্বামী আসে তাকে নিয়ে যেতে। মুন্নী যেতে চায় না। কিন্তু সামাজিক লজ্জাসম্ভ্রমের খাতিরে বাবা ঐ দানব প্রকৃতি স্বামীর ঘরেই মেয়েকে পাঠিয়ে দেন।

বৈপরিত্য লক্ষ্য করার মতো। যে বাপের বাড়ি তাদের মেয়ে মুন্নীর স্বামীর দুর্ব্যবহারে এত কষ্ট পায়, সেই বাপের বাড়িই প্রভার শ্বশুরবাড়ি হয়ে যায়। প্রভার ওপর নির্বিচার অত্যাচার চলে। অর্থাৎ নির্যাতিতরা অত্যাচারকে ঘৃণা করতে শেখেনা, বরং নিজেরই একসময় অত্যাচারী হয়ে ওঠে।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার টানাপোড়েনের নিখুঁত চিত্রণের মধ্যেই রয়েছে 'সারা আকাশে'র লেখকের রচনাশক্তির সার্থক পরিচয়। চিরাচরিত প্রথা এবং রীতিনীতি পালনের নামে একজন পিতা আপন সন্তানদের একদিকে অমঙ্গল করে চলেছেন অথচ অপরদিকে তিনিই হয়ে উঠেছেন পরিবারের সবচেয়ে নিরীহ আর.আহত মানুষ। তিনি সমরকে যখন প্রহার করেন তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার অসহায়ত্ব। সমরের বড় ভাইয়ের নীরস জীবনের প্রতীক তার পুরানো সাইকেল। এদের মধ্যে সমরের বৌদি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। অভাবগ্রস্ত সংসারে নানারকম ছলকপটতার আশ্রয় নিয়ে সে অন্যদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে নিজের সুবিধাটুকু গুছিয়ে নেয়। যেখানে বাকি সবাই অসহায়

সেখানে বৌদি কৃপার পাত্র। পরিবারে কপট কেউ নয়। এ এমন এক কাহিনী যেখানে কোন খলনায়ক নেই। পরিস্থিতি এবং প্রথাই এখানে খলনায়ক। সনাতন প্রথা আর রীতি-নীতির উপর সবার অটল বিশ্বাস। তাই এদের জীবনে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নেই। সমর আর প্রভা এই অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে বেড়িয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকে। তারাও পরিস্থিতির সৃষ্টি।

এই উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ককে বুঝতে পারার প্রক্রিয়ার চিত্রণে কোথাও কোন দুর্বলতা নেই, বর্ণনার গতি সহজ, স্বচ্ছন্দ, কোন আদর্শবাদ বা সংশোধনী প্রচেষ্টার বক্তৃতায় কোথাও হোঁচট খেতে হয় না।

'সারা আকাশে'র প্রথম খণ্ডের শেষ অংশ বড় মর্মস্পর্শী। সেই মর্মস্পর্শিতা যথেষ্ট জটিলতার মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। প্রথমদিকের সংঘাতের অবসান, অন্তর ও বাহিরের বহু যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার সাগর উত্তীর্ণ হয়ে, নিজের মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে নায়ককে অভীষ্টে পৌঁছতে হয়েছে। আর সেই জন্যই তা হয়েছে বিশ্বাসযোগ্য এবং মর্মস্পর্শী। প্রভার প্রতি সমরের ব্যবহারে যে ঔদ্ধত্ব তা খাঁটি নয়। তাকে ছেলেমানুষই বলা যায়। সমরের অতীতপ্রীতি, মহাপুরুষদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা, তার আদর্শবাদ সবই বেশ অপরিণত। কৈশোরের সীমাহীন আবেগের উচ্ছ্বাস রূঢ় বাস্তবের ঘা খেয়ে অনেকসময়েই সংসারের হাসির খোরাক যোগায়। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যদি কিশোরসুলভ আবেগ উচ্ছ্বাসের ঘোর না কাটে, তখনও যদি চেতনা না-আসে তাহলে মানুষ হয় ভেঙে পড়ে, আর নয়তো সংসারের কৃপা আর ব্যাঙ্গের পাত্র হয়ে দিন কাটায়। সমর আর প্রভার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রচ্ছন্ন। মনে হয়, সে আকর্ষণের ভিত্তি ছিল সহজ মর্যাদাবোধ এবং পারস্পরিক নির্ভরতাবোধের ওপর। পুরুষ সুলভ ক্রুরতা ও অহঙ্কার সত্ত্বেও সমর একথা কখনও ভুলতে পারেনি যে প্রভা একান্তভাবে তারই। সমরের চরিত্রে কোন দোষ ছিল না এটা মনে রাখা উচিত। তাই এই উপন্যাসে সমর ও প্রভার সম্পর্ক যে পরিণতিতে পৌঁছেছে তার বীজ প্রথম থেকেই কাহিনীতে বিদ্যমান ছিল। প্রভা সমরকে প্রশংসা করে, সমর অপরাধবোধে পীড়িত হয়—নিজের মূর্খতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে —'আমার মনে হল, আমার ব্যবহার আগাগোড়াই শুধু ভুল হয়নি চরম মূর্খেরও হয়েছে।'

'কুল্লী ভাট'-এ নিরালা তাঁর ফুলশয্যার রাতের যে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন সমর আর প্রভার প্রথম মিলন খানিকটা সেইরকমই। প্রভা আত্মসমর্পন করতে চায়। কিন্তু সমরের সামনে নতজানু হয়ে নয়। সমর পড়াশোনা করতে চাইলে প্রভা তার পথের বাধা হতে চায়না। সমর যেটাকে প্রভার অহঙ্কার ভাবছে আসলে তা প্রভার নারীসুলভ আত্মসম্মানবোধ।

বলা যেতে পারে, 'সারা আকাশ' এই অস্বাভাবিক ও স্বাভাবিকতার দ্বন্দ্বের কাহিনী। রচনার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব যথেষ্ট বিশ্বাস্যভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কাহিনীর সূতোয়

নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের আর্থিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক নানা রকম পরিস্থিতি জাত বিবিধ ঘটনাকে গেঁথে গেঁথে লেখক তারই মধ্যে দিয়ে অস্বাভাবিকতাকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতায় পরিবর্তিত করার প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছেন। প্রেমের গল্পে জীবনের অসংগতিগুলিকে কেমন করে গেঁথে দিতে হয় তার কথাসাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে 'সারা আকাশ' একটি অনন্য রচনা।

'সারা আকাশে'র আর একটি বিশেষত্ব উল্লেখ করা অবশ্যকর্তব্য। 'সারা আকাশে' বুদ্ধি বিবেচনার বিকাশকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে এমনটি খুব কম সাহিত্যকর্মেই দেখা যায়। জিদ, অহঙ্কার, উপেক্ষা, আত্মপীড়ন ইত্যাদিকে সমর নিজেই বলেছে মূর্খতা। একটু একটু করে মূর্খতার জাল কাটিয়ে বুদ্ধির স্ফুটন ঘটেছে, আর তখনই নবীন দম্পতি পরস্পরকে বুঝতে পেরেছে, পরস্পরের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পন করেছে।

বিশ্বনাথ ত্রিপাঠী

পূর্বার্দ্ধ

সন্ধ্যা

উত্তরহীন দশ দিক

এক

তাল-লয়-বিহীন ঢোলকের দুমদাম আর তার সঙ্গে মেয়েদের বেসুরো গলার চিৎকার — সব থেমে গেল আচমকা। গলির সবকটা বারান্দা আর ছাদের কিনারায় বাচ্চাকাচ্চা আর মেয়েদের ভিড় — সবার মুখে প্রশ্ন, 'কি হল?' 'কি হয়েছে?' নিচে ফটকের কাছে হিজড়েরা কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে গাইছিল, 'ওয়ে...জিয়ো...জিয়োরে লালা...' তারাও গানটান ভুলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখ তুলে দেখছে ওপর দিকে।

গলির ওপারে আমাদের ঠিক সামনের বাড়ির সাঁওলের বউ গায়ে কেরাসিন ঢেলে পুড়ে মরেছে...ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখেই লোকে ছুটে এসেছিল, কিন্তু দরজা ভাঙতে ভাঙতেই তার প্রাণপাখি গেছে উড়ে। হায়, হায়, এমন শুভদিনে এ কি ঘটল? সবাইকারই বুক কাঁপছে কিছু একটা অজানা অনিষ্টের আশঙ্কায়। চারদিকে এমন চিৎকার চেঁচামেচি ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে।

নিজেকে লক্ষবার বোঝাতে চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না যে আজ আমারই ফুলশয্যার রাত্রি।

স্যাঁৎস্যাতে সঙ্কীর্ণ নোংরা গলির মধ্যে থেকে মেয়েদের কান্না আর চিৎকার এখনও যেন পিছনে তাড়া করে আসছে। ঐ গণ্ডগোলের মধ্যে সবাইকার চোখ এড়িয়ে পালিয়ে এসেছি। পিছন থেকে যে কোলাহল ভেসে আসছে তা কারো বিবাহের আনন্দসঙ্গীত, না কারো পুড়ে মরায় শোকের কান্না, তা বোঝা মুশকিল, হয়ত তার পার্থক্য বোঝার মত অবসরও এখন আমার নেই ...।

সারাটা দুনিয়া জেনে গেছে, এই ছেলেটার আজ ফুলশয্যার রাত। 'সাহসী এবং কর্মঠ যুবকবৃন্দই আজ দেশের প্রয়োজন'— এই ধরণের সব বুলি একদা শোনা যেত যে যুবকের কণ্ঠে সেও কিনা আজ একটি চারপেয়ে জীবে পরিণত হল? কেউ কি একথা বিশ্বাস করবে, ঝড় বাদলেও যে ছেলেকে আটকানো যেতনা সেই সমর আজ দু সপ্তাহ ধরে 'শাখা'তে যায়নি, নিজের সঙ্গী সাথীদের নজর এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? আর সেই ছেলেই কিনা এখন সমস্ত অতিথি অভ্যাগত, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত অপরিচিত সবাইকার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বাঁচিয়ে চুপি চুপি এ গলি সে গলি দিয়ে চলেছে মন্দিরের দিকে? ঐটেই একমাত্র জায়গা যেখানে একটু শান্তিতে বসে এতবড় একটা পরিবর্তন সম্বন্ধে চিন্তা করা যেতে পারে। বেশী রাতে বাড়ি ফিরলেই হবে। ততক্ষণে সব হৈ-হল্লা থেমে যাবে। কিন্তু ঐ আওয়াজ এখনও যেন পিছনে ধাওয়া করছে।

'আরে নাও...নাও, আরেকটা নিয়ে ফেল, ঠাকুর-সাহেব! তোমার মেজপুত্তুরের বিয়ে, আর তুমি কিনা এমন চুপচাপ বসে রয়েছ? তোমার এই বেয়াইটি কিন্তু ভাই, যাই বল..., আচ্ছা ঠাকুরসাহেব, আপনাদের ঘরেও কি বরযাত্রীদের জন্য দেশীরই ব্যবস্থা হয় নাকি? আজ তো বিলিতি...'

বিধ্বস্ত (ঝুলেপড়া) মুখ,...ঘোলাটে চোখ...জড়ানো কথা...মদের গন্ধে ভরা সশব্দ নিঃশ্বাস...মণ্ডপের নিচে পাগড়ি সামলাতে সামলাতে বাবুজী গজরাচ্ছিলেন, 'আমাকে ঠকানো হয়েছে...'।

'ওঠো ওঠো, 'ফেরা'র (প্রদক্ষিণ) সময় হয়ে গিয়েছে। ঘুমোতেই হয় তো বরযাত্রী নিবাসে গিয়ে শোও।...এমন করে পড়ে আছ, গায়ের কাপড়-চোপড়ের ঠিক নেই... লোকে বলবে কি? কেমন ধারা বরযাত্রী এসেছে? ওঠো...ওঠো।'

'দেখ দেখ, ওদিকে একবার দেখ, ঐ যে মেয়ের মায়ের পিছনে...লম্বা চুলের বিনুনী ...কানে সাদা মুক্তোর ফুল; আঃ চোখদুটো দারুণ...আমি তো ভাই আজ এখানেই মারা পড়ব...!' 'হ্যাঁ বলো, কূপ, পুষ্করিণী, ধর্মশালা যা কিছু করাব, তোমার মত ও পরামর্শ অনুসারেই করাব,— এর পর কন্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে...'

ওদিকে তু — তু...উ...উ, তু — তু...উ...উ ক্ল্যারিওনেটের সুর; আর নাকাড়ার কিড়িং কিড়িং ধম শব্দ মিলে মিশে বাইরে তখন চলেছিল ঐকতান বাদন।

পালাও পালাও — এই সব জঞ্জালের থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যাও — আমার ভিতর থেকে ক্রমাগত কেউ যেন এই কথা বলে চলেছিল। ঐ দেখ; সামনের ঐ ছেলেটা একটু যেন চেনা চেনা ঠেকছে। একদম উল্টোদিকে ঘুরে যাও, না হলে এখন দু ঘন্টা ধরে বক বক করবে। বোকার মত ঠাট্টা শুনতে হবে...'বউ কেমন লাগল?' 'মিষ্টি খাওয়াও'...'আমায় বরযাত্রী নিয়ে গেলে না তো?'...পালাও। জীবনের শুরুতেই কি যে এক বোঝা ঘাড়ে চাপল! ইচ্ছে করছে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে বহুদূরে অজানা কোনো জায়গায় পালিয়ে যাই। কালকেই কাগজে বেরিয়ে যাবে, 'খোকা, তোমার মায়ের শরীর খুব খারাপ। আমাদের আর কোন অভিযোগ নেই'। কোনদিকেই কোন উপায় দেখছি না। মনে হচ্ছে যেন একটা ভারী ট্রাক ঝুরঝুরে বালির মধ্যে ফেঁসে গেছে। ইঞ্জিন গোঁ গোঁ শব্দে আর্তনাদ করছে, ঘর্ঘর করে ঘুরছে চাকাগুলো, কিন্তু ট্রাক সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, আর পাহাড়ের মত ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, দিকভ্রম হয়ে যাচ্ছে, শরীরে আর শক্তি নেই। দমবন্ধ হয়ে আসছে আর প্রাণটা যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। দিক বিদিক ছেয়ে গেছে ধূলোয়...ধূলো...গতিহীন ধূলো।

গোধূলির পর চারিদিক ছেয়ে নেমেছে কুয়াশা। মন্দিরের থামে মাথা হেলিয়ে বসে আছি — মাথার ভিতরটা যেন ভারী হয়ে রয়েছে। সাদা আর কালো মার্বেল পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরী দাবার ছকের মত নক্সা ঠাকুরের সামনের দরজা পর্যন্ত চলে গেছে

— দু'সারি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মস্ত বড় হলঘর — ঠিক মাঝখানে মূর্তির মুখোমুখি মঞ্জীরা, মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম, সেতার ইত্যাদি নিয়ে বসে একদল ভক্ত গেয়ে চলেছে...'মেরে তো গিরধর গোপাল...ও ও মেরে তো গিরধর গোপাল...কী'। আশে পাশে শোনা যাচ্ছে 'জয় বংশীওয়ালে নন্দ কে লাল কী'...'নমামি ভক্তবৎসলম'...এই ভক্তি উচ্ছ্বাস মুখরিত সন্ধ্যা, ধুনো আর ধূপের সুগন্ধ...অস্পষ্ট ধোঁয়াটে আলো...। ওগো কেউ আমায় বলে দাও, আমি এখন কি করি?

থামে ঠেস দিয়ে বসে রইলাম বাইরের সিঁড়িতেই। পালাবার সাহসও তো নেই আমার। তখনই যদি দিন পনেরোর মত কলকাতা, বোম্বাই, পুনা, হরিদ্বার, যেখানে হোক একটা কোথাও কেটে পড়তাম তাহলে এ রকম ব্যাপার ঘটত কি? তখন তো কেবল কেঁদেছি আর কাকুতি মিনতি করেছি, 'আমার পায়ে পাথর বেঁধে দিওনা'...'আমার পায়ে এই পাথর বেঁধে দিওনা'...। মুঠোর মধ্যে একখানা সবুজ চুড়ি পরা ঘর্মাক্ত হাত আর আটার পিণ্ড নিয়ে চুপচাপ বসে কেবলই শুনতে পাচ্ছিলাম, ভিতর থেকে কে যেন ক্রমাগত, একবার বলছে...'এখনও সময় আছে, উঠে পড়, পালা'! আবার যেন বলছে, 'হা ভগবান, কে জানে এ কাকে এরা আমার গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে...!' ধূমায়িত অগ্নিশিখার পাশ দিয়ে টলমলে পায়ে, মেপে মেপে সেই সাতবার প্রদক্ষিণ...পুরোহিত কে জানে কি সব বলে যাচ্ছিল...। হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল...এমনি করেই হয়তো পুরোহিত বলেছিল, 'সাবধান...', আর সেই সতর্কবাণী বুঝতে পেরেই দৃঢ়চেতা গুরু রামদাস মণ্ডপ ত্যাগ করে উঠে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

আত্মীয় কুটুম্বরা সবাই বলছিল, 'বড়র বিয়ে হয়ে গেছে, আট বছরের বেশি হয়ে গেল, এবার তো বাড়িতে আরেকটি বউ আসা উচিত'। মা তো প্রতিদিন বলত, 'আহা, ছোট বৌ এসে দরজায় পা রাখবে সে শুভদিন কবে যে আসবে!' বাবুজী শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, 'এই তো মুন্নীর বিয়েতে সাত আট হাজার ধার হয়ে গেছে। এখন ছেলেরা যদি কিছু করতে পারে তবেই...আমার তো আর সাধ্য নেই।' কেবল নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ, নিজের সন্তুষ্টি ব্যস, এই হচ্ছে আমাদের বাড়ির রীতি। ওঁদের চাপে অন্যে মরুক, পিষে যাক, অন্যদের যেন প্রাণ নেই, নিজের যেন কোন ইচ্ছাও থাকতে পারে না। গুরুজনেরা ভাবেন, দুনিয়াটা ওঁদের যুগে যেমন চলত আজও ঠিক সেইভাবেই চলা উচিত। না হলেই সবকিছু রসাতলে যাবে। 'আরে মশাই, ছেলেপিলেদের আবার নিজেদের ইচ্ছে বলে কিছু হতে পারে নাকি? ওরা বোঝেই বা কি? দুনিয়াটা আমরা অনেকে দেখেছি।' অথচ সত্যি কথা বলতে, নিজেদের নাকের ডগাটুকু ছাড়া আর কিছু ওঁদের নজরেই পড়ে না। ছেলের বিয়ে হবে, বউ আসবে, বাচ্চা হবে, নিজে কেরানীবাবু হবে আর আমার পরে এই হুঁকোর নলটা সামলাতে পারবে, ব্যস, এর চেয়ে বেশী আর কি চাই শুনি? হায়রে আমার কতশত মহৎ আকাঙ্ক্ষা, বড় কিছু হয়ে ওঠার স্বপ্ন, সব কিছুরই ঘটবে অপমৃত্যু — কত বিনিদ্র রাত্রি আর নিজের রক্ত দিয়ে পালন করা ভবিষ্যতের স্বপ্ন শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে।

আজ সকালে যা কিছু ভেবেছিলাম, এখন মনে হচ্ছে সে যেন আমি নয়, অন্য কেউ ভেবেছিল। এখন তো সব কিছু মিথ্যে মনে হচ্ছে। আমার ডায়রীতে লিখেছিলাম, 'এত সহজেই আমি কেন সাহস হারিয়ে ফেলছি? এখন থেকেই কেন ভাবছি যে আমার সমস্ত মহৎ বাসনাগুলোর মৃত্যু ঘটল? সোনাকে আগুনে পোড়ালে তবেই তো তা জড়োয়ার কারুকার্যের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে — সবাইকারই জীবনে পরীক্ষার সময় আসে — এ আমারও অগ্নিপরীক্ষার লগ্ন। বিপদে পড়লেই এত চট করে ঘাবড়ে যাওয়াটা মোটেই ভাল কথা নয়। এইরকম সঙ্কটের মুহূর্তে নিজেকে সংযত রাখা আমাকে শিখতে হবে। মহান হবার প্রথম শিক্ষাই তো এই — বিপদের মুখে মাথা ঠাণ্ডা রাখা। নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্রে বসে চিঠি লিখতেন। এ কথা কখনও ভুললে চলবেনা যে আমাকে বড় হতে হবে — এমন একজন হয়ে উঠতে হবে যার সামনে এলে সারা দুনিয়া মাথা নত করবে। যার মুখের কথা সারা দেশ আদেশ বলে মনে করবে, যে ভারতমাতাকে এই বিদেশী ম্লেচ্ছদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারবে। ভারত মহাপুরুষদের দেশ। আমার ধমনীতেও প্রবাহিত হচ্ছে রাণাপ্রতাপ আর শিবাজীর রক্ত, তার মান রাখতে হবে। তাঁদের ঐতিহ্য এবং এই সংস্কৃতির ধারাকে আমাদেরই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমরা যুবক, আজও আমাদেরই মধ্যে আছেন হাজার হাজার ভগবান বুদ্ধ, মহাবীর স্বামী, ভগবান কৃষ্ণ, ভগবান রাম। আজ তাঁদের জাগ্রত করা, সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করা প্রয়োজন। হনুমান, ভীম বা ভীষ্ম পিতামহের মত শক্তিমান আমাদেরই মধ্যে থেকে জন্ম নিতে পারেন। আজ আমার সামনে কঠিন পরীক্ষার সময়, কিন্তু চিরকাল তো এমন থাকবে না। এই সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারলেই তো ওপারে মহান গৌরব আর সম্মানের সৌরভে ভরা অমরত্বের দেশের সন্ধান মিলবে। সেখানে পৌঁছবার জন্য এই 'হার্ডল রেস' যেন একটা চ্যালেঞ্জ। আমার শক্তিকে আরো শান দেবার জন্যই ঈশ্বর এইসব বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন। এই বাধাবিঘ্ন দুপায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যাব আমি। আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকার প্রতিজ্ঞা আমার আজও তেমনি দৃঢ় রয়েছে...

এই সব কথা ডায়রীতে লিখেছিলাম আজই সকালে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কি একটা প্রবল স্রোত যেন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কে জানে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে। কিন্তু উপস্থিত এই বর্তমান কালটা নিয়ে কি করি? মোহিনীমায়ার এই জালে নিজেকে জড়িয়ে পড়তে দেব না, এই জাল কেটে ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ব? যতদূর সম্ভব অবিচলিত থাকব, এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয়। হে ঈশ্বর, এই পরীক্ষার সময়ে আমাকে শক্তি দাও, আমাকে দৃঢ় কর, মন যেন আমার গলে না যায়, আমার পরাজয় হয় না যেন।

যাই হোক, বিয়েটা তো এখন হয়েই গেছে। কিন্তু মন তো আমার ঠিক আগের মতই আছে। কোন রকম রঙীন নেশায় আর ঝামেলায় নিজেকে কিছুতেই জড়াব না। কাজটা হয়ত খুবই কঠিন হবে, কিন্তু এইভাবেই চলতে চেষ্টা করব প্রাণপনে। এটাই তো আমার নিজেকে গড়ে তোলার, নিজেকে প্রস্তুত করার সময়।

কে যেন বলছিল প্রভা দশম শ্রেণী পাশ করেছে। ওর হাতখানা ছাড়া আর তো কিছু আমি দেখিইনি। হ্যাঁ, অগ্নিপ্রদক্ষিণের সময় আমার সামনে ছিল ও তখন পাও দেখেছি, আলতা ছিল পায়ে। কিন্তু যাই হোক...ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই থাকবে না। আমি কথাই বলব না ওর সঙ্গে। যদি বলতেই হয় তো নেহাৎ প্রয়োজনের খাতিরে হয়ত একটা দুটো কথা, ব্যস। এখন তো এই চেষ্টাই করতে হবে যাতে ওকে ওর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যায়। সবাই যখন নিজের নিজের স্বার্থই দেখছে তখন আমিই বা বাদ যাই কেন? কারো কথায় আমি পথভ্রষ্ট হব না। চাপে আর উপরোধে পড়ে বিয়েটা করেছি, ব্যস, এই যথেষ্ট। তোমরা কি পেলে, আর না পেলে তাই নিয়ে আমার কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই। আমাকে তো নিজেই নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে নিজের শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ করাই আমাব ইচ্ছে। এখনও চারবছব বাকি। এম, এ পাশ করতে হবে। ততদিন পর্যন্ত ও কি করবে, কোথায় থাকবে, সে সব আমার জানার প্রয়োজন নেই। জানবার দরকারই বা কি? যে পথে আমি কখনও চলব না সে পথের দূরত্বের হিসেব রেখে লাভ কি? কখনও কখনও বাধাগুলোও বড় মনোহর রূপ ধরে সামনে আসে, তাতে মুগ্ধ না হওয়াটাই বুদ্ধিমানেব কাজ। স্ত্রীর যা ইচ্ছে তাই সে করুক, আমরা একে অন্যের পথে বাধা হব না।

কে যেন বলছিল, অনেক লেখাপড়া করেছে, খুব বুদ্ধিমতী। আচ্ছা, ওকে আমাব দৃষ্টিভঙ্গিটা কি বোঝানো যায় না? ধর যদি ভবিষ্যতে গার্হস্থ্যজীবন কাটাতেই হয় তাহলে এই সময়টা সেও নিজেকে তার জন্য প্রস্তুত কবতে পারে। অন্তত ওব মুখখানা আমার দেখে রাখা উচিত ছিল। ভাবী বলছিল মুখে অল্পসল্প বসন্তের দাগ আছে। নাক চোখ কেমন কে জানে! আজ তো ফুলশয্যা, সবাই পিছনে লাগবে বলেই এখানে এসে বসে আছি। কে জানে কি কি করতে হয় আজ! কেমন ভাবেই বা করতে হয়!

যাক গে, আমার এ সব চিন্তায় কাজ কি! আমাকে আজ এক বিরাট সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরীক্ষার আজ সবচেয়ে কঠিন পেপার। আজ যদি পা পিছলে যাই তো সংসারেব কোন শক্তিই আমাকে আর উদ্ধার করতে পারবে না, আর আজ যদি ঠিকমত বেবিয়ে আসতে পারি তাহলে সমস্ত শিরঃপীড়া একেবারে দূর হয়ে যাবে। একেবাবে কথা না বলাটা হয়ত সম্ভব হবেনা। আমি ওকে এ ভাবে বলতে পারি —'দেখুন, আমাদের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। মা বাবা যেমনই হোন, বা তাঁরা যা করতে পারেন, করে দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের নিজেদের ভালমন্দ আমাদেরই বুঝতে হবে। সবচেয়ে — প্রথমে তো আমাদের লেখাপড়া সম্পূর্ণ করা দরকার..., কিন্তু এ সব কথা শুনে যদি কান্না শুরু করে দেয়, তখন? শেষে যদি ওর কান্না দেখে আমার চিত্তের সব দৃঢ়তা গলে কাদা হয়ে যায়...? না, না, না...যশোধরার সৌন্দর্যও ভগবান বুদ্ধকে বাঁধতে পারেনি; গোপীদের প্রেম কৃষ্ণের কর্মযোগী হয়ে ওঠা আটকাতে পারেনি।

আচ্ছা, পত্নীকে সর্বদা বাধা বলেই বা মনে করা হবে কেন? রামের শক্তিকে কি

সীতার থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব? রাজপুতানার ক্ষত্রিয় নারীরা তাঁদের স্বামীদের নিজেরাই যুদ্ধে পাঠিয়ে দিতেন না কি?...কিন্তু আমি...আমি যে বড় দুর্বল। নিজেকে যদি তাঁদের ছাঁচে গড়তে পারতাম তবেই ওসব সম্ভব হত। ততদিন পর্যন্ত উপেক্ষাই হবে আমার অস্ত্র, আর ঔদাসীন্য হবে আমার ঢাল।...অশ্রুজল আর বাসনার চোরাবালির মধ্যে দিয়ে খুব সাবধানে পা ফেলে আমাকে চলতে হবে। এই ভগবানের মূর্তি সাক্ষী রইলেন...হে ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দাও, সংযম দাও, সুবুদ্ধি দাও, আমি যেন নিজেকে ঠিক পথে চালনা করতে পারি। যে আমার সঙ্গে থাকতে পাবে থাকুক, যে পিছিয়ে পড়বে তার জন্য মোহগ্রস্ত হয়ে আমি যেন থেমে না যাই। গুনগুনিয়ে আমি গেয়ে উঠলাম, 'কর্তব্যপথে যেন রহি গো অটল, দয়ানিধি ওগো, দাও সেই বল'...।

হঠাৎ চমকে উঠে দেখি কখন যেন ভজন শেষ হয়ে কীর্তন আরম্ভ হয়ে গেছে।

দুই

চারিদিকে হাসি আর কলরব, ঠাট্টা মস্করা চলেছে, শানাইওয়ালারা একে অন্যের দিকে মুখ ফিবিয়ে ফিরিয়ে তারস্বরে বাজিয়ে চলেছে, কিন্তু আমাব মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা প্রবল ঝড় আটকা পড়ে গেছে একটা বিবাট গম্বুজের মধ্যে, গুমরে গুমরে সে এদিক থেকে ওদিকে দেওয়ালে যেন ছোবল মেরে মেরে বাইরে আসার পথ খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না।

কে জানে এটা ভাল হল না মন্দ হল। ফুল শয্যার রাত এল, আবার চলেও গেল। সত্যিই আমি তার সঙ্গে একটা কথাও বলিনি। কিন্তু এখন মনে মনে আমি দ্বিধাগ্রস্ত— ঈশ্বর কি এইভাবেই আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, নাকি এই আমার দুর্ভাগ্যের সূচনা হল...।

আমি বড় বেশী ভাবপ্রবণ আর দুর্বল। আবেগ আর দুর্বলতার বন্যায় বড় সহজেই ভেসে যাই, আর সেইসময় কোথাও কোন কুলকিনারা খুঁজে পাই না।

ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে ভাবী পিছন থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল আর আমি ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিলাম। প্রভা তখন দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়েছিল মনে হচ্ছিল বুঝি বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর আস্তে আস্তে খাটের মাথার দিকটায় গিয়ে এমনভাবে বসে পড়লাম যেন ভয় করছে। ভেবেছিলাম চুপচাপ গিয়ে শুয়েপড়ব, আর একবার ঘুমিয়ে পড়লে সকালের আগে আমার ঘুম

ভাঙবেই না। ঐ সময় আমার বুকের ভিতরটা যেন ধড়াস ধড়াস করে কেঁপে উঠছিল, সমস্ত দেহমনের সব শক্তি যেন একটা ডিনামাইটের বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে — নিজের মনের সমস্ত দৃঢ়তা আর আত্মবিশ্বাস প্রাণপণে একত্রিত করছিলাম। ছেলেগুলো কতকিছুই না আমাকে শেখাতে চেয়েছিল। একেবারে মূর্খ। লক্ষ লক্ষ এমন ছেলে আছে যারা নারী, অর্থাৎ একটি জলজ্যান্ত মেয়েকে দেখলে মনে করে একেবারে সাক্ষাৎ স্বর্গের ফুল, যুগে যুগে নারীর জন্য পাগল হয়েছে কত পুরুষ। ঐ মূর্খগুলো আমাকেও তাদেরই একজন ভেবেছিল। টাঙ্গায় চড়ে মেয়েদের যেতে দেখলে কত ছেলে নিজের গন্তব্যপথ ভুলে, শুধুমাত্র 'দর্শনসুখ' পেতেই টাঙ্গার পিছনে মাইলের পর মাইল চলে যায়। কিন্তু আমি তো তাদের মত নই। তাদের পথ আর আমার পথ এক নয়।

মনে মনে কেবলই আবৃত্তি করছিলাম...নারী অন্ধকার, নারী মোহ, নারী মায়া, দেবত্বের পথে অগ্রসর হতে চাওয়া মানুষকে ধরে বেঁধে রাক্ষসত্বের অন্ধকূপে এনে ফেলে নারী। পুরুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে নারী। হাজার, হাজার, লক্ষ, লক্ষ ছেলে যে পথে যায় সে পথ আমার নয়। ওপর থেকে দেখলে যেমনই লাগুক না কেন, আসলে আমি ওদের থেকে সব দিক দিয়েই আলাদা। আমার ভবিষ্যৎ আমার নিজের হাতে। আমি প্রতিটি মুহূর্ত ধারালো তলোয়ারের ওপর দিয়ে হাঁটছি। নিজেকে আরো একটু প্রস্তুত করতে হবে, টলমল করলে চলবে না। সর্বদাই আমার নিজেকে ওদের চেয়ে অনেক উচু স্তরের বলে মনে হয়।

এ ঘরে আসার আগে পর্যন্ত ভাবছিলাম, সব বিয়েতেই যেমন হয়ে থাকে প্রভাও নিশ্চয় তেমনি লজ্জায় জড়োসড়ো একটি পুঁটলির মত নববধূ সাজে সেজেছে, সেই সাজসজ্জা নিয়েই সে আমাকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ঠিক ঐ সময়টাতেই তো নিজেকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু এখন ওকে দেখে একটু চমকে গেলাম। বিয়ের সময় যেমন রঙবেরঙের শাড়ী পরানো হয় সেইরকমই পরেছে বটে কিন্তু আমি খাটে এসে বসবার পরেও ও তেমনিই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সামনের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। ঘরে যখন ঢুকছিলাম সেই সময় ভাবীর সঙ্গে পাড়াপড়শী এবং আত্মীয় স্থানীয় আরো অনেকগুলি মহিলা ছিলেন, খিলখিল হাসি আর ফিসফাস শোনা যাচ্ছিল, ভগবান জানে তাঁরা কি বলাবলি করছিলেন। কিন্তু এখন ঘরের কোণে রাখা টুলের ওপরের চলন্ত পাখাটার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে পাখাটার কোন একটা ব্লেড কোথাও যেন ঠেকে যাচ্ছে এবং ঝন্ ঝন্ করে উঠছে। বিয়ে উপলক্ষ্যে পাশের বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ ধার নেওয়া হয়েছে। আমি যতদূর সম্ভব উপেক্ষা আর অবহেলার ভাব দেখাতে চেষ্টা করছিলাম। কল্পনা করছিলাম আমার উচ্চ আদর্শবাদী চিন্তার বিশুদ্ধতা আমার মুখের চারপাশে যেন একটা জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করেছে। খানিকপরে একটু কৌতুহলও হল, ও কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? কিন্তু আমি যখন খাটে এসে বসেছিলাম সেই সময়টা একবার মাথা তুলে দেখেছিল, তারপরেই যেন কিছুই হয়নি এইভাবে আবার মাথাটা হেলিয়ে দিয়েছিল দেওয়ালে।

বোকার মত বসে বসে আমি পাখাটার দিকেই চেয়ে রইলাম। কি করা যায় এখন? আস্তে আস্তে খাটের ওপর শুয়ে পড়লাম আড়াআড়িভাবেই। মাথাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে উঁচু হয়ে রইল। একটার পর একটা মুহূর্ত গড়িয়ে যাচ্ছে। ভয় হচ্ছিল, আমার এই কঠোর ভাব দেখে ও হয়ত এখনই ডুকরে কেঁদে উঠবে...হয়তো দুহাতে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভেজা মুখখানা তুলে ধরে আশ্বাস চাইবে, জিজ্ঞাসা করবে —'প্রভু আমার, এ দাসীর কি অপরাধ হয়েছে বলে দাও'। তারপর আমার পায়ে বার বার মাথা খুঁড়ে ক্ষমা চাইবে। সেই সময় নিজেকে সংযত রাখা বোধহয় খুব কঠিন হয়ে পড়বে। আর বেশি দেরী নেই, এই নাটক শুরু হল বলে...।

কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একটু আধটু চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ আর এই মধ্যরাত্রির নৈঃশব্দ মিশে আমাদের দুজনের মাঝখানে যেন ছড়িয়ে পড়ছে একটা বিষাক্ত ধোঁয়ার মত। আশঙ্কা আর আবেগের সমুদ্রে একটুকরো স্পঞ্জের মত আমার মনটা এতক্ষণ যেন একবার ফুলে উঠছিল, আবার পরক্ষণেই চুপসে যাচ্ছিল। এখন হঠাৎ মনে হল সমস্তটা জমে একেবারে পাথর হয়ে গেছে। মনের মধ্যে কে যেন প্রশ্ন করল — আমি এলাম কেন এখানে? একটা কথা নয়, অভ্যর্থনা নয় — এতে কি আমাকে অপমান করা হচ্ছেনা? এটা স্বীকার করতেই হবে যে আমার সমস্ত মহৎ বাসনা, আশা আর দৃঢ়তার কঠিন বরফের আস্তরণের তলায় তলায় খরবেগে প্রবাহিত হচ্ছিল একটা উষ্ণ অনুভূতির স্রোত অন্তরের কোনো অন্ধকার কোণে হয়ত উৎসুক্যও ছিল...হয়তো বা ছিল কিছুটা মধুর অনুভূতিও। মনের মধ্যে এ আশঙ্কাও ছিল যে আমার উষ্ণ অনুভূতির রক্তস্রোত হয়ত সহসা সব দৃঢ়তার আবরণ ভেদ করে প্রচণ্ড শক্তিশালী গ্লেসিয়ারের মত বেরিয়ে আসবে এবং তার তোড়ে আমি হারিয়ে যাব।

সুতীক্ষ্ণ তীর যেমনভাবে লক্ষ্যে গিয়ে খচ করে গেঁথে যায় তেমনি করেই কিছু একটা যেন আমার হৃদয়ে এসে বিঁধে গেল — অপমান! এতো স্পষ্ট অপমান। ভিতরের তরল রক্তস্রোত যেন মুহূর্তে জমে বরফ হয়ে গেল। কেন যে আসতে গেলাম এখানে! আজকের দিনটা অন্য কোথাও চলে গেলেই তো হত। না হয় বাড়ির লোক খানিকটা চিন্তাই করত। আমাদের বাড়িতে কেউ বেশী পড়াশোনা করেনি, আর এ ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে। তাই বোধহয় এত অহংকার। নিজেকে মস্ত কিছু একটা ভাবে। ঠিক সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। রেগেমেগে সোজা হয়ে উঠে বসলাম। নির্লজ্জ! এই কি একালের শিক্ষা? লজ্জা শরম, শ্রদ্ধাবোধ কিচ্ছু নেই। বোধ হয় ভাবছে অন্য ছেলেদের মত আমিও ওকে সাধতে বসব? খোশামোদ করব? হুঁঃ, নিজের গর্ব নিয়ে থাকুক বসে। সে সুযোগ ওর শেষদিন পর্যন্তও আসবেনা। প্রথমে ভেবেছিলাম আমরা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিজেদের যোগ্যতা আরো বাড়াবার দিকে মন দেব। কিন্তু না, এর যদি এই মতিগতি হয় তো তাই হোক। আমি একটুও নত হব না। আজ যদি নরম হই তাহলেই সারাটাজীবন গোলাম বনে যেতে হবে। আজ রাতে

বেড়ালকে বশে আনার কথা তো আমারই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধহয় ভাবছে আমি এবার কাছে গিয়ে বলব, 'চল, দাঁড়িয়ে কেন? বসবে এস'। তখন উনি লজ্জার ভাব দেখাবেন ন্যাকামি করবেন, কপট রাগ দেখানোর অ্যাকটিংও হয়ত হবে। এই প্রথম আমার একথাও খেয়াল হল যে আমি ঘরে আসার পর ও নমস্কার বা প্রণাম কিছুই করেনি, — এটা তো অসভ্যতা। আমি তো ভেবেই রেখেছিলাম যে ও আমার পায়ের কাছে নত হলে আমি ওর দুই কাঁধে হাত দিয়ে তুলে নেব। বাড়ির লোকেরা এ কি ধরণের শিষ্টাচার শিখিয়েছে একে? তখন তো খুব গর্ব করে শুনিয়েছিল, মেয়ে আমাদের ম্যাট্রিক পাশ।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল এইভাবে বসে বসে। তারপর এক ঝটকায় আমি উঠে দাঁড়ালাম। মাথার ভিতরটা রাগে যেন গনগন করছে, মনে হচ্ছে সমস্ত ঘরখানা অট্টহাসি হাসছে আমার অপমান দেখে। তখনও ভাবছিলাম আমি বেরোতে গেলেই নিশ্চয়ই পিছন থেকে এসে আমার হাত চেপে ধরবে নয়ত জামার কোণটা ধরে টানবে। তখন আমি একটু ইতস্ততঃ করব এবং ওকে ক্ষমা করে দেওয়া যায় কিনা ভেবে দেখব। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে দুচার পা এগোবার পরও যখন ওর দিক থেকে সে রকম কোন লক্ষণ দেখা গেলনা তখন আমার আত্মসম্মানের পেট্রল ট্যাঙ্ক একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। স্থির করে ফেললাম, এখন যদিও আমাকে আটকাতে চেষ্টা করেও, তবু আমি ফিরে তাকাব না, সোজা বেরিয়ে যাব। একেবারে অভদ্র, অসভ্য!

দড়াম করে দরজাটা খুলতেই মনে হল যেন চমকে উঠে মাথা তুলে দেখল। ততক্ষণে আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছি। কে জানে কেন, এক মুহূর্ত আমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম, তারপরেই সিঁড়ি বেয়ে চলে এলাম খোলা ছাদে। সবাই ঘুমোচ্ছে, কেউ চারপাইতে, কেউ বা মাটিতেই। যেন জ্যোৎস্নায় বান ডেকেছে, মনে হচ্ছে রাতবাণী যেন চাঁদের ছাতার তলায় নীহারিকাপুঞ্জের ছায়াপথ বেয়ে চলেছেন। কিন্তু এসব কিছুই আমি দেখছিলাম না, এককোণে নেড়া ছাদের ওপরই শুয়ে পড়ে নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করছিলাম।

উঃ এই ব্যবহার কি সারা জীবনেও কখনো ভুলতে পারব? কখনো না। বিদ্যোত্তমার ঠিক এই রকম ব্যবহার এক গণ্ডমূর্খকে করে তুলেছিল কবিতার রাজপুত্র-কালিদাস। এখন এই অপমানের প্রতিশোধ আমি কি ভাবে নিতে পারি তাই ভাবতে হবে। কিন্তু. আমি ওখানে গেলামই বা কেন? আমার নিজের মধ্যেই কি দুর্বলতা নেই? এটা কি আমার পথভ্রষ্ট হওয়ার শাস্তি? যাতে নিজেকে সামলে নিতে পারি তারই জন্য কি এই ধাক্কাটা খেতে হল? কোথায় যেন পড়েছিলাম, 'মানুষের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বাইরে টেনে আনতে অপমানের চেয়ে বড় শক্তি আর কিছু নেই'। আমার আত্মশক্তি কতখানি তাই এখন আমায় বুঝতে হবে। ফুলশয্যার রাতের এই উপহার চিরকাল মনে থাকবে। যা হয়েছে ভালই হয়েছে। ও পথটাই আমার জন্য নয়।

আমার মনে হল, আমি যেন নিজের ভাগ্যের গতিপথ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি — এ

পাশ ও পাশের সব পথ বন্ধ হয়ে কেবলমাত্র একটিই রাস্তা যেন আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। সে পথ উচ্চ আদর্শের, মানবতার পথ। মাথার মধ্যে এই তোলপাড় চলতে চলতে কখন যে দু চোখ ছাপিয়ে এল অশ্রুর বন্যা, হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম অপলক দৃষ্টিতে আর দুচোখ বেয়ে নিঃশব্দে ঝরতে লাগল অশ্রুর ধারা। হে ভগবান, এ কি বোঝা বেঁধে দিলে আমার গলায় ! কোথায় এনে ফেলে দিলে আমাকে! সেই পুরোন চিন্তা আবার ঘুরে ফিরে মন আর মস্তিষ্ক ছেয়ে ফেলতে লাগল — এই দুর্গম পথে আমি একলা — একেবারে একলা। কেউ নেই আমার সাথী। এমন কেউ নেই যে আমার ক্লান্তি আর স্বেদ দুটো সান্ত্বনার বাণীতে মুছিয়ে দেবে, আমার হতাশার অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বলবে, 'চলো, আমি তো আছি তোমার সঙ্গে...' কে জানে এ কেমন ধারার একটা মেয়ে আমার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে! কি করে কাটবে এ জীবন? মনে হচ্ছিল কোন অদৃশ্য শক্তি যেন আমাব শবীরের প্রতিটি বিন্দু জল নিংড়ে নিংড়ে বার করে দিচ্ছে আমার দুচোখ দিয়ে।

নিজের অন্তরের গভীরতম স্তরে নেমে চিন্তা করে দেখছিলাম — ধর, এখন যদি আমি চুপচাপ উঠে, কাউকে কিছু না বলে কয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ি তো কেমন হয়? কোথাও চলে যাই — কলকাতা, বোম্বাই, হরিদ্বার...যেখানে হোক পালিয়ে যাই!

ধোঁয়া, অঙ্গার আর উত্তাপেব চুল্লিতে সারারাত যেন আমি সিদ্ধ হতে লাগলাম।

তিন

দাবানলের মত এ খবরটা সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে যে, সমর প্রভার সঙ্গে কথা বলেনি।

কনুই দুটো দুই হাঁটুতে রেখে দু হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে বসেছিলাম নিজেব ঘরের চৌকাঠে, কে জানে কত কি চিন্তা করছিলাম। মনের মধ্যে এমন একটা উদাস ভাব, যেন এইমাত্র শবদাহ করে ফিরেছি। সন্ধ্যার ছায়া এখন আনাচ কানাচ ছেড়ে বাইবে বেবিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার মনের বিষাদাচ্ছন্ন ভাবটা অন্ধকাবেব সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছে। মনে হচ্ছে সামনে যেন এক মহাশূন্য, একটা অন্ধকারের সমুদ্র যেন ফুলে ফুলে উঠছে — আমি এখন কি করব?

সকাল থেকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছে। প্রভাকেও বোধহয় প্রশ্ন করা হয়েছে। কিন্তু দুজনেই এমন একান্ত অনিচ্ছার ভাব দেখিয়েছি যে কারো আর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা

করার সাহস হয়নি। ভাবী প্রথমে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিল, তারপর একটু গম্ভীর হয়েই সত্যিকথাটা জানতে চেয়েছিল। মা ও জিজ্ঞাসা করেছে। কিন্তু আমি এড়িয়ে গিয়েছি সবাইকার প্রশ্ন। সারাটা দিন মুখ লুকিয়ে এদিক ওদিক উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার ঐ তথাকথিত পত্নীটির ওপর আমি যথেষ্টই বিরক্ত হয়েছি বটে কিন্তু এটাও জানতে কৌতুহল হচ্ছে যে ও আমার বিরুদ্ধে কি কি বলেছে। এখনও পর্যন্ত সে রকম কিছুই কানে আসেনি, আর এটাই আমার একটু আশ্চর্য লাগছে। মনে হচ্ছে বাড়ির লোকে ওর মুখ থেকে কোন কথা বার করতে পারেনি। সবাই আমার ভাবগতিক দেখেই বোধহয় কিছু একটা আন্দাজ করেছে। মাঝে মাঝে এটাও মনে হচ্ছে যে এদের এই সব ঢং হয়ত আমার মনটা কোনরকমে নরম করানোর চেষ্টা মাত্র। কিন্তু মনের মধ্যে আমি এখন একটা অদ্ভুত নিরাসক্তি অনুভব করছিলাম, এ বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যেন আমার কোন সম্পর্কই নেই। ও যদি সবাইকার কাছে কিছু বলে বেড়ায় তাহলেও বোধহয় আমার কিছু যায় আসে না।

বাবুজী অত্যন্ত গূঢ় রহস্য জানবার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিলেন 'ব্যাপারটা কি খুব গুরুতর?' আমি নিরুত্তর ছিলাম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলেন 'ঝগড়াঝাঁটি হয়নি তো?'

মুন্নী এসে যখন বলল, 'বাবুজী ডাকছেন', তখন আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কেন ডাকছেন বাবুজী? খুব ভয়ে ভয়ে গেলাম। বাবুজীর সামনেই সব সময়ই আমার ভয় করে। ইদানিং তিনচার বছর থেকে আর গায়ে হাত তোলেন না, কিন্তু মার খেয়ে গায়ে যে কত কালশিটে পড়েছে তার আগে, এখনও যেন সে দাগগুলো তাজা মনে হয়। সেই সব স্মৃতিই ওঁর সম্বন্ধে আমার আতঙ্ক আরও শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কখন যে কি করে বসবেন উনি তার কোন ঠিকানা নেই। যখন উনি মারধোর করতেন, সেই বয়সে আমারও মনে একটা গোঁয়ারের মত জিদ আর বেপরোয়া ভাব জাগত, মনে হত, না হয় বেধড়ক খানিকটা পিটবেন, তার বেশী আর কি করতে পারেন? হকি বা ফুটবল খেলতে গেলেও তো চোট লাগে, আর সেটা তো সহ্য করতেই হয়। কিন্তু আজকাল ওঁর প্রতিটি ব্যবহার আমার মনে একটা রহস্যময় ভীতির সঞ্চার করে। কোন দোষ করে আমি যখন বকুনী বা মার খাবার আশঙ্কা করছি তখন উনি যদি কিছু না করে একেবারে চুপচাপ থাকেন তাহলেও আমার ভয় করতে থাকে, বোধহয় ওঁর হিসেবের খাতায় আমার নামে অনেকখানি শাস্তি ভবিষ্যতের জন্য জমা রইল। ফলে সর্বদা ভয়ে ভয়ে ওঁকে এড়িয়ে চলাই আমার স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে। মনে মনে যতই বিরূপ আর বিদ্রোহী হয়ে উঠি না কেন বাবুজীর সামনে এলে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, ওঁর সম্বন্ধে একটা আতঙ্কের অনুভূতি যেন ছড়িয়ে গেছে আমার শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরায়। মনে মনে গজরাতে থাকি, কিন্তু বাইরে উনি যা বলেন সেটা করেই ফেলি।

ওঁর কথার কি উত্তর দেব সেটা খুব ভয়ে ভয়ে ভেবে ঠিক করছিলাম। গম্ভীর

একটা দার্শনিক ধরণের ভঙ্গিতে গড়গড়ার নল মুখে বসে আছেন আর মাঝে মাঝে ঠোঁটের পাশ থেকে ধোঁয়া ছাড়ছেন। চারপাশে বেশ কয়েকটা খালি চেয়ার ও মোড়া, মনে হচ্ছে এখুনি সবাই উঠে গেছে এখান থেকে। ভুরুর ইশারায় বসতে বললেন, ততক্ষণে আমার সমস্ত সাহস উবে গেছে। কোনরকমে এককোণে বসে পড়লাম।

'ব্যাপারটা কি? বউ পছন্দ হয়নি নাকি?' খুব নরম সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন উনি। এত মোলায়েম স্বর শুনে আমি তো বেশ চমকে আরো ঘাবড়ে গেলাম। আমার তৈরী করা ভাষণের শব্দগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে মনের মধ্যে।

আমাকে নিরুত্তর দেখে, গড়গড়ায় আবার একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'সোজাসুজি বলে ফেল, এত ইতস্ততঃ করার কি আছে? শুনলাম তুমি নাকি তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলনি?'

আমি চুপচাপ বসে নিজের হাতের রেখাগুলোর দিকে চেয়ে আছি। অতসব ভেবে রাখা উত্তর প্রত্যুত্তর এখন আর মাথার মধ্যে কিছুই নেই। মনের মধ্যে একটা আবেগের বাষ্প ঘনিয়ে উঠছে।

এবার বাবুজী একটু গর্জন করে উঠে বললেন, 'বেচারী পরের মেয়ে কার ভরসায় এখানে এসেছে সে কথাটা তো একবার ভেবে দেখবে? বাড়িতে কেউ এলে কি এইরকম ব্যবহার করা উচিত? ও ফিরে গিয়ে কি বলবে বল দেখি? তোমার বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না সেকথা আমি মানছি। কিন্তু বাপু সামাজিক রীতিনীতি বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। তাছাড়া, যেটা ঘটে গেছে সেটা তো এখন মেনে নিতেই হবে। ধর যদি...' হঠাৎ আমি ডুকরে কেঁদে ওঠায় উনি কথার মাঝখানেই থেমে গেলেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও এরজন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু বাবুজীর ঐ কথাগুলো শুনতে শুনতে কেন জানিনা কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ছোট বাচ্চাদের মত হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নাক-চোখের জল মুছতে মুছতে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছি, এই সময় বাবুজী যেন অনেকটা বুঝিয়ে বলার মত স্বরে বললেন, 'যাও এমন ছেলেমানুষি করতে নেই।' চুপচাপ ওখান থেকে উঠে চলে এলাম।

নিজের পড়ার ঘরের দরজায় বসে বসে বহুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে কত কি যে মাথামুণ্ড ভেবে চললাম। এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে আমার নিজের ভুলটা কিছুতেই চোখে পড়ছিল না। আমার সমস্ত উচ্চ আদর্শ আর মহৎ আকাঙ্ক্ষার পক্ষে এই বিবাহ যে বিষতুল্য এটা তো জানতামই। কিন্তু তবু হয়ত মনে মনে এই আশা ছিল যে মেয়েটি তো শিক্ষিতা আর বুদ্ধিমতী, কাজেই আমরা পরস্পরকে বুঝতে এবং নিজেদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করব। ইচ্ছে করলে আমিও তো ওকে ফুলশয্যার রাতেই এক হ্যাঁচকাটানে খাটের ওপর শুইয়ে ফেলতে পারতাম, পাগলের মত ওর রূপের প্রশংসা শুরু করতে পারতাম, কিম্বা মুর্খ গোঁয়ারের মত একটা টিয়া বা বিড়াল নিয়ে গিয়ে খুব মেজাজ দেখিয়ে সেটাকে মেরে, সারাজীবন নিজের দাপট দেখাবার পথ করে রাখতাম। আমি তো ভেবেছিলাম

শিক্ষিত সভ্য ভদ্রলোকের মত ওসব আমি কিছুই করব না, প্রথমেই ঠিকমত নিজের পরিচয় ওকে দেব, ওর পরিচয় নেব। তারপর ওকে আমার মহৎ আকাঙক্ষা ও স্বপ্নের বিষয়ে বলব, জীবন আর জগত সম্বন্ধে আমার চিন্তা ভাবনা ওকে বোঝাব। তারপর সবকিছু ভালভাবে বোঝানো হয়ে গেলে বেশ বিনীত ভাবেই জিজ্ঞাসা করব, 'এই সব কাজে তুমি কিভাবে আমাকে সাহায্য করতে চাও বল?' কিন্তু ওর ব্যবহারে এই সবের তো কোন সম্ভাবনাই রইল না। এ সব কথা বলার সুযোগই তো পাওয়া গেল না। না, আমার কোন অপরাধ নেই বাবুজী শুধু শুধু আমার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন।

হঠাৎ মনে হল, আমি যে ওর সঙ্গে কথা বলিনি সেটা বাবুজী জানলেন কি করে? ঠিক তো! কে কথাটা তুলল ওঁর কানে? আমি তো কারো কাছে কিছু বলিনি। তার মানে ওই বলেছে। আমার তো সকাল থেকেই আশ্চর্য লাগছিল এই রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ও এমন তুচ্ছভাবে উড়িয়ে দিতে পারছে কি করে? কারো কাছে কিছু বলছে না কেন? কিন্তু ও যদি না বলে থাকে তাহলে কারো কিছু জানবার কথাই নয়। মেয়েমানুষই তো! মাকে না বলুক, মুন্নী বা ভাবীকে নিশ্চয় বলেছে। মুন্নী আর ভাবীকে জিজ্ঞাসা করব কি ? নাঃ, তাতে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ কবা হবে। ওরা তৎক্ষণাৎ গিয়ে কথাটা ওর কানে তুলে দেবে আর ও ভাববে, কি দুর্বল লোকটা! দুর্বল?...এই তো সবে আমার কাঠিন্যের একটা ঝলক মাত্র দেখেছ...

'ঠাকুরপো, কি এত ভাবছ বসে বসে বল তো?' কোথা থেকে ভাবী এসে হাজির হল, বলে উঠল, 'বিয়ে তো হয়নি, যেন সারা দুনিয়াব সমস্ত চিন্তাব বোঝা তোমাব মাথায় এসে চেপেছে মনে হচ্ছে। এমন করে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছ যে? মাথা ব্যথা করছে নাকি? লোকে দেখলে ভাববে, কে জানে কটা ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তোমায়!'

চমকে উঠলাম, যেন কিছু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি। নিজের দুশ্চিন্তা আর দুঃখ বাইরে দেখানোটাও তো একধরণের দুর্বলতা। সামলে নিয়ে বললাম, 'কিছু তো হয়নি, ভাবী, চিন্তা আবার কিসের? এমনিই বসে আছি'। আমার মনে হচ্ছিল বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষ নিজেদের মধ্যে যা কিছু কথাবার্তা বলছে সব আমাদের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে বলছে। আর ঐ সব ইঙ্গিতের খোঁচা খেতে হবে অথবা জবাবদিহি করতে হবে সেই চিন্তাতেই আমি বেজায় রকম ভীত হয়ে উঠছি।

'দেখো ঠাকুরপো, ঢাকবার চেষ্টা কোরনা, সবাইকারই চোখে পড়ছে ব্যাপারটা। দিন শেষ হতে চলল, তোমার কি ক্ষিদে তেষ্টাও পায়নি?' এরপর একটু ধূর্ত হাসি হেসে বলল, 'কি? তেমন সুবিধে হল না বুঝি?'

ঠাট্টাটা বুঝতে পেরেও আমি গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলাম, 'সুবিধে হবেও না। দেখ ভাবী, খুব কাছের লোক হলেও, তার অহংকার আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনা, তা সে যতই সুন্দরী আর লেখাপড়াজানা হোক না কেন। এমন অহংকারীদের জুতোর তলায় রাখতে হয়'। এত জোরে কথাটা বললাম কেন? বাবুজীর তখনকার প্রশ্নের

জবাবে, অথবা ঘরের মধ্যে প্রভাকে শোনাতে, না শুধুই ভাবীর কথার উত্তর দিতে, তা আমি আজও বলতে পারব না।

'ওটা তো আমাদেরও মনে হচ্ছে, ঠাকুরপো,' ভাবী একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতে এধার ওধার দেখে নিয়ে ফিস্ ফিস করে বলল, 'নিজের রূপ আর লেখাপড়া নিয়ে প্রভার একটু গুমোর আছে বটে। আর সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো, দেখতে শুনতে ভাল হলেও একেবারে পরীর ছানাও নয়। ঐ বয়সে তো সবাই সুন্দর লাগে — আমিও কি সুন্দর ছিলাম না? মা কি ছিলেন না?' বলতে বলতে অবশ্য ও নিজেই লজ্জা পেয়ে গেল।

'হু!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মাথা ঝাকিয়ে বললাম, 'ঐ রূপের দেমাকেই এই অবস্থা। যদি সত্যিই রূপসী হত তাহলে না জানি কত মাথা গরম হত', বেশ উচ্চকণ্ঠেই বললাম যাতে ওর কানে যায়।

ভাবী আমার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে একটু খোশামোদের সুরে বলল, 'দোহাই তোমার লক্ষীটি, একটু আস্তে কথা বল, এসব কথা কারো কানে গেলেই সবাই ভাববে আমিই বুঝি তোমাকে উল্টোপাল্টা বোঝাচ্ছি।'

'তুমি আর কি বোঝাবে, ভাবী? আমি নিজে কি কিছু বুঝি না? অন্ধ তো নই। তখন কতবার বলেছিলাম, এমন করে আমাকে ডুবিও না, ডুবিও না। কিন্তু তোমাদের তো একেবারে জিদ চড়ে গিয়েছিল, যেমন করে হোক ছেলেটার গলায় ফাঁসির দড়িটা পরাতেই হবে। এখন বল আমি কি করি?'

'যাকগে ঠাকুরপো, ছাড়ো ওসব কথা, কেন যে এইসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাথা গরম কর তুমি!' স্নেহমাখা স্বরে বলে উঠল ভাবী, 'চল, খাবে চল। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমারও এখন রক্ত গরম আর সেও তো ছেলেমানুষ বই নয়। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব এখন। তবে ওর এমনটা করা উচিত হয়নি। নিজেকে কি যে কেউকেটা মনে করে, আমাদের তো কথা বলার যোগ্যই ভাবে না, মুশকিল তো সেইখানে। লোকে যাওয়া আসা করছে, কারো সামনে না দেয় ঘোমটা, না টানে আঁচলটা। বাড়ি থেকে কি সব বইপত্তর এনেছে, তাই পড়ছে বসে বসে সারাক্ষণ। আর তো কিছু আনেও নি। সে সব যাই হোক, লেখাপড়ার গুমোর দেখানোর ভাবটা বেশ আছে। কিন্তু তুমি এসব নিয়ে চিন্তা করে নিজের লেখাপড়ার ক্ষতি করছ কেন?' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর আবার কি যেন ভেবে বলল, 'কাল সকালে ওই রান্না করবে। তোমার ভাইসাব তো বলেন, রান্না যা করে, নাকি একেবারে অমৃত, খেলে বহুক্ষণ ধরে আঙুল চাটতে হবে'। 'উনি জানলেন কি করে?' প্রশ্ন করে বসলাম আমি। ভাবী একটু থতমত খেয়ে গেল, তারপর সহজসুরেই বলল, 'দেখতে গিয়েছিল যখন সেই সময়ই খেয়ে এসেছে নিশ্চয়, তারপর থেকেই তো সারা বাড়িতে সুখ্যাতি করে বেড়াচ্ছে। কাল তো তুমি নিজেই দেখতে পাবে।' যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েই আবার বলল, 'আমার মাথার দিব্যি, চল তো এখন দুখানা রুটি খেয়ে আসবে, আমি খাবার বাড়ছি গিয়ে।'

সকাল থেকেই এ বাড়িতে আমার যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে, মনটা এত ভারাক্রান্ত আর বিষাদগ্রস্ত হয়ে আছে যে খাওয়া দূরে থাক, একবার তেষ্টাও পায়নি। কিন্তু এখন ভাবীর সঙ্গে কথা বলার পর কেন জানি না অনেকটা হাল্কা লাগছে। চুপচাপ রান্নাঘরে গিয়ে বসে পড়লাম। রাত্রে আবার মা এবং বাবুজী দুজনেই আভাসে ইঙ্গিতে, আর মুন্নী এবং ভাবী একেবারে খোলাখুলিই বলে দিল, 'এ সব তো হয়েই থাকে। এই ধরণের ছোটখাট বিষয় নিয়ে কি সারা জীবন লড়াই করা যায়? সাতপাকের বন্ধনে জড়িয়ে যাকে ঘরে এনেছ তার সঙ্গে ঘর তো করতেই হবে। তাছাড়া, ও বেচারাই বা এখন কি করবে? দোষ যদি করেও থাকে, এই সময় ওকে ক্ষমা করাটাই উচিত কাজ হবে। দুদিন পরে ওর ভাই আসবে নিয়ে যেতে। বাড়ি ফিরে ও কি বলবে বলতো? সারা আত্মীয় কুটুম্ব মহলে বদনাম যা হবার সে তো হবেই, তারওপর নতুন কুটুম বাড়ির সঙ্গেও সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। এবারের মত ও না হয় ক্ষমা চেয়ে নিক। কিন্তু সমস্ত পরিবেশ যেন আমার মনের মধ্যে কেমন একটা জিদ চড়িয়ে দিচ্ছিল, আমি মুন্নীকে স্পষ্ট বলে দিলাম, 'আমাকে তোমরা যদি এইখানেই শুতে দাও তো ঠিক আছে, না হলে দিবাকর বা অন্য কোন বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পড়ে থাকব।'

'একবার মাথায় গোঁ চাপলে তুমি আর কিচ্ছু বুঝতে চাওনা ঠাকুরপো। এটা কি একটা কথা হল? মাঝে মধ্যে বড়োদের কথাও একটু শোনা উচিত।'

'না ভাবী, একবার কথা শুনতে গিয়ে তো ঢের সুখ হয়েছে, এবার আমাকে রেহাই দাও তোমরা।' এদের সবার কথাবার্তায় অস্পষ্টভাবে কি একটা ইঙ্গিত ছিল কে জানে, কিন্তু এর ফলে আমার মনটা ক্রমেই আরো বিরূপ হয়ে উঠছিল আর গতকালকার ঘটনাটা ক্রমশঃই যেন আরো কয়েকগুণ বড় হয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল।

এইসময় চোখে পড়ল দরজার ওপাশে একটা ছায়া, ও এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। ওকে দেখে ভাবী দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি এনেছ? দুধ? ওমা, তুমি আনতে গেলে কেন? আর কেউ ছিলনা নাকি? মুন্নীটাও হয়েছে আজব মেয়ে! নতুন বউ, তাকে কোথায় দুদিন একটু বসতে দেবে, তা নয় এখনই ওকে দিয়ে দুধ পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজে একটু কষ্ট করে দিয়ে যেতে পারল না? আচ্ছা, আচ্ছা, এনেছ যখন, নিজে হাতেই দাও না, অত লজ্জার কি আছে?' এই সময় একটু দূর থেকে মুন্নীর গলা শোনা গেল, 'ভাবী, মা ডাকছে তোমাকে, সকালের জন্য কতটা ডাল ভেজানো হবে, এসে দেখে যাও'। 'এই যাচ্ছি', আমার দিকে একটু ইঙ্গিতবহ মুচকি হাসি ছুড়ে দিয়ে ভাবী চলে গেল। যাবার সময় ওকে নিচু গলায় বলে গেল, 'মাফ চেয়ে নাও, এসব করে কোন লাভ তো নেই, বাছা তোমাকেই একটু ঝুঁকতে হবে।'

আবার কাল রাতের সেই ঘর, লাল ইলেকট্রিক তারের ডগায় গাঢ় নীল বালব দেওয়ালের খুঁটো আশ্রয় করে জ্বলছে। ঘরটায় বেশ স্বপ্নময় পরিবেশ। বালবটার দিকে তাকিয়ে আমি চুপ করে বসে আছি, দেখলে মনে হবে যেন সমস্ত দুনিয়া সম্বন্ধে অচেতন

হয়ে কোন একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি। কিন্তু আসলে আমার সমস্ত চেতনা কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে ঐ দরজাটার কাছে। গেলাস ধরা একখানি হাত আর রেশমী শাড়ি পরা শরীরের অর্ধাংশ দেখা যাচ্ছে যেখানে। মনে মনে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম — ও এক্ষুনি এসে ক্ষমা চাইবে তারপর দুধটুকু খেয়ে নেবার অনুরোধ করবে এবার আমিও ওকে ক্ষমা করে দেব, নাহলে ফিরে গিয়ে আমাদের বাড়ি সম্বন্ধে নিশ্চয় অনেক কথা বলবে, সেটা আমারও ভাল লাগবে না। আমি মানুষটি কি রকম জেদী তা তো ও বুঝেই গেছে ভালভাবে।

একমিনিট...দুমিনিট...পাঁচমিনিট...দশমিনিট...অনেকক্ষণ হয়ে গেল, বোকা বোকা লাগছে এরকমভাবে বসে থাকতে। হঠাৎ যেন কোন কথা মনে পড়ে গেছে এমনভাবে একটা ঝটকা সতেচন হয়ে বসলাম, কিন্তু দুই হাঁটুতে হাত রেখে এমনভাবে বসে রইলাম যেন এক্ষুনি উঠতে যাচ্ছি। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এমনভাবে চলতে শুরু করলাম যেন দরজার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে বলে জানিই না আমি। একেবারে নির্লিপ্তভাবে ওর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বেরিয়ে এলাম দরজা দিয়ে, ও তখনও দুধের গেলাস হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বেরিয়ে আসার সময় দ্বিধাজড়িত ফিসফিসে স্বর শোনা গেল — 'শুনুন!' আমি কিন্তু কিছুই শুনলাম না, এমন হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলাম যেন কারো জন্য আমার কিছুমাত্র চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আজকেও ছাদ পড়ে আছে খোলা আকাশের তলায়।

সে রাতে আমি দুটো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। প্রথম এখন ও নিজে থেকে কথা বলুক বা না বলুক, আমি আর কথা বলব না। যতদূর সম্ভব ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না এবং কোনরকম দুর্বলতাও দেখাব না। দ্বিতীয় — খুব মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দেব এবং আমার পুরনো কর্মধারার মধ্যে এমনভাবে ফিরে যাব যেন ইতিমধ্যে কোন কিছুই ঘটেনি। যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন তা চুকেবুকে গেছে।

সকালবেলা রান্নাবান্না হল। কথা না বলার সিদ্ধান্ত আমার এখনও অটুট। কিন্তু রাত্রে যে স্থির করেছিলাম ওর সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখব না, সেটা এখন যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হতে লাগল। কথা না বলা এবং নিজের দিক থেকে একটু নতিস্বীকার না করা, এ পর্যন্ত তো ঠিকই আছে। কিন্তু ওর হাতের রান্না — অন্তত একবার চেখে দেখার খাতিরেও যদি খাই তাতে নিশ্চয় কোন অন্যায় হবে না। অবশ্য হ্যাঁ, যদি কেউ এসে সাধ্যসাধনা করে তবেই খেতে যাব। ও আর কি করে করবে। যদি...

ওর হাতের রান্না আমাকেই প্রথম খেতে হবে। বিয়ে উপলক্ষ্যে বাড়িতে যে কতরকম আচার অনুষ্ঠান চলেছে আমি সে সবের কোন খবরই রাখি না। আশেপাশের থেকে মহিলাদের ফৌজ রোজ বেলা তিনটে নাগাদ এসে হাজির হয় আর তারপর রাত এগারোটা পর্যন্ত চলতে থাকে কান ফাটানো ঢোলের বাদ্যি। মুন্নীটারতো গাইতে গাইতে গলাই ভেঙ্গে গেছে। পাড়ার বুড়ী গিন্নিদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে করতে আর তাদের

জন্য পান সাজতে সাজতে ভাবী একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে। প্রভা হয়ত একা ঘরে বসে কোন বই পড়ছে বা তার সমবয়স্কাদের সঙ্গে কথা বলছে, ভাবী সেখানে পানের ডালা আর পানদান রেখে দিয়ে যায়। যখন শোনে কেউ বলছে, 'ছোট বউ কিন্তু বড়র চেয়ে দেখতেও সুন্দর আর শান্তশিষ্টও বটে' তখনই তাড়াতাড়ি এসে বলে ওঠে, 'ওমা, এখনও তোমার পানসাজা হয়নি বউ'? ওদিকে মা আর মাসীমা তো আমাকে কেবল তাগাদা দিচ্ছেন, 'যা, যা, পান নিয়ে আয় — দাও, দাও আমি চটপট সেজে ফেলি, নতুন বউ কিনা তাই লজ্জায় হাত চলছে না'। তারপর কয়েকটা সাজা পান নিয়ে গিয়ে আবার বসে বাইরের আড্ডায়, বিয়েতে পাওনা কি রকম-খোলো হয়েছে সেই আলোচনায় মেতে যায়।

আমি তো ভাবীকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি শুধু খাবার নয়, ওর হাতে আমি কোনকিছুই খাবনা। আসলে আমি দেখতে চাইছিলাম এ কথা শুনে ও কি বলে! এই রকম সময়ে মা এই প্রথমবার বলল, 'অমন করতে নেই রে, এই হল নিয়ম, এমন করে অন্নদেবতাকে অপমান করা কি উচিত?' এত কাণ্ড হয়ে যাবার পর এই প্রথম দেখছি মা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে। মা যে আমাকে বকাবকি করছে না কেন সেটাই আমার আশ্চর্য মনে হচ্ছিল। বাড়ির সবাই যেন অপ্রত্যাশিত রকমের শালীনতাবোধের পরিচয় দিচ্ছে, দেখে শুনে আমার মনে হচ্ছে, আমি যা করছি তাতে এরা বোধহয় খুশিই হচ্ছে। অথচ মা প্রতিকথায় বকাবকি করে থাকে, কিন্তু এখন একেবারে চুপ। কেবল মাঝে মাঝে খুব আস্তে আস্তে মাসীকে বলে, 'কি আর বলব পুনো, বিয়ে দেবার সব আনন্দই নষ্ট হয়ে গেল, এর পরের কথাগুলো মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে যেন চাপা পড়ে যায়।

খাওয়ার জন্য আমার যখন ডাক পড়ল সে সময়ে রান্নাঘরে মা, মুন্নী, ভাবী, অমর ইত্যাদি সবাই বসে ছিল। গুরুজনদের সামনে আব্রু রক্ষার জন্য রান্না এবং খাওয়ার জায়গার মাঝখানে একটা বুকসমান উঁচু পাঁচিল তোলা আছে। ও ছিল তারই আড়ালে। কেমন ভাবে বসে রান্না করছে তা অবশ্য দেখতে পাইনি, কিন্তু থালায় খাবার ও বাটিগুলো সাজানোর কাজে রত হাত দুখানি চোখে পড়েছিল। এই প্রথমবার আমার নজরে পড়ল হাতের রং বেশ ফরসা এবং করতল ও নখগুলিতে মেঁহেদি আঁকা। হালফ্যাসানের লম্বা নৌকার মত গড়নের সোনার আংটি দুই আঙুলে, এক হাতে কাঁচের চুড়ির মাঝে মাঝে সোনার চুড়ির ঝিকিমিকি, অন্যহাতে কালো রেশমী ব্যাণ্ডে বাঁধা ছোট্ট রিস্টওয়াচ। মনে হল হাতদুখানি ভারি সুন্দর, আঙুলগুলি সরু আর সুকুমার। এই প্রথম ওর মুখখানা ভাল করে দেখতে ইচ্ছা করল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের এইসব বোকামিতে নিজেই চটে উঠলাম।

দুখানি কম্পিত হাত থালাখানা এগিয়ে ধরল, ভাবী ওর হাত থেকে থালা নিয়ে রাখল আমার সামনে। চারপাশ থেকে সবাই এমনভাবে ঝুঁকে দেখতে লাগল যেন আমি এখনি কিছু একটা ভোজবাজী দেখিয়ে ফেলব। থালায় ছিল দু ভাঁজ করে রাখা ছোট

ছোট পাতলা দুখানি রুটি, তিন রকম তরকারী, একরকম ডাল, রায়তা, দুরকম চাটনী, পাঁপড় আর আচার। দেখে তো জিভে জল এসে গেল আমার। ঢোক গিলে একটু হেসে থালাটা কাছে টেনে নিলাম। বেশ যত্ন করে একটুকরো রুটি ছিঁড়ে ডালে ডোবালাম। রান্নার প্রশংসা আমি কি ভাবে করব তাই শোনার জন্য উৎসুক হয়ে আছে সবাই। কিন্তু প্রথম গ্রাস মুখে তুলেই আমাকে প্রায় আর্তনাদ করে ছুটে বেরিয়ে আসতে হল। বাইরে এসেই মুখের গ্রাস উগরে ফেলে দিলাম, চোখে জল এসে গেছে তখন আমার।

সবাই অবাক হয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে — হলোটা কি? মনে হল যেন প্রভার হাত থেকে রুটিবেলার বেলনাটা পড়ে যাবার শব্দ হল। 'হল আমার মাথা, ডাল একেবারে তেতো বিষ করে রেখেছে। এমন ছাপ্পান্ন ভোগ আমার খেয়ে কাজ নেই', এই বলে একটা টুকরো ছিঁড়ে নাটকীয় ভাবে শহীদ হওয়ার ভঙ্গিতে মাথায় ঠেকিয়ে তারপর এক ধাক্কায় থালা বাটি সব উলটে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। একবারও পিছন ফিরে দেখিনি। মনে হচ্ছে যেন একটা কান্না জড়ানো স্বর শুনেছিলাম, 'আমি তো ডাল চেখে দেখে নিয়েছিলাম'। সোরগোল বেশ ভালরকম হল। ভাবী ফোড়ন কাটল, 'রান্নাবান্না কিছুই জানেনা, এখন সবই শেখাতে হবে। মেয়ে দেখানোর সময়ে কে জানে কার হাতের রান্না খাইয়েছিল! এদিকে আবার হাতে রিস্টওয়াচ বেঁধে রাঁধতে যাওয়া হল। উনুনের পাশে ঘড়ির দরকারটা কি শুনি? হয় ফ্যাশান কর, আর নয়তো মন দিয়ে কাজটা কর। আরে বাবা, প্রথমবারটা অন্তত ভাল করে, যত্ন করে খাইয়ে দিতিস! এর পর যদি অমৃতও রাঁধিস তবু এ দিনটার কথা তো সবার মনে থাকবেই'। মা গজগজ করছে রেগে, 'আবার বলা হচ্ছে, ডাল নাকি উনি চেখে দেখেছেন! আরে, তোদের বাড়ি বেশী নুন খায় বলে আমাদেরও খেতে হবে? না হয় একটু কম করেই দিতিস। পাতে একটু নুন চেয়ে নিলে তোর কি এমন মানের হানি হত? নাও, এখন এঁকে সব শেখাও বসে বসে। বিয়ে দিয়ে আমার তো ভারি লাভ হল। না পেলাম ভাল মেয়ে, না পেলাম...' মুন্নী কিন্তু কি জানি কেন একবোরে চুপ করে ছিল। আমার মনে হল ও যেন প্রভার দিকে।

পরের দিন ওর ভাই এল এবং ও চলে গেল তার সঙ্গে। জীবনে কটা দিন একটু তোল-পাড় হল, অনেক কথা উঠল, আবার দিন চলতে লাগল আগের মতই। কদিন পরেই রান্নাঘরের ডাল ঘী আর বিবিধ সুখাদ্যের সুগন্ধ যেন মনে হতে লাগল কতকাল আগেকার কথা।

✱

★

চার

'সমর ভাইয়া এদিকে একবার দেখো', নিচে থেকে অমরের গলা শোনা গেল। ভাইসাহেবের সাইকেলটা সাফ করছিল অমর। নিচের দিকে ঝুঁকে দেখতে পেলাম দুজন স্বয়ংসেবক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিচে নেমে গেলাম। 'কদিন আপনার দেখা নেই, আমরা ভাবলাম বুঝি শরীরটরীর কিছু...'। ইদানিং আমি সকালে ব্যায়াম করতে যেতাম শাখায়, সন্ধ্যায় যেতাম 'বৌদ্ধিক' এ যোগ দিতে। বিয়ে আর নিজের মানসিক উদ্বেগের জন্য এ কদিন ওদিকে যেতে ইচ্ছেই করেনি। অনেক কষ্টে তাদের বিদায় করে, নেহাৎ উদাসীন অলস পদক্ষেপে ফিরে এলাম। এরা নিশ্চয় আবার আসবে এই আশঙ্কা এখন আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল।

সত্যি, ও যেন এল ঝড়ের মত আর ফিরে গেল ঢেউয়ের মত, কিন্তু তারই মধ্যে এ বাড়ির স্বাভাবিক গতিস্রোতকে দিয়ে গেল একটা তুমুল ঝাঁকানি। মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এবং তা সংসারকে কতখানি প্রভাবিত করেছে সেটার সঠিক পরিমাপ করার মত মনের অবস্থা এখনও আসেনি। আমার তো মনে হয় বিপদ এসেছিল এবং কেটেও গেছে। সেই যে কথায় আছে না —'দূর থেকে যে বিপদকে পর্বতের মত বিশাল আর ভয়ঙ্কর দেখায় সেই বিপদও একেবারে সামনে এসে পড়লে তাকে অতিক্রম করার মত পাকদণ্ডির পথও কোথাও না কোথাও ঠিকই নজরে পড়ে।' মা একবার কাকে যেন বলেছে, ' আমার ছেলের আবার মেয়ের অভাব? সমরের আমরা আবার বিয়ে দেব'। কথাটা শুনতে পেয়ে আমি বোধহয় জীবনে এই প্রথম অথবা দ্বিতীয়বার উঁচুগলায় ধমকে উঠেছি, 'একটা বিয়েতেই ঢের হয়েছে, এবার দয়া করে আমাকে পড়তে দাও।' মা আর কিছু বলেনি। মনে মনে হয়ত ভেবেছে আজ তার সঙ্গে কথা বলেনি, দুমাস চারমাস হোক বা এমনকি দু এক বছরও যদি কথা না বলে তবুও হাজার হোক, বিয়ে করা বউ তো? দুজনের ভাগ্য যখন একসঙ্গে বাঁধা পড়েছে ঘর তো করতেই হবে।

আমার জেদের জন্য আগে থেকে দেনাপাওনার বিষয় কিছু স্থির করা যায়নি, আর যেটুকু আশা করা গিয়েছিল তাও পাওয়া যায়নি, কাজে কাজেই, প্রায়ই শুনি মা বলছে, 'কি আর বলবরে চন্দন, বিয়ের সব আনন্দই মাটি হয়ে গেল'। চন্দন আমার মামার নাম। উনিই এ বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। তাই মা বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে, 'মেয়েটা লেখাপড়া জানে ব্যস, এইটুকু ছাড়া আর কিছুই কি তোর নজরে পড়েনি?'

বিয়ের সময়কার সেই লোকদেখানো আড়ম্বরের ভাব কবেই চুকে গেছে। এখন আবার কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে প্রতিদিন। চিনিওয়ালা, গমওয়ালা ইত্যাদির পাওনা মেটানোর উপলক্ষ্যে বাড়িতে রোজ কুরুক্ষেত্র হয়ে যাচ্ছে। প্রায়ই দেখি বাবা অকারণে মা এবং ভাইসাবকে বকে উঠছেন, 'এরপর চলবে কি করে, সে কথা

কেউ একবার ভেবে দেখেছ?' ওঁর পেনশন মাত্র পঁচিশটি টাকা। মাগগি ভাতা ইত্যাদি সব মিলিয়ে ভাইসাব পান নিরানব্বই টাকা। বিয়েতে একটা সাইকেল পেয়েছিলেন, আজও সেটাই টেনে বেড়াচ্ছেন। রোগব্যাধিতে জর্জর শরীর নিয়ে মা চারপাইতে বসে মালা জপতে জপতে সারাক্ষণই বিড়বিড় করে বকছেন। দু তিনটি ছেলে-পিলের পড়ার খরচ আছে। অমর ম্যাট্রিক দেবে, সবার ছোট কুঁয়র এখন পড়ছে ষষ্ঠ শ্রেণীতে। মুন্নী তো আছেই। আমাকে তো এবার ইন্টারমিডিয়েটটা পাশ করে নিতেই হবে।

আমাদের পরিবারে মুন্নীর ভাগ্যটাই সবচেয়ে খারাপ। আমার চেয়ে দু বছরের ছোট। বছর দুই তিন আগে, ওর বয়স তখন ষোল কি সতেরো, লেখাপড়া ছাড়িয়ে ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। মেয়ের এতখানি বয়স হয়ে গেছে এই অপরাধের খেসারত হিসেবে বাড়ির কিছু জিনিসপত্র এবং ভাইসাহেবের বিয়েতে পাওয়া কিছু জিনিস বিক্রি করে পাত্রপক্ষের দাবী মেটানো হল। উঃ কি জ্বালাতনটাই না করেছিল বরযাত্রীরা এসে! এটা চাই, ওটা চাই, আমাদের ঠিকমত খাতির যত্ন হচ্ছে না — এই সব। এরপর শ্বশুরবাড়ী থেকে মুন্নীর যে সব চিঠি আসত তা শুধু দুঃখের কাহিনীতে ভরা। এখানে এলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। শাশুড়ী আর স্বামী দুজনে মিলে যা সব অত্যাচার চালাত ওর ওপর সেগুলো বেচারী মুখফুটে কাউকে বলতেও পারত না। ওর স্বামীর চালচলন কেমন ছিল, রাতের বেলা কোথায় ছিল তার আনাগোনা, সে সব তো আমরা জানতে পেরেছি অনেক পরে। প্রথম এক দেড় বছর তো কেঁদে ককিয়ে কোন রকমে জোয়াল টানছিল, তারপর শাশুড়ী মরতেই ওর মাথায় যেন একেবারে পাহাড় ভেঙে পড়ল। এখন ওর স্বামীদেবতাটিকে বাধা দেবার তো কেউ রইল না, সে একেবারে বাড়ীতেই এনে তুলল একজনকে, শোনা গেল সেটি নাকি ব্রাহ্মণ কন্যা। দিনের পর দিন না খেয়ে, উপোষ করে স্বামী আর তার রক্ষিতার ঝিগিরি করতে হত মুন্নীকে। আরও যে কত অত্যাচার ও সহ্য করেছে, সব কথা জানিই না। মুন্নী নিজে থেকে তো কিছু বলত না। নিজেরা যখন ফূর্তি করত সেই দৃশ্য দেখিয়ে ওকে কষ্ট দেবার উদ্দেশ্যে ওর দুই করতলের ওপর খাটের পায়া চাপিয়ে রাখত সারা রাত। একদিন খুব ভোরে মুন্নী ফিরে এল আমাদের বাড়ীতে, ওর সারা দেহে তখন চাবুকের লম্বা লম্বা ফুলে ওঠা নীল দাগ। তারপর থেকে ও এখানেই আছে।

এখন ওকে দেখলেই মনের ভিতরটা এমন করে ওঠে — ইচ্ছে হয় ওর স্বামীটাকে ধরে এনে বাজারে সবাইকার সামনে আচ্ছা করে চাবুক পেটা করি, বলি 'ওরে রাক্ষস, আমার ফুলের মত বোনটাকে কি এইজন্য তোর হাতে দেওয়া হয়েছিল? চাবুক দিয়ে মারলে কেমন লাগে এইবার দেখ'। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে মনে মনে আমি লোকটাকে এমন প্রহার দিই যে কল্পনায় যেন দেখতে পাই তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। কিন্তু মুন্নীটা এসব নিয়ে কিছু ভাবে কিনা তা আমার জানা নেই। আরও চুপচাপ এবং নির্লিপ্ত হয়ে থাকাটাই ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই যখন নিচে ও হয়ত তখন

একলা ওপরে শূন্যদৃষ্টিতে একদিকে চেয়ে বসে থাকে, আবার ওপর থেকে নিচে যখন নামে এত সঙ্কুচিত হয়ে থাকে যে মনে হয় নিজেকে সবাইকার দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পারলেই ও যেন বাঁচে। কি যে মাথামুণ্ডু ভাবে কে জানে, মনে হয় ভিতরে ভিতরে একটা যন্ত্রনা ওকে পিষে ফেলছে। ক্রমশঃই ও যেন শুকিয়ে উঠছে আমাদের চোখের সামনে। আঠারো উনিশ বছরের ঝকমকে মুক্তোর মত ওর উজ্জ্বল যৌবন, কি গভীর দুঃখ আর দুশ্চিন্তার করালগ্রাসে পড়ে ম্রিয়মান হয়ে রয়েছে। কিন্তু কিই বা করার আছে? খুব সম্ভব সারাটা জীবনই ওর এখানেই কাটবে। বাবা ঐ লোকটাকে কত চিঠি লিখেছেন, এই শহরের এবং বাইরের থেকেও পরিচিত আত্মীয় বন্ধু সবাইকে দিয়ে কত চেষ্টা করিয়েছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। ও নিজে তো তেমন কিছু লেখাপড়া শেখেনি, এখন যদি খুব মন দিয়ে লেখাপড়া শুরু করে তাহলে পাঁচ ছয় বছরে একটা তিরিশ, পঁয়ত্রিশ টাকার শিক্ষিকার চাকরি হয়ত জুটতে পারে। সেলাই ফোঁড়াই শিখতে হলেও তো দু এক বছর সময় লাগবে। তার খরচ জোটানোও এক সমস্যা। এখানে তো ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতেই অসুবিধা হচ্ছে। মুন্নী যখন ফিরে এল, প্রথম প্রথম সবাই খুব সহানুভূতি দেখিয়েছে, সাহস দিয়েছে, কিন্তু এখন ওর জন্য কিছু করার কথা প্রায় সবাই ভুলে গেছে। ভুলতে পারেনি কেবল ও নিজে যে এই সংসারের ওপর একটা বোঝার মত চেপে রয়েছে।

বিয়ের পর থেকেই আমার মনে হচ্ছে, আজকাল যেন সবাই ইচ্ছে করেই বাড়ীর আসল অবস্থাটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছে। আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে তা তো মনেই থাকে না। সে যেন অন্য কেউ। আজকাল তো এ বাড়িতে কেউ নতুন বউয়ের নামও করে না। আমার বিরূপ মনোভাবকে যেন একটু অনাবশ্যক বেশীরকম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একটি বাইরের মানুষকে এ সংসারের একজনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে এ কথাটাই যেন সবাই ভুলে গেছে। মন মেজাজ ভাল থাকলে ভাবী অবশ্য মাঝে মধ্যে হেসে বলে, 'ভেবোনা ঠাকুরপো ঠিক শোধে বোধের হয়ে যাবে। মেয়েমানুষকে দাবিয়ে রাখলে বশ মানে না। তার ওপর আবার প্রথম থেকেই যার একটু অহংকার আছে তার তো কথাই নেই। আমাদের বাবা বলতেন, 'মেয়েমানুষ তো কাঠের পুতুল, একটু আশকারা দিলেই আর রক্ষে নেই। যতই লেখাপড়া কর আর যতই স্বর্গের অপ্সরী সেজে থাক না কেন, সেই কাজ তো তোমাকে করতেই হবে। পুরুষমানুষ কাজ ভালবাসে, চামড়া নয়। লক্ষ লক্ষ বই হয়ত পড়ে ফেলেছ, এদিকে কাজ জাননা কিছুই, এতে লাভটা কি? 'আমাকে তো ঠাকুরপো তুমি গভীর ঘুম থেকেও যদি ঠেলে তুলে দাও, তাহলেও দেখবে রান্নায় নুন মশলা একেবারে ঠিকঠাক পড়বে, এতটুকু যদি উল্টোপাল্টা হয় তো আমার নাক কেটে ফেলব।' এরপর আবার নিজের বাপের বাড়ির গল্প শুরু হবে, 'আমার বড়দার যখন বউ এল, প্রথম প্রথম ঠিক এমনি ছিল তার রকম-সকম, কারোকে যেন তোয়াক্কাই করে না। আমার দাদা এসব সহ্য করার পাত্রই নয়,

এমন ঝাড় দিল যে দুদিনে সব ঠিক! কারো কারো তো স্বভাবই অমন হয় গো মার-ধোর না খেলে তারা সিধে রাস্তায় চলতেই শেখে না। এখন আমার ভাবী একদম শায়েস্তা হয়ে গেছে, দাদার ভুরু কুঁচকে উঠছে দেখলেই ভয়ে একেবারে পাতাটির মত কাঁপতে থাকে।' নিজের হাতখানা নেড়ে সেই কাঁপুনির ধরণটাও দেখিয়ে দিল ভাবী। কেন জানিনা আজকাল আমার মনটা বড় বিমর্ষ হয়ে থাকে, শরীরটাও যেন ঠিক নেই। সর্বদা বাড়িতে এই পয়সাকড়ির টানাটানি নিয়েই আলোচনা চলছে। প্রত্যেকের কথাবার্তার মধ্যেই একটা ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট, —'আমাদের সাহায্য কর'। আমার তো এদের সামনে যেতে ভয় করে। একদিন সোজা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোমরা কি চাও, এফ, এ পরীক্ষাটা আমি দেব, কি দেবনা?' তৎক্ষণাৎ দাদা বলে উঠলেন, 'পড়তে তোমাকে কে বারণ করেছে শুনি?' আমার বলতে ইচ্ছা হল, তাহলে দিনরাত এই খিচ খিচ বন্ধ কর। আমাকে পড়তেও দেওয়া হচ্ছেনা, আবার এদিকে পড়ানো হচ্ছে বলে কৃতজ্ঞতাও আশা করা হবে!

যার যা খুশি বলুকগে, কোন দিকে কান দেবনা, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যাব এরকম একটা বাসনা মাঝে মাঝেই প্রবল হয়ে ওঠে মনের মধ্যে। কিন্তু এ ছাড়াও আরো একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে এটাও যেন অনুভব করছি। আগে যেমন একটা স্বাভাবিক নিশ্চিত প্রত্যয়ে মন স্থির থাকত, উজ্জ্বল আর উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্নে সদাই আলোকিত হয়ে থাকত হৃদয়, সে আলো যেন ক্রমশঃ নিভে আসছে। ভবিষ্যতে কি করব তা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণা আর বিরক্তি যেন মনের ভিতর কঠিন ধাতুপিণ্ডের মত জমাট বেঁধে রয়েছে আর এইসব কথাবার্তা হাতুড়ির আঘাতের মত ধাক্কা মারছে গিয়ে তারই ওপরে, সমস্ত অন্তর্লোকে ক্ষুব্ধ, সন্ত্রস্ত, অসীম শূন্যতাভরা বেদনা ঝনঝনিয়ে বেজে উঠছে। বাড়িতে থাকতে ইচ্ছেই করেনা। দুবেলার আহার আর শোওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে থাকতেই হয়। আগেও মুখ বুজেই থাকতাম, এখনও তাই থাকি। কিন্তু আগে চুপচাপ থাকতাম কারণ তখন আমার মন ছিল তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। কিন্তু এখনকার এই মৌনতা করাতের মত আমার ভিতরটা যেন চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। কোন কাজেই মন দিতে পরিনা। ডেমোক্লিসের ঝুলন্ত তরবারির মত বোর্ডের পরীক্ষা তার নিশ্চিত ক্রুর, মন্থর গতিতে ক্রমাগতই কাছে এগিয়ে আসছে। পরীক্ষার কথা মনে পড়লেই কশাই এর ছুরির নিচে পড়া পাঁঠার মত কেঁপে ওঠে আমার সারা মনপ্রাণ। কলেজে ক্লাস থাক বা না থাক, বেলা দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত সময়টা আমি এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে কাটিয়ে দিই। হস্টেলে কারো ঘরে গিয়ে বসি, নয়তো কারো বাড়িতে চলে যাই। কি যেন ছিল আমার, তা হারিয়ে গেছে, অথচ সেটা যে কি তাই বুঝতে পারছি না। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার আজকাল বেশ বুঝতে পারি, — সবাই ভাবে আমি একটি অপদার্থ, কোন কাজকর্ম নেই, সদাসর্বদা মুখ হাঁড়ি করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওদের চোখে ফুটে ওঠা অবজ্ঞা আর

অশ্রদ্ধা আমার মনের সমস্ত কোমল ভাবকে যেন তীব্র অ্যাসিডের মত ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। যখন নিতান্ত অসহ্য লাগে, বাইরে পার্কে গিয়ে বসে থাকি। বসে বসে তিন চার ঘন্টা কেটে যায়। উঠতে ইচ্ছেই করেনা। বসে বসে কত কথাই ভাবি। অথচ কি যে এত চিন্তা করি, নিজেই তা আর মনে রাখতে পারিনা। হঠাৎ একসময় মনে পড়ে যায় বিনাকারণে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল, তখন পাদুটো জোর করে টেনে বাড়ি ফিরে আসি। বাড়িতে কে এলো, গেল সে সব জানবার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই মনে। নিজেকে লক্ষবার ধমক দিই, আগের মত নিশ্চিন্ত থাকবার চেষ্টা করি প্রাণপণে, কিন্তু মনের ভার এতটুকুও কমেনা।

ব্যর্থ, ব্যর্থ, সমস্ত জীবনটাই আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। জীবনের বিগত দিনগুলো হয়ে গেল নিরর্থক উদ্দেশ্যহীন, আর ভবিষ্যৎ দিনগুলোর সামনে খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় দেওয়াল। সেদিকে পথের কোন চিহ্নমাত্র নেই। কিছু করতে গেলেই মনে হয়, কি হবে? কি লাভ? সংসারের সবকিছুই যেন অনর্থক, অনাবশ্যক। রসভরা একটা স্পঞ্জকে নিষ্ঠুর মুঠোর মধ্যে পিষে নিংড়ে ফেললে যেমন শুষ্ক হয়ে যায় আমার জীবনটাও হয়ে গেছে ঠিক সেইরকম। চোখের দৃষ্টি আর মনের ভিতরটা যেন কুয়াশায় ছেয়ে গেছে, তুষারের মত একটা হিমশীতলতায় নিষ্প্রাণ হয়ে গেছি আমি।.

মাকড়শার জালে আটকা পড়া মাছির মত আমিও একটা জালের মধ্যে আটকে গেছি, এই জটিল সমস্যা বিন্দু বিন্দু করে শুষে নেবে আমার সমস্ত প্রাণশক্তি, তারপব ছিবড়ের মত আমার কঙ্কালটাকে ফেলে দিয়ে যাবে নিজে নিজে মরবার জন্য। নিজের চোখে দেখছি, অনুভব করছি আমার চোখের আলো নিভে আসছে, ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একে ঠেকাব কি করে? বাড়িতে অহরহ এই খিটিমিটি, নিজের মনের মধ্যে অপরাধের গ্লানি আর অনুশোচনা, এ যেন এক জতুগৃহ, ধূ ধূ করে জ্বলছে।

কলেজে ছেলেগুলোকে দেখি কারণে অকারণে কেমন হো হো করে হাসছে, কোন ভাবনা চিন্তা নেই, কখনও এর পেছন লাগছে কখনও ওর পেছনে লাগছে। আমার মনে হয় এদের কাউকে আমি চিনিনা। এই যে পথচলতি মেয়েদের দেখে আওয়াজ দেওয়া, ইশারা করা, ওদের পেছন পেছন ঘোরা, অথবা ধর্মশালায় আগত শরণার্থিনী মেয়ের সঙ্গে ভাব জমানো, সত্যি মিথ্যে গল্প ফাঁদা, অভিনেতা বা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নিয়ে তর্কে মেতে ওঠা এই সবকিছুই আজকাল আমার কাছে মিথ্যে, অর্থহীন মনে হয়। শুধু তাই নয় যেখানে বুদ্ধিমান ভালছেলেরা রাজনীতি আলোচনা করছে, ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর, কম্যুনিজমের বিপজ্জনক প্রভাব সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছে সেখানেও যেতে ইচ্ছে করেনা। মনে হয় এরা যে সব বিষয় নিয়ে কথা বলছে তার সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। এরা দিনরাত এত বক বক করে কেন; চুপ করে থাকতে পারে না? অত্যন্ত বিরক্ত লাগে আমার। এত নাচাকোঁদার দরকারটা কি বোকার মত? আরে বাবা, হতে পারে মধুবালা দুনিয়ার সবথেকে সুন্দরী অভিনেত্রী, কিম্বা অশোককুমার এই বুড়োবয়সেও

অভিনয়ে একেবারে মাৎ করে দিতে পারে — কিন্তু তাতে তোমার আমার কি যায় আসে শুনি? আসল খেলার চেয়ে তার রানিং কমেন্ট্রি শোনা অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক তা না হয় মানলুম, স্ট্যালিনের কন্যার নানান রকম কীর্তিকাহিনী ক্রমশঃ ফাঁস হয়ে যাচ্ছে — বেশ কথা, কিন্তু তাতে হলটা কি? তোমরা কি চাও বলতে পার? মোটের ওপর এই পৃথিবীর সব কিছুই একেবারে অন্তঃসারশূন্য অনাবশ্যক মনে হচ্ছে, জীবনটা অতি নিরানন্দ। মাঝে মাঝে এদের ওপর বড় ঈর্ষা হয়, মনে হয় আমি কেন ওদের মত মনখুলে হাসতে পারিনা? রাস্তায় পড়ে থাকা খালি সিগারেটের প্যাকেটটা একটা জুতোর ঠোক্করে দূরে ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে কেন করেনা? কি যে করি আমি! মনটা যেন একেবারে মরে গেছে। কলেজের ছেলেগুলোর মুখে ক্রমাগত 'অপয়া' 'অলুক্ষুণে' এই সব শুনতে শুনতে আমার আজকাল মনে হয় যেন বয়সটা হঠাৎ আরো বিশবছর বেড়ে গেছে। একটা গভীর নৈরাশ্যবোধ, একটা সূক্ষ্ম অথচ সর্বব্যাপী ক্লান্তির ভাব ছড়িয়ে গেছে আমার প্রতিটি শিরা উপশিরায়।

ঐ যে গৈরিক পতাকা উড়ছে মেঘের সীমানা ছাড়িয়ে যেন ক্রমশঃই আমার কাছ থেকে আরো দূরে দূরান্তরে সরে যাচ্ছে। কতকাল হয়ে গেল একটা সিনেমাও দেখিনি। সেই বিয়ের সময় দু একটা দেখা হয়েছিল। কি জানি কেন মনের মধ্যে এইরকম একটা ধারণা হয়ে গেছে যে বিয়ে করার পর মা বাবার কাছে পয়সা চাওয়ার অধিকার আর আমার নেই। কেবলই হতাশা...আমি একেবারে নিঃসঙ্গ একাকী! মাঝে মাঝে যখন 'গীতা' পড়ি, মন কিছুটা শান্ত হয়। মন্দিরের একপাশে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে। শুধু ঐ সময়টুকু মনে হয়, বুঝি সবকিছু ভুলতে পেরেছি। অগুরু ধূপের সুগন্ধী ধোঁয়া যেন আমার দুশ্চিন্তা আর কষ্টের ভারে ফেটে পড়া শিরা আর ধমনীতে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। ওখান থেকে ফেরার সময় মনে হয়, আবার তো সেই চিৎকার চেঁচামেচি ভরা সংসারেই ফিরে চলেছি যেখানে মানুষ সর্বদা পিষে যাচ্ছে। কিন্তু একটা ঘটনার পর থেকে মন্দিরে আসাও ছাড়তে হয়েছে। কুর্তা-পাজামা পরা এক রোগা নেহাৎ দুর্বল, আধমরা পাঞ্জাবী শরণার্থী মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ে মিনমিনে সুরে প্রসাদ ভিক্ষা করছিল। পূজারীজী বাইরে বটগাছের তলায় যে ধূনী জ্বলে, সেখান থেকে কাঠ তুলে নিয়ে যেভাবে সেই লোকটিকে কুকুরের মত মেরে তাড়ালেন — সেই দৃশ্য দেখে আমার ভিতরে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারিনি, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছি, যেমন করে ছ'তলা বাড়ির ওপর থেকে লোকে নিচের দৃশ্য দেখে। কিন্তু মন্দিরে যাওয়া আমার সেদিনই শেষ।

কেবলই মনে হয় সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে আমাকে এইভাবে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে। সোজাসুজি কেউ কিছু বলেনা, কিন্তু আমার প্রতি সবারই একটা রীতিমত অপমানজনক উদাসীনতা — তাছাড়া ইশারা ইঙ্গিতে নানারকম ঠেস দেওয়া কথা — এই সব আমাকে দিনরাত যেন ক্ষতবিক্ষত করছে। সবাই যেন আমার ওপর চটে রয়েছে, আমায় ঘৃণা

করছে, সবাইকারই চোখে মুখে আমার প্রতি তীব্র তিরস্কারের ভাবটা অতি স্পষ্ট। আমার কেমন যেন ভয় করছে। বাড়ি ফিরতে আতঙ্ক বোধ হয়।...আমার বিয়ে দিয়ে তোমাদের আশা পূর্ণ হয়নি...সেটাও কি আমার অপরাধ? মাঝে মাঝে মনটা এত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, মা আমাকে কাছে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে না কেন? ভাইসাবের তো আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখবারও ফুরসৎ নেই। বাবুজীর প্রতি আমার এই ভীতি কি দিনে রাতে ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে?

প্রভার কথা আমি একেবারেই ভাবতে চাই না কিন্তু বাড়িতে তো সর্বদাই ওর নিন্দা চলেছে, তার কিছু না কিছু অংশ প্রায় প্রতিদিনই আমার কানে এসে পৌঁছয় এবং মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে। এদের কি আর কোন কাজকর্ম নেই? আমার পায়ে এই পাথরখানা বেঁধে দিতে কি আমি একবারও বলেছিলাম? কোথা থেকে এক অহংকারী মেয়ে এনে আমার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হল, আর এখন সমস্ত দোষও সেই আমারই ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। আমি অনেকবারই ওর সম্বন্ধে সব কিছু ভেবে দেখেছি আর এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে ওর ঐ রকম ব্যবহারের মূল কারণ হচ্ছে ওর অহংকার। কিন্তু একেবারে নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করে নিজেকেও আমি প্রশ্ন করেছি — এটা কি করে সম্ভব হলো যে আমার স্ত্রী চারদিন আমার ঘরে রইল অথচ আমি তার সঙ্গে একটা কথাও বললাম না?

যখন একেবারে অসহ্য লাগে তখন মনে হয় কোথাও একলা বসে প্রাণখুলে কেবল কাঁদি, এত কান্না, কাঁদতে কাঁদতে অচেতন হয়ে যাই, আর যেন কখনও চেতনা ফিরে না আসে...কিন্তু, কি করে...বলি, আমি এতই দুর্বলচিত্ত যে কান্নার সময়ও মনে হয় বালিশের নোংরা ওয়াড়টা যেন মুখে না লাগে, মন্দিরের মার্বেল পাথরের থামে মাথাটা হেলিয়ে রাখতে গিয়ে মনে হয়, কি কনকনে ঠাণ্ডা, 'লনে' শুয়ে কাঁদতে গেলে গালে শুকনো ঘাস ফোটে...জানিনা, আমি জানিনা কি হলে আমি একটু শান্তি পাব...!

পাঁচ

একদিন আমাকে খাবার দেবার সময় মুন্নী প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা দাদা, ভাবীর সঙ্গে তুমি কি একটুও কথা বলনি?' ওর উদ্দেশ্যটা বোঝবার জন্য ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়েছিলাম, তারপর থালাখানা কাছে টেনে নিতে নিতে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলাম, 'না'। গলার স্বরে বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিলনা। তবে মুন্নীর হঠাৎ কথাটা মনে এল কেন সে বিষয়ে একটু কৌতুহল হয়েছিল বৈকি।

উনুনের সামনে বসে বসে কয়লার টুকরো দিয়ে মেঝেতে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে আবার প্রশ্ন করল, 'ফের বিয়ে করবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা বিয়ে দিয়ে তার অবস্থাটা কি করেছ, যে আবার আর একটাকে কাঁদাতে হবে?' কথাগুলো একেবারে আচমকা বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে। আর ঠিক তখনই, এই প্রথম এক খণ্ডমুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎচমকের মত এই কথাটা আমার মনে খেলে গেল — আমাদের বাড়ির সকলের ব্যবহারে প্রভা যে কত দুঃখ পেয়েছে কে জানে। ওর দিকটা আমরা কেউ তো ভেবেই দেখিনি। আর এখন তো সবাই ওকে এতটা ভুলে গেছে যেন ও মরেই গেছে। হঠাৎ আমার মনে হল আমাদের ব্যবহারে অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে ও হয়ত এই কথা লিখে পাঠিয়েছে যে, তার ওপর যদি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকি তাহলে যেন দ্বিতীয়বার বিবাহ করি। অনেক মেয়ে তো এ রকম করে আমি শুনেছি, পড়েওছি। একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞাসা করি, প্রভা এরকম কিছু লিখেছে নাকি? মুখের গ্রাস যেন উলটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। খাবার একেবারে বিস্বাদ, ক্ষিদে মরে গেছে! জোয়ারের দলাটা কোনরকমে জল দিয়ে গিলে ফেলে প্রশ্ন করলাম, 'তোকে কে বলেছে একথা — মা?'

'না, না আমি তো এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল মুন্নী। তারপর কি জানি কেন আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে বলল, 'রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ভাবী যখন মায়ের পা টিপতে বসে তখন তো প্রায়ই এইসব কথা হয়,' বলতে বলতে মুন্নী কব্জী উঁচু করে নিজের হাতের চুড়িগুলো নাড়াচাড়া করছিল।

'দ্যাখ মুন্নী, সত্যি বলছি আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব। ভালভাবে পড়াশোনা করতে চাইছি, সেটা করতে দেওয়া হচ্ছে না, এদিকে চারটে বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে', উত্তেজনায় কেঁপে গেল আমার স্বর।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার বলল, 'ভাইয়া, একটা কথা বলব?' কথার ধরণে মনে হল কোন একটা রহস্য ও ফাঁস করে দিতে চাইছে।

আমার মুখে ফুটে উঠল জিজ্ঞাসা। ঠিক এই সময়ে দরজার কাছে দেখা গেল ভাবী এসে দাঁড়িয়েছে। রান্না শেষ করতে হবে বলে তাড়াহুড়ো করে স্নান করে এসেছে। কাঁধের ওপর একগোছা নিংড়ানো কাপড়চোপড়। ওর দিকে তাকাতেই বলে উঠল, 'যাক, মুন্নীবিবি খাবারটা দিয়ে দিয়েছে। আমি আবার তাড়াতাড়ি ছুটে আসছি যে ঠাকুরপো তো এসে চুপচাপ বসে থাকবে, যদি কেউ খাবারটা এগিয়ে দেয় তবেই খাবে। না দিলে, না খেয়েই উঠে চলে যাবে। কি যে হয়েছে আজকাল আমাদের লালাজীর!' ভাবী আস্তে আস্তে এসে আমার সামনে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, হাঁপাচ্ছে। ভাবী অন্তঃসত্ত্বা। কাঁধের কাপড়ের বোঝা নামিয়ে মুন্নীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে খোশামোদের সুরে বলে, 'মুন্নীবিবি ভারি লক্ষীমেয়ে, এগুলো একটু শুকোতে দিয়ে এসনা ভাই।'

'আহা হা, আমাকে বেশ পেয়েছ কাজ করিয়ে নেবার জন্য, নিজেই যাওনা বাপু কাপড় মেলতে', ঠাট্টার সুরে বলে উঠল মুন্নী।

'তোমার দিব্যি, সত্যি বলছি ভাই, এই এত কাপড় কেচে হাতদুখানা যেন ভেঙে পড়ছে। পায়ে পড়ি ভাই একটু তুমিই দিয়ে এস', খুব ক্লান্তভঙ্গিতে কথাগুলো বলল ভাবী এবং সেই সঙ্গেই মুন্নীর দিকে কেমন এক বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর নিজেই হেসে ফেলল। মুন্নীও হাসিমুখে কাপড়ের বোঝা নিয়ে চলে গেল।

আমি ছোট ছোট টুকরো ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছি। খাবার ইচ্ছে বিশেষ নেই। ভাবী মাথায় হাত রেখে চুপ করে কি যেন ভাবছে, আমাকে খেতে দেখে ওর কিছু যেন মনে পড়ে গেছে। হঠাৎ নিজের মনেই বলল, 'এবার দেওয়ালীর আগেই কি রকম শীত পড়ে গেল। দেওয়ালীর আর কদিন বাকি ঠাকুরপো?'

'দশ পনের দিন হবে হয়ত', অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলাম। আঙুলের কড় গুনতে গুনতে ভাবী বলল, 'এই দেওয়ালীতে তোমার বিয়ের ঠিক ছ'মাস পূর্ণ হবে।'

আরে! ছ'মাস হয়ে গেল! এক একটা দিন যত কষ্টেই কাটুক না কেন এখন মনে হচ্ছে সময়টা বেশ তাড়াতাড়িই কেটে গেছে তো! এই সময়টা প্রভার কেমন কেটেছে কে জানে। বাড়িতে দু একখানা চিঠি তো নিশ্চয় এসেছে। মুন্নীকে পরে একসময় জিজ্ঞাসা করলেই হবে। কিন্তু মুন্নী আমাকে কি যেন একটা বলতে চাইছিল? আজ এরা সবাই আমার বিয়ের কথা তুলছে কেন? এদিকে আমার স্বভাবের এই এক বিচিত্র পরিবর্তন ঘটেছে, আনন্দ, ঔৎসুক্য এসব জিনিসগুলো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একটু কৌতুহল হল, কিন্তু তা আবার মিলিয়ে গেল। ভেবে নিলাম, বাড়িতেই হয়ত কোন কথা হয়েছে।

'তোমার বিয়েটা কি যে হয়ে গেল ঠাকুরপো!' দীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে স্নেহমাখা হতাশার সুরে ভাবী বলে উঠল, 'কত আশা ছিল, সব বিফল হয়ে গেল। দেনাপাওনার কথা বলছি না, ওসব তো দু এক বছরের মধ্যেই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু সেই মহারাণী তো সারাজীবনের মতই বাঁধা পড়েছেন। ওঁরা তো শুনছি পাঠাবার কথা লিখেছেন।'

ভাবীর কথার শেষটুকু না শুনেই আমি বলে উঠলাম,' তোমারই তো সখটা বেশী ছিল। বউ এইরকম, বউ ঐ রকম বলে মরছিলে তো তুমিই'।

'নাও, শোন একবার এনার কথা! আমি কি তার পেটের মধ্যে ঢুকে দেখে এসেছি? কানে যা শুনেছিলাম, তাই তোমায় বলেছি।' আবার এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'দেমাকেরও বলিহারি যাই বাপু। আসা যাওয়ার নামগন্ধ নেই এত দেমাক? এই এতখানি বয়স হল আমার, দিব্যি গেলে বলতে পারি এত অহঙ্কারী মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। তবু যদি সত্যিই কোন গুণ থাকত। কোন গুণ নেই তার অত ন্যাকামী কে সহ্য করবে বল? লেখাপড়া আর রূপ দেখিয়ে সবাইকে হাত করবে ভেবেছিল, কিন্তু সত্যিই তো আর দেবরাজ ইন্দ্রের সভা থেকে নেমে আসা পরীটি নন উনি!' আমার মুখের

ভাবটা লক্ষ্য করার জন্য ভাবী একটু চুপ করল, তারপর আবার কি যেন ভেবে বলে উঠল, 'রাণীজী যখন হাতে ঘড়ি বেঁধে রান্নাঘরে এসে ঢুকলেন তাই দেখেই তো আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। যাক গে চুপ করেই ছিলাম। কিন্তু যখন বলল 'ডাল তো আমি চেখে দেখেছি মা' এতেই তো রসাতল কাণ্ড হবার কথা। তবুও ভাবলাম যাকগে, ছেড়ে দিই। বোঝ একবার ব্যাপারটা — যার প্রথম খাবার মুখে দেবার কথা, সে খাবার আগে তুমি চেখে দেখবার কে শুনি?'

বিরক্ত লাগছিল। কলেজের দেরী হয়ে যাচ্ছে। বললাম, 'ভাবী কলেজের দেরী হচ্ছে। আর খেতে পারছি না, মুন্নী অনেক বেশী দিয়ে ফেলেছে,' উঠে পড়লাম। ভাবী বলতে লাগল, 'ওমা, কিছুই তো খেলেনা, ঠাকুরপো, আমার দিব্যি, এই রুটিটা তোমায় শেষ করতেই হবে।'

'না ভাবী, ক্লাস শেষ করে এসে খাব।' চলে আসতে আসতে কানে গেল লোকদেখানো হাসির আচ্ছাদনে মোড়া মন্তব্য, 'আসছেন তো, কিন্তু কড়া শাসনে রেখ আবার, না হলে পস্তাবে এ আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি।'

পুরুষদের মৌনতা আর স্ত্রীলোকদের এই বিচিত্র ব্যবহার — ঠিক বুঝতে পারি না আমি। এ সবের অর্থ কি? মনটা আমার আজ সকাল থেকেই বিগড়ে গেল। আজ সহসা এই কথাটাই বার বার মনে হচ্ছে — ছ'মাস কেটে গেল, ও কেমন আছে কে জানে? আমাকে কি একটা চিঠিও লিখতে পারত না? আমি হয়ত চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। কিন্তু ওর তো লেখা উচিত ছিল। মাঝের এই দিনগুলো ওর কি ভাবে কাটল? যে আঘাত পেয়েছে তার কি প্রভাব পড়ল ওর মনে? যেমন করে হোক ওর একটু খবর পাবার জন্য মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতা অনুভব করলাম। নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে ও কি কি বলেছে কে জানে।

মাঝে মাঝে আমি তো শিউরে উঠি, সারাটা জীবন ঐ অহঙ্কারী মেয়ের সঙ্গে কি করে কাটাব? আমাদের ভবিষ্যতের চেহারাটা কেমন হবে? তাছাড়া, ঐ দ্বিতীয় বিয়ের কথাটা?...মুন্নী হয়ত ব্যাপারটা নিয়েই কিছু বলতে চাইছিল।

বোর্ড পরীক্ষার ফী চাইতে গেলাম মায়ের কাছে, পঁচিশ টাকা লাগবে শুনেই তাঁর মুখ একেবারে হাঁ হয়ে গেল, 'ওমা, আমি কোথায় পাব এত টাকা? বাবুজীর কাছে চেয়ে নাও বাছা! বাবুজীর কাছে যাতে চাইতে না হয় সেজন্যই তো মায়ের কাছে এসেছিলাম। কি করা যায়! ভাইসাব আর ভাবীর কাছে চাইবার কথাও একবার মনে এলো, কিন্তু খুব সম্ভব ওদের কাছেও টাকা নেই, আর সময় অসময়ের কথা ভেবে পঁচিশ ত্রিশ টাকা যদি জমিয়ে রেখেও থাকে, তা আমাকে ওরা কখনই দেবে না এটা বেশ জানি।

বাবুজীর কাছে গিয়ে প্রথমটা তো চুপ করে বসে রইলাম, তারপর কোনরকমে মাথা নীচু করে বলে ফেললাম, 'বাবা, কাল বোর্ড পরীক্ষার ফী দিতে হবে'। গলার স্বরটা এমন মিনমিনে হয়ে গেল যেন আমি মদ খাবার জন্য টাকা চাইছি।

সন্ধ্যাবেলা, বাবুজী তখন একটা খাটের দড়িগুলো কসে টান করে বাঁধছিলেন। আমার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে গমগমে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত?'

'পঁচিশ'...শব্দটা যে ভাবে উচ্চারণ করলাম তাতে মনে হল যেন আমার প্রাণটা বেরিয়ে যেতে আর পঁচিশটি নিঃশ্বাস মাত্র বাকি আছে।

'হুঁ', একটা গর্জন করে আর একটা দড়ি ধরে টান দিলেন, সেটা কনুই দিয়ে চেপে রেখে বললেন, 'আমার পেনশনের পঁচিশটা টাকা এসেছে, এই নিয়ে যাও। আমাকে তো সারা জীবন ধরেই এই সংসার ঠেলতে হবে, তোমার জন্যও করতে হবে সে তো জানা কথা। ছেলেগুলো ধেড়ে বজ্জাত উট হয়ে গেলেও তাদের খাওয়াতে হবে সেই আমাকেই, এই আমার ভাগ্যের লিখন, তাই খাইয়েই যাব। কাল না পরশু অমরও কাঁদুনী গাইছিল, তারও ফীজ দিতে হবে। এই সবে দিওয়ালী গেল, খরচ তো ক্রমে বেড়েই চলেছে। রোজগার করতে তো ঐ এক ধীরজ, তাকে সবাই মিলে চুষে খাবে এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।' জামার ভিতর হাত ঢুকিয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে নোট বার করে না গুনেই আমার সামনে খাটের ওপর ফেলে দিলেন, 'যাও, নিয়ে যাও, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর আমার মুখ দেখতে হবেনা'।

সামনে পড়ে থাকা নোটগুলো তুলে নেবার শক্তিটুকুও যেন আমার নেই। একবার ইচ্ছা হল এখনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাই, এই রকম লেখাপড়ায় লাথি মেরে বেরিয়ে পড়ি, যেখান থেকে হোক টাকার রাশি এনে এদের সামনে ঢেলে দিই আর বলি, এই নাও টাকা ...আর কত চাই? কেবল টাকা...টাকা...টাকা।

আমাকে তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাবুজী একবার মাথাটা নীচু করলেন, তারপর একেবারে অন্য রকম গলায় বললেন, 'তুমি নিজেই ভেবে দেখ সমর, কি যে কষ্টে পড়েছি সে আমিই জানি। কিন্তু আমি কি করতে পারি বল? আবার কোথাও যে চাকরী করব সে শক্তি আর নেই। এদিকে ধীরজের বউয়েরও সময় হয়ে এল...এই এক বিপদ। বড় বউয়ের প্রথম সন্তান — কত যে খরচ হবে বুঝে দেখ। সবকটা বাচ্চা স্কুল কলেজে পড়ছে। তাদেরও সময়মত খাওয়া পরার যোগান থাকা চাই। তোমার মায়ের তো সারাক্ষণ উনুনের তাতে বসে বসেই আজ এই অবস্থা। বয়সও হল, সে বেচারী তো অনেক খেটেছে। এখন আর টানতে পারছে না। তিরিশবছর ধরে দম ফেলবার অবসর পায়নি। আর কিছু না পার, নিজের বউটাকে তো নিয়ে আসতে পার, সে এলেও কিছুটা সাহায্য করতে পারে। আপিস আর কলেজের সময়মত খাওয়াটা তো জুটবে অন্তত। মুন্নীও সাহায্য করবে, তাকে তো এখন এখানেই থাকতে হবে। সমস্ত আত্মীয় কুটুম্ব মহলে ছিঃ ছিঃ করছে, কিন্তু উপায় কি? এই আর এক যন্ত্রনা!'

সমস্ত পরিস্থিতিটা বাবুজীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সেই সময় আমার সত্যিই বড় কষ্ট হল বাবার জন্য। উনি যে এরকম খিটখিটে আর বদরাগী হয়ে উঠেছেন তার জন্য সত্যিই বেচারীকে দোষ দেওয়া যায় না। উনি আর কত করবেন? বহু কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে ঢোঁক গিলে বলে ফেললাম,'অমরকে পাঠিয়ে দিন বাবা, আমি যাব না'।

এক নিমেষে পালটে গেল ওর কণ্ঠস্বর, ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'অমরই যাবে। বউয়ের নাম শুনলেই তোমার যেন নাড়ি ছেড়ে আসে। সে কি নেকড়ে বাঘ, খেয়ে ফেলবে তোমায়? এই এক অপদার্থ ছেলে — নিজেকে একেবারে লাটসাহেবের বাচ্চা মনে করে। মাথার মধ্যে কি যে আছে কে জানে। আমিও দেখব কতদিন কথা না বলে থাকতে পার। লক্ষবার বোঝানো হল, পরের মেয়ে, কি ভাববে, বাড়ি ফিরে কি বলবে সেখানে, সেটা ভেবে দেখ। তাছাড়া আরো তো বিয়ে থাওয়া দিতে হবে। লোকে পাঁচরকম কথা বলছে, কার মুখ চাপা দেব? কিন্তু এ ছেলে তো কারো কথা কানেই তোলে না। সারাজীবন থাকতে পারবে কথা না বলে? তবেই বুঝব সত্যি মনের জোর কতটা।'

বিদ্যুতের মত একটা কথা খেলে গেল মনের মধ্যে। ঠাট্টার সুরেই ভাবী একদিন আমাকে পরামর্শ দিতে এসেছিল, বলেছিল, 'বাবুজী আজ মাকে কি বলছিলেন জান ঠাকুরপো?' আমার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে আবার শুরু করেছিল, 'বলছিলেন, সমরকে বল কোন ডাক্তার বদ্যির কাছে যাক, দেখিয়ে আসুক, যা ফী লাগে আমি দিয়ে দেব'। প্রথমটা বুঝতে না পেরে বলে উঠেছিলাম, 'কেন, আমার হয়েছেটা কি?' তাই শুনে ভাবী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে আরম্ভ করেছিল আর আমি রেগে আগুন হয়ে উঠেছিলাম।

এরপর বাবুজী খাটের দড়িগুলো দরকারের চেয়েও বেশী জোরে টেনে টেনে বাঁধতে লাগলেন এবং আমি টাকাটা তুলে নিয়ে আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে চুপচাপ চলে এলাম ওখান থেকে। ছিঃ কত কি যে এঁরা কল্পনা করে ফেলেন। তখনও বাবুজী গজগজ করছেন নিজের মনে আর তাই শুনে আমারও মেজাজ চড়ে যাচ্ছে।

এঁরা যা বলবেন তাই করতে হবে। বলা হল, বিয়ে কর, সুতরাং বিয়ে করে ফেললাম। যেই হুকুম হবে 'পৌঁছে দিয়ে এসো', পৌঁছতে হবে। যেই হুকুম হবে 'নিয়ে এসো' তখনি ফেরৎ আনতে হবে। এই তো জীবনে একবার মাত্র পঁচিশটা টাকা চেয়েছি, তাতেই শুনতে হল এত কথা। কত দৌড়ঝাঁপ করে কলেজের মাইনেটা রেহাই করিয়ে নিয়েছি, না হলে তো প্রতিমাসেই একবার করে কুরুক্ষেত্র হয়ে যেত। ঠিকমত লেখাপড়া শেখাবার মুরোদ নেই তো জন্ম দেবার দরকারটা কি ছিল? বইখাতার জন্য তো কখনও একটা পয়সাও চাইনি। ছেঁড়া পুরোন কাপড় জামা দিয়েই কোনমতে কাজ চালাচ্ছি। সমস্ত শীতটা ঐ পরেই কাটাতে হবে। সিনেমা দেখা বা বাইরের কিছু কিনে খাওয়ার জন্যও পয়সা চাইনা আমি। তাতেই এই অবস্থা, হুঁ, আমি হলাম ধেড়ে বজ্জাত উট!

ঠিক আছে, তোমাদের দরকার তো নিয়ে এসো বউকে, দরকার না থাকে তো সারা জীবনেও এনো না। সব কাজ কি তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেই কর নাকি? আমার কোন কথাই তো শোনা হয়না। বিয়ে দেবার সময় আমার একটা কথাও কি কেউ শুনেছিল? তখন তো বলা হল, 'ছেলেমানুষ, চুপচাপ থাক, বেশী কথা বললে মাথা ভেঙে দেব।'

ওঃ, মাথা ভেঙে দেবেন! ভাঙুন না দেখি এখন। সারাবাড়িতে আমি ছাড়া আর কি মানুষ নেই তাকে আনতে যাবার? অমর কেন যেতে পারে না শুনি? সবসময় ও ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ — এই করে করে ওর স্বভাবটাই বিগড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমার আর কি! তোমাদেরই ভুগতে হবে এরপর। সারা-জীবন কথা বলি, কি না বলি, সেটা আমিও দেখিয়ে দেব। সেটা তো আমার নিজের হাতেই আছে। ঘাড় ধরে তো আর কথা বলাতে পারবে না কেউ। এ তো বিয়ে করানো নয় যে জোর করে ঘটিয়ে দেওয়া যাবে! এ আমার নিজের মনের ব্যাপার, কথা বলবনা আমি, ব্যস। সমাজে বদনাম হবে...হুঁ!

ছয়

কলেজ থেকে ফেরার পথে অমরের সঙ্গে দেখা, দুহাতে ফুটবল লুফতে লুফতে চলেছে, বোধহয় কোথাও খেলতে যাচ্ছে। আমাকে দেখেই বলে উঠল, 'সমর ভাইয়া, ভাবীকে নিয়ে এসেছি'।

মাথা নিচু করে হাঁটছিলাম, হঠাৎ একেবারে চমকে উঠে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'তাই নাকি?' আর সেই সঙ্গেই ঘরে ফিরতে উদ্যত পদক্ষেপ থমকে গেল হঠাৎ, একটুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর কিছু বলবি?'

'নাঃ বলব আর কি? তবে আনতে বেশ কষ্ট হয়েছে। ভাইয়া, ওদের বাড়ির লোকেরা বেশ বেআদব। এরপর আর কিন্তু আমি ওখানে যাবনা, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

'কিরে, তোকে মারধোর করেছে নাকি?' আমি প্রাণপণ চেষ্টায় মনের দুঃখ গোপন করে, একটু তিক্ত হাসির সুরে প্রশ্ন করলাম।

'মারধোর করলেই কি শুধু বেয়াদবী হয়?' সমস্তক্ষণ কেবল বলছে 'তোমাদের বড় ভাবী এইরকম, তোমার বাপ মা ঐ রকম,' ঠিক আছে, আমরা না হয় লোক খারাপ, তাই বলে সমস্তক্ষণ ঐ কথা শুনে যেতে হবে?' আমার মনের অবস্থার কথা একবার চিন্তাও করলনা, অতি উদ্ধতভাবে কথাগুলো বলে গেল অমর।

'আর সমর ভাইয়া কেমন আছে সেকথা কেউ জিজ্ঞাসা করল না?' আচমকা প্রশ্নটা করে বসলাম আমি, নিজের অজান্তেই গলার স্বরটা আমার নরম হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার সম্বন্ধে ও কি সব বলেছে কে জানে।

'ভাইয়া, সেইটেই তো আশ্চর্য লাগল, ওখানে তোমার সম্বন্ধে তো বেশ প্রশংসাই শুনলাম।'

'প্রশংসা?' আমি তো হতবাক, অবিশ্বাসের সুরে বললাম, 'তুই নিশ্চয় ঠিক বুঝতে পারিস নি।'

'হ্যাঁ, তা হয়ত হতে পারে,' অমর যেন মেনে নিল কথাটা, 'তা ছাড়া তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কথাবার্তা হয়ও নি। তোমার পড়াশোনা শেষ হতে আর কতদিন বাকি, প্রভা এইসময় গেলে পড়ার ক্ষতি হবে না তো? — এইসব দু একবার জিজ্ঞাসা করেছিল। তুমি যতদূর ইচ্ছা পড়, তাতে ওরা খুশিই হবে একথাও বলেছে। হ্যাঁ, এটা তো ওদের খারাপ লেগেছে যে প্রথমবার বউকে আনতে তুমি নিজে যাওনি, কারণ এটাই হচ্ছে রীতি। আমি বুঝিয়ে বলেছি 'গৌনা'* তো বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গিয়েছে, তাছাড়া ভাইয়াকে এখন খুব খাটতে হচ্ছে।'

অমরের আত্মপ্রশংসার স্রোত মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে আমি বলে উঠলাম, 'ব্যস, ব্যস, আর সব ঠিক আছে তো।' 'প্রশংসা' কথাটা শুনে পর্যন্ত মনের মধ্যে যে সব প্রশ্ন ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার সমাধান ঐ সব কথার মধ্যে নেই তা জানি। 'তুই ঠিক বুঝতে পারিসনি' এই কথাটা বলে আমি অমরকে একটু উস্‌কে দিতে চেয়েছিলাম, তাছাড়া এটাও নিশ্চিন্ত করে জানতে চাইছিলাম যে, ঐ প্রশংসার কথাটা ব্যঙ্গ করে বলা হয়নি তো? কিন্তু এখন কি জিজ্ঞাসা করব? ঐ শব্দটা আমার মনের মধ্যে মানসিক উদ্বেগের তরঙ্গলীলাকে উত্তাল করে তুলেছে। সমস্ত হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে শুধু এই কথাটা জানতে যে, তুমি কি বলেছ আমার সম্বন্ধে? এক মুহূর্তের জন্য আমি অনুভব করলাম, কি ঘোরতর অন্যায় ব্যবহার আমি করেছি। আজ যদি কেউ আমায় আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করে, 'ফুলশয্যার রাত্রে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তুমি কেন কথা বলনি? তোমাকে দেখে সে জড়পুঁটলির মত বসে পড়েনি, সোজা দাঁড়িয়েছিল, এই কারণে? অথবা স্রেফ এইজন্য যে, তোমার আকাঙক্ষাগুলো ছিল অতি উচ্চ এবং নারীকে তুমি সেই আকাঙক্ষাপূরণের পথে বাধা বলে মনে করতে। বিবাহ দেওয়া হয়েছিল তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে...ছিঃ ছিঃ এইগুলি কি কথা না বলার জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ হতে পারে? আত্মপক্ষ সমর্থনে আমার কি বলবার আছে? একটা আবেগ তাড়িত খেয়ালের বশে এরকম ব্যবহার করে ফেলেছি, এছাড়া কিছুই বলার নেই। এখন আমার মনে হচ্ছে আমি শুধু ভুল করিনি, বোকামিও করেছি যথেষ্ট। আত্মগ্লানিতে ভরে উঠছে সমস্ত মনটা।

যাবার জন্য পা বাড়িয়ে অমর বলল, 'আর তো বিশেষ কিছু কথা হয়নি। কবে আবার ফেরৎ পাঠানো হবে তা জিজ্ঞাসা করেছিল। ভাবীর শরীরটা তত ভাল নেই, তাই দরকারমত যেন ওষুধপত্র দেওয়া হয়, এটা বলেছে।'

'শরীর খারাপ নাকি?' প্রশ্নটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল আর নিজের দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে নিজেই লজ্জিত বোধ করলাম।

---

* গৌনা — বালিকাবধূ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যখন স্বামীর ঘর করতে যায়।

'হবে হয়ত'। দার্শনিক ভঙ্গিতে জবাবটা দিয়ে ফুটবল নাচাতে নাচাতে চলে গেল অমর।

শরীরের দিকে নজর রাখতে বলেছে। আর এদিকে তো বাবুজী বলছেন বউ এসে সময়মত রান্নাবান্না করে খাওয়াবে। এই তো সবে দ্বিতীয়বার এল, এরই মধ্যে সমস্ত কাজকর্ম তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার পরিকল্পনা একেবারে প্রস্তুত। অন্তত আরো দু একবার আসা যাওয়া করতে সময় দিলে ভাল হত না? আমাদের বাড়ির রীতিনীতি সত্যিই অদ্ভুত।...আচ্ছা, সত্যিই কি ও আমার প্রশংসা করেছে? না, হতেই পারে না, অমরটা আসলে বুঝতে পারেনি।

বাড়িতে ঢুকতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে এতদিন ধরে যে একটা বিষাদের ক্লেদ জমেছিল তা যেন হঠাৎ সরে গেছে আর নিচে থেকে বেরিয়ে এসেছে টলমলে নির্মল জল। ও ফিরে গিয়ে আমার নামে কোন নিন্দা করেনি এ কথাটা কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিছু না কিছু তো নিশ্চয় বলেছে। এমন কি কখনও হতে পারে? কিন্তু কিছু বলে থাকলে সে কথা কোন না কোন প্রসঙ্গে অমরের কানে নিশ্চয় তুলে দেওয়া হত। অন্যদের সম্বন্ধে তো বলা হয়েছে। ওর মুখের দিকে আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখিনি পর্যন্ত, নিজের এই প্রচণ্ড মূর্খতায় নিজের ওপরেই খুব রাগ হচ্ছিল। এঘার ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াব কি করে সেই চিন্তায় তো প্রাণ শুকিয়ে উঠছিল। কথা বলার ব্যাপারটা নিয়ে কি করা যায়? ঐ সময় ভাবছিলাম আমার প্রতি যে বিরাট অন্যায়টা করা হয়েছে সেটা না হয় হেসেই উড়িয়ে দিই, আর নয়তো ওটার সম্বন্ধে আর চিন্তা না করাই ভাল। মনের মধ্যে এমন একটা তাজা হাল্কা ফুরফুরে ভাব দেখে নিজেরই খুব আশ্চর্য লাগছিল।

যাই হোক বেশ গম্ভীরভাবে মুখের চেহারা যথাসাধ্য স্বাভাবিক রেখে বাড়িতে ঢুকলাম, পথে অমরের সঙ্গে যেন আমার দেখা হয়নি, প্রভার আগমনের সংবাদ যেন আমি জানিই না। ক্লান্ত চেহারা, মুখ শুকিয়ে রয়েছে। আমাকে দেখেই মুন্নী দূর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাইয়া, ভাবী এসে গেছে'।

'এসে গেছে তো আমি কি করব?' কি জানি কেন কথাটা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে আর সেই মুহূর্তেই ডাক্তার দেখানোর কথাটা ঝলসে উঠল মাথার মধ্যে। মনটা অকারণেই তেতো হয়ে গেল। এমনভাবে নিজের ঘরের দিকে চললাম যেন মহা পরিশ্রম করতে হয়েছে কলেজে এখন বইগুলো হাত থেকে নামাতে পারলে বাঁচি। সেই সময় নিজেকে যে কি করে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলাম সে কেবল আমিই জানি।

খোলা দরজা দিয়ে আমার ঘরের মধ্যে ওর বাক্সটা দেখা যাচ্ছে। মনটা খুশী হয়ে উঠল, ঘরে আর কি কি নতুন জিনিস এসেছে দেখবার কৌতুহল জাগল। প্রভার থাকবার আর অন্য জায়গা নেই আমার ঘরেই ওকে থাকতে হবে এটা ভেবেও মনে বেশ আনন্দ হল। বিয়ের সময় যে ঘর পাওয়া গিয়েছিল সেটা আবার ভাইসাব দখল

করেছেন। সুতরাং আজই হোক বা কদিন দেরীতেই হোক, এবার ওকে কথা বলতেই হবে। আমিও আর অত একগুঁয়েমি করব না। দেওয়ালের একটা আলনায় চাদর ঝুলছিল, ঐটে গায়ে দিয়েই এসেছে বোধহয়। আর একদিকের দেওয়ালের কোণায় প্লাস্টিকের একজোড়া চটি। সিন্দুকের পাশেই রয়েছে একটা বাঁশের ঝাঁপি। তাতে পথে আসার সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এদিক ওদিক দেখে আমি আস্তে ওপরে রাখা তোয়ালেটা সরালাম। গোল করে পাকিয়ে রাখা একখানা 'মায়া', রেলের বুক স্টল থেকে কিনেছে বোধহয়। একটা পাতা উল্টে দেখি পরিস্কার মুক্তোর মতো অক্ষরে লেখা 'প্রভা'। একবার ইচ্ছে হল পাশে নিজের নামটাও লিখে দিই। তারপরই কিন্তু চুপচাপ আবার সব জিনিস আগের মত করে রেখে দিলাম। যদি দেখে ফেলে তো কি ভাববে?

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চুপি চুপি বাইরে চলে এলাম ভাবী আর মুন্নীর নজর এড়িয়ে। কারো সামনে পড়তে ইচ্ছে করছিল না। সবাই ঠাট্টা শুরু করবে। কিন্তু যাই কোথায়? লনে গিয়ে পড়ে থাকতেও ইচ্ছে করছে না। মন্দিরে যাওয়া তো সেই ঘটনার পর ছেড়েই দিয়েছি। দিবাকরের কাছে যাব ভাবলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও গেলাম না। কে জানে কত দেরী হবে। রাস্তাতেই পায়চারী করছিলাম। ছোট ছোট ঠেলাগাড়িতে পাঞ্জাবী শরণার্থীরা সাবান, শাকসব্জী ইত্যাদি ফেরী করতে শুরু করেছে। ছোটছেলেরা চিনেবাদাম আর ছোলাভাজা বিক্রী করছে। কেউ কেউ ফুটপাথে কাঠের খুপরী দোকানে কাপড় চোপড়ও বেচতে আরম্ভ করেছে। কতখানি সাহস আর অধ্যবসায় নিয়ে এরা আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছে এটা মানতেই হবে। এই রকম প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এত কষ্ট সহ্য করে আসতে হলে আমরা হয়ত ভিক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারতাম না। এরা কি না দেখেছে? কি না সহ্য করেছে? নিজেদের ফেলে আসা দেশ, ফেলে আসা বিষয়সম্পত্তির কথা ওদের মনে পড়ে, যারা মারা পড়েছে তাদের জন্য ওরা কাঁদে, কিন্তু আবার নতুন উৎসাহে কাজে লেগে যায়। মেয়েরা তো দিনরাত কলের তলায় বসে পিটিয়ে পিটিয়ে কাপড় কাচছে। হঠাৎ মনে পড়ল বহুদিন সংঘের 'বৌদ্ধক'-এ যাওয়া হয়নি, ওখানেই যাওয়া যাক। কিন্তু কি কারণ দেখাব এতদিন না যাওয়ার? লজ্জা করবে। আজ থাক, অন্যদিন যাওয়া যাবে।

আমার এতদিনকার সব বিষাদ আর দুশ্চিন্তা কোথায় উড়ে গেছে, নিজেরই খুব আশ্চর্য বোধ হচ্ছে। গতকাল ঠিক এই সময় যখন এই ব্রিজটা পার হচ্ছিলাম তখন আমার সমস্ত শরীরের শিরাগুলো যেন ফেটে পড়ছিল দুশ্চিন্তার ভারে। প্রভা সত্যিই বুদ্ধিমতী, চপলস্বভাব নয়। অন্য মেয়ে হলে বাড়ি গিয়ে হয়ত আমার এত নিন্দা করত যে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকত না। ও হয়ত বলেছে, পরীক্ষা সামনে তাই পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। শিক্ষিত মেয়ে আর অশিক্ষিতের তফাৎ তো এইখানেই। সেদিন তরকারীতে নুন একটু বেশী পড়ে গিয়েছিল বলে আমাদের এখানে কি হুলস্থুল কাণ্ডটাই না হোল। আরে বাবা মানুষই তো? একটু বেশী নুন দিয়ে ফেলেছ তাতে কি

এমন বিপর্যয় ঘটেছে শুনি? তার জন্য তাকে কি সারাজীবনেও ক্ষমা করা যাবে না? বেচারী নতুন বৌ, নিশ্চয় ঘাবড়ে গিয়েছিল, একে নতুন জায়গা, চারপাশে সব নতুন মানুষ, তার ওপর ভাবী এবং আমার মায়ের মত কঠোর সমালোচক — বেচারা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। এই আমাকেই যদি বলা হয় ক্লাসের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে একপাতা পড়ে শোনাও তাহলে আমি হয়ত একটি লাইনও পড়তে পারবনা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোতলাতে থাকব আর নিশ্চয় ঘেমে নেয়ে উঠব।

আসলে আমি প্রথম থেকেই বড় ব্যস্তবাগীশ, সামান্য কিছু ঘটলেই চট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। এইটি আমার একটি প্রধান দুর্বলতা। এই অভ্যাসটা আমায় ছাড়তেই হবে। সমস্ত ব্যাপারটা তো আমার দোষেই ঘটেছে, ওর তো কোন দোষ নেই। ব্রিজের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে চেয়ে চেয়ে সুদূর বিস্তৃত রেলের লাইনগুলোকে দেখছিলাম আর নিজের মনেই ভেবে ভেবে আশ্চর্য লাগছিল যে কি এমন দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছিল সেদিন যার জন্য মন্দিরের কোণে লুকিয়ে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম আমি। ঘন্টার পর ঘন্টা মাথা গরম করা আর কান্নাকাটি করার মত ব্যাপার সত্যিই কি এমন ঘটেছিল? সেই সময়টা আমি ওর তরফ থেকে প্রদর্শিত উপেক্ষার ভাব বা ওর চিঠি না লেখার অপরাধ এ সবের কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। বহুক্ষণ পরে বাড়ি ফিরতে ভাবী কোথা থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'কি ঠাকুরপো খাওয়াদাওয়া করতে হবেনা আজ? বউ যে উপোস করে বসে আছে। একজনের তো পথ চেয়ে চেয়ে চোখে ব্যথা হয়ে গেল, এদিকে সকাল থেকে তোমার আর দেখাই নেই। আজ কি সেই সকালে কলেজে বেরিয়ে এই এখন ফিরলে? কলেজ থেকেও বাড়ি আসনি নাকি?' ওর কথাগুলো যেন পরিহাসে ফেটে পড়ছে।

আজকাল আমি আজে বাজে কথায় কানই দিইনা, কেবল প্রয়োজনীয় কথাতেই উত্তর দিই। হামেশাই ভাবীর এইসব ঠাট্টাতামাশার উত্তরে অস্পষ্ট স্বরে যা হোক কিছু একটা বলে কথাটা শেষ করে দিই। কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছেও করে না। এখনও সেই ভাবটাই দেখাতে চেষ্টা করছিলাম যাতে আমার মনের আকস্মিক পরিবর্তনটার কেউ আঁচ না পায়। বেশ শান্তস্বরেই বললাম, 'হ্যাঁ ভাবী, একটু কাজ ছিল।'

'প্রভা এসেছে সেটাও জান না নাকি?' বলল ভাবী।

আমি ভাবীর মুখের দিকে এমনভাবে তাকালাম যেন ও কি বলছে তা আমি বুঝতেই পারিনি। তারপর হঠাৎ খুব তাড়া দেখিয়ে বলে উঠলাম, 'না, কিছু জানিনা বাপু, এখন চট করে খাবারটা দাও, ক্ষিদে পেয়েছে, খেয়েই পড়তে বসতে হবে।'

দূরে কোথা থেকে মুন্নীর গলার স্বর শোনা গেল, 'আগে মিষ্টি খাওয়াও, তারপর খাবার পাবে'।

এ কথার জবাবে ভাবী খুব হেসে উঠল, 'হ্যাঁঃ উনি আবার মিষ্টি খাওয়াবেন! শ্বশুরবাড়ির মিষ্টি খাওয়ার জন্য এখনই কি রকম নেচে উঠবে দেখ।' হাসলে এখনও

বেশ দেখায় ভাবীকে। 'আরে বাবা মিষ্টি ফিস্টি থাক, আমাকে দুখানা শুকনো রুটি দাও তো, সেই আমার যথেষ্ট। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আর তোমরা মিঠাই নিয়ে আনন্দ কর যত খুশি' গলায় খুব একটা ব্যস্ততার ভাব ফুটিয়ে বলে উঠি, 'খেয়েদেয়ে এখুনি পড়তে বসতে হবে, বোর্ডের পরীক্ষা!'

কথা শুনে ভাবীর মুখখানি প্রসন্ন হয়ে উঠল। খাওয়ার পর লণ্ঠনটা সামনে রেখে পড়তে বসে গেলাম। শীত পড়তে শুরু হয়েছে, তবে এখনও ততটা মারাত্মক নয়। পড়তে বসলেই বড় ঘুম পায়, বেশীক্ষণ পরিশ্রম করা যায় না, তাই আমি মাটিতেই বিছানা পাতি আর আমার খাটখানা দাঁড় করানো থাকে দেওয়ালের গায়ে। তার ওপরে গাদা করে রাখা আছে আমার ময়লা-চিটুনি লেপ আর তোষক। আমি রোজই প্রতিজ্ঞা করি রাত বারটা একটা পর্যন্ত পড়ব আবার ভোরে চারটে, পাঁচটার মধ্যে উঠে পড়ব। কিন্তু সেটা কোনদিনই হয়ে ওঠে না। সারা বাড়িতে আমিই সবচেয়ে উঁচু ক্লাসের পড়া পড়ছি, তাই আমার জন্য একটা আলাদা লণ্ঠনের ব্যবস্থা, অন্য দুইভাই একটা লণ্ঠন নিয়েই পড়ে। অবশ্য এই নিয়েও বাড়িতে অশান্তি হয়ে থাকে, কারণ বাকি থাকে আর একটামাত্র লণ্ঠন, তাই দিয়েই সারা সংসারের কাজ চালাতে হয়। বিশেষ করে যেদিন আমি লণ্ঠন না নিভিয়েই ঘুমিয়ে পড়ি এবং সেটা বড় ভাইয়ার চোখে পড়ে যায় সেদিন কেরাসিন তেলের অপচয় নিয়ে যে তুলকালাম কান্ডটা হয় তা আর বর্ণনার চেষ্টা না করাই ভাল। লণ্ঠনের সামনে বইয়ের দিকে চোখ রেখে বসে আছি মাথা নিচু করে। ম্যাথু আর্ণল্ডের 'সোরাব রুস্তম', কিন্তু চেষ্টা করেও পড়তে পারছি না। শেষ পর্যন্ত হার মেনে পড়ার চেষ্টাও ছেড়ে দিলাম। চুপচাপ বসে বসে প্রতীক্ষা করছি, মাঝে মাঝে হঠাৎ সচকিত হয়ে বইয়ের পাতা উল্টে দিচ্ছি। ও কি করবে সেটাই আমার দেখার ইচ্ছে। জানাই আছে, সংসারের সমস্ত কাজকর্ম শেষ হবে, কথাবার্তা শেষ হবে, মুন্নী আর ভাবীর কাছে এখানকার সব খবর শোনা হবে তারপর ও আসবে। সেই ক্ষণটির প্রতীক্ষায় বসে আছি আমি, আর কতক্ষণ ওরা গল্প করবে?

পায়ের শব্দ শোনা গেল, কেউ আসছে। এতক্ষণ নিচে যে গুনগুন করে কথা শোনা যাচ্ছিল তাও এবার থেমেছে। মা বেশ চুপচাপ, ওকে স্পষ্টভাবেই উপেক্ষা করছে। শীতটা বেশী লাগে বলে লেপের মধ্যে বসে জপের থলি হাতে মালা জপছে, মনে মনে গুনে গুনে, এখানে বসেই আমি অনুমান করতে পারছি। একবার ইচ্ছে হল বাইরে বেরিয়ে নিচেটা ঝুঁকে দেখি কেন এত দেরী হচ্ছে। কিন্তু ভাইয়া যদি নিজের ঘরে থাকে তাহলে দেখে ফেলবে, আর তাছাড়া ওপর থেকে মায়ের ঘরটা বা ওদের বসার জায়গাটা দেখাও যায়না। তবুও আমি বিনা প্রয়োজনেই একবার একটু ভয়ে ভয়ে ছাদের আলসের ধারে নালির কাছ পর্যন্ত ঘুরে এলাম। কল্পনানেত্রে দেখছিলাম মুন্নী নাক পর্যন্ত লেপটা টেনে নিজের খাটে শুয়ে আছে। ভাবী মায়ের পা টিপছে আর প্রভা খুব সম্ভব মুন্নীর খাটের গায়ে ঠেস দিয়ে মেঝের ওপর বসে ঢুলতে ঢুলতে ওদের কথা শুনছে এবং

ভাবছে কতক্ষণে এদের কথা শেষ হবে, তারপর সারাদিনের ধকল ও ক্লান্তির পর একটু শুতে পাবে।

মনে হল কে যেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছায়া দেখে বুঝলাম ও এসেছে। আমি পড়ছি সেটা দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ঘরে ঢুকতে দ্বিধা করছে। কিছুক্ষণ পরে খুব ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে এত আস্তে আস্তে নিজের সিন্দুকটা খুলল যে এতটুকু আওয়াজ হল না। খস খস শব্দ শুনে মনে হল কাপড় চোপড় বের করছে বোধহয়। একটুক্ষণ ঐখানেই বসে কি যেন চিন্তা করল তারপর মেঝেতে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল আর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ক্লান্ত হয়ে রয়েছে। কাপড় বদলাতে বাইরে গেল। আমার সবকটা ইন্দ্রিয়ের চেতনা যেন কানে এসে জমা হয়েছে। চুড়ির রিনিঝিনি, শাড়ীর খসখসানি, সুস্থসবল যুবতীশরীরের একটা অদ্ভুত সুগন্ধের ঝাপটা যেন ঘরের মধ্যে ভেসে এল আবার চলে গেল। আমার মন যেন আবেগে বিভোর, টান টান করে বাঁধা তারের ওপর টঙ্কারের মত সমস্ত শিরাগুলো যেন ঝনঝনিয়ে বেজে উঠছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি এক বিচিত্র উল্লাসের উষ্ণ অনুভূতি আমার সমস্ত ভিতরটায় যেন ছড়িয়ে পড়ছে, এই উষ্ণতা আমার শিরা উপশিরা বেয়ে প্রতিটি রোমকূপে প্রবেশ করছে। অতীতের সব কথা ভুলে গেছি, ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবনের সোনার মত ঝলমলে কত ছবি চোখের সামনে যেন নেচে উঠছে। সিনেমায় দেখা আর গল্পের বইতে পড়া কত প্রেমের দৃশ্য মনে পড়ছে, আমরাও ঐ রকম খুনসুটি করব, পরস্পরকে জ্বালাতন করব, সুড়সুড়ি দিয়ে রাগিয়ে দেব আবার সেধে ভাব করব। প্রভা হয়ত দুষ্টুমি করে আমার বই নিয়ে পালাবে, ওর ইচ্ছে আমি বই না পড়ে ওর সঙ্গে গল্প করি, আমি কিন্তু রাগ দেখিয়ে ওর পেছনে তাড়া করে যাব — এই সব রঙ্গকৌতুক — বিদ্যুতের ঝিলিক আর বর্ষণের উল্লাস যেন আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

আমার নতদৃষ্টি দরজা পর্যন্ত ওর প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করল। পা দুটি আলতায় রাঙানো, ফর্সা গোড়ালি ঘিরে রূপার তোড়া, পা ফেলার সময় শাড়ীর পাড়ে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আবার পা তোলার সময় ঝিলিক দিয়ে উঠছে। আর এক পা এগিয়েই ও চৌকাঠ পার হয়ে গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ভিতর থেকে একেবারে গলায় উঠে এসেছিল — 'প্রভা শোন!' অতি কোমল মিষ্টি করে ওকে ডাকবার সেই দুর্নিবার ইচ্ছাটা কি করে যে আমি চেপে রাখতে পেরেছিলাম তা আজও বুঝতে পারিনা। নিদারুণ চেষ্টায় আমি নিজেকে এই বলে বোঝালাম যে ও নিশ্চয় কাপড় বদলাতে গেছে, এখনই আবার ফিরে আসবে। সামনে রাখা বই খাতা কিছুই আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। নানাবিধ চিন্তার তুফানে যেন ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছি, প্রতি মুহূর্তে যেন আমার সংসার আমার নাগালের বাইরে হারিয়ে যাচ্ছে, যে মাটির ওপর বসে আছি তা যেন ভারসাম্য হারিয়ে একপাশে হেলে পড়ছে।

এই সময় ছাদের অন্যদিকে ভাইয়ার ঘরের দিক থেকে ভাবীর অস্পষ্ট স্বর শোনা

গেল, 'না প্রভা, ও ঘরে গিয়েই শোও, ওখানে চারপাই যদি না থাকে আমি গিয়ে একটা পেতে দিচ্ছি। এ ঘরে তোমার ভাসুর এখনই শুতে আসবেন।'

এ কথার উত্তরে ও গুন গুন করে কি বলল জানিনা কিন্তু এরপর ভাবী একটু উঁচু গলায়ই প্রশ্ন করল, 'কিন্তু, ও ঘরে তুমি শুইতে চাইছ না কেন বলত?'

ভাবীর কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানিনা, কিন্তু এই সময় হঠাৎ আমার সেই ডাক্তার সংক্রান্ত কথাটা মনে পড়ে গেল, কারণ এর পরেই ভাবী গলা নামিয়ে কিছু একটা রসিকতা করল। প্রভা আবার নিচু সুরেই ব্যস্তভাবে কি যেন বলল, মনে হল রসিকতাটা প্রভার মোটেই ভাল লাগেনি। একটুক্ষণ সব চুপচাপ। এরপর শোনা গেল ভাবী বোঝাচ্ছে, 'দেখ প্রভা, এমন করতে নেই। তুমি নতুন বউ, প্রথম থেকেই যদি এরকম করতে থাক তাহলে এরপর ঘর করবে কি করে? সারাজীবন কাটাতে হবে তো? অমন তো কত কিছুই হয়ে থাকে'। এবার প্রভা বেশ তীক্ষ্ণ দৃঢ় এবং উদ্ধত সুরে বলে উঠল, 'জোর করে ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়ব? না, সে আমি পারব না দিদি। একজন দূর দূর করছে তবু ল্যাজ নাড়তে হবে? গলাধাক্কা খেয়েও পা চাটতে হবে? ওঁর বোর্ডের পরীক্ষা, আমি কেন ওকে জ্বালাতন করতে যাব? ভাল ফল না হলে তো সবাই আমাকেই দুষবে? ওঁর তো আমাকে সাক্ষাৎ যমদূতের মত মনে হচ্ছে, আর তুমি বলছ, 'যা ওখানেই শুতে যা'। দম্ভ আর অহংকার ভরা প্রত্যেকটি শব্দ যেন বিষমাখানো তীরের মত ছুটে এল। যেন বন্দুকের গুলির মত কিছু একটা আমার মস্তিষ্কের মধ্যে দিয়ে চিরে বেরিয়ে গেল। মনে হল একটা উঁচু মিনার থেকে কে যেন এক ধাক্কায় আমাকে নিচে ফেলে দিয়েছে। আমি একেবারে সোজা হয়ে বসে আছি, ভুরু কুঁচকে গেছে, ভিতর থেকে একটা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার উঠে আসছে, আঘাতটা এত তীব্র যে নাকের পাটা রক্তবর্ণ হয়ে ফুলে ফুলে উঠছে, নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে, 'ওঃ, এই ব্যাপার!' চোখদুটো যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করে বইয়ের পাতার অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি, কিন্তু ঐ একটি বাক্য পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মত হৃদয়ের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ক্রমাগত ধাক্কা খেয়ে ফিরছে, 'আচ্ছা! এই ব্যাপার তাহলে?'

উঃ! একটুর জন্য বেঁচে গেছি। এখনি কেলেঙ্কারী হয়ে যেত। ডাক দিতে আর কতটুকু দেরী ছিল? কথাগুলো তো একেবারে জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল, কি কি বলব সব একেবারে ভেবে ফেলেছিলাম। কি ভুলই না করতে যাচ্ছিলাম, আবেগের স্রোতে একেবারে ভেসে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে। এখন যদি সত্যিই ওকে ডেকে বসতাম তাহলে সারা জীবন চোখ নামিয়ে চলতে হত।

উঃ কি দম্ভ, প্রতিটি শব্দ যেন তীব্র অ্যাসিডের মত জ্বালাময়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার স্পষ্টভাবে ওর কণ্ঠস্বর শুনলাম, কথার ভঙ্গিতে কি ঔদ্ধত্য! কাটারীর খোঁচার মত তীক্ষ্ণ এই বাক্যের সামনে আমি আবার নরম হতে যাচ্ছিলাম! ঈশ্বর আমাকে সময়মত রক্ষা করেছেন। সারাটা জীবন আমাকে কাঁদতে হত। এই অহঙ্কারের সঙ্গে ভালমত বোঝাপড়া

করতে হবে। এই লেখাপড়া শিখে নিজেকে সাক্ষাৎ ভগবান ঠাউরেছেন উনি। আর তাছাড়া, কি এমন লেখাপড়া শিখেছে? ভাবী ঠিকই বলেছিল — নিজের বিদ্যে নিয়ে আর রূপ নিয়ে বড্ড অহঙ্কার। হাজার হোক, মেয়েদের স্বভাব মেয়েরা যেমন বোঝে পুরুষরা তেমন করে বুঝতেই পারে না। ভাবী একেবারে খাঁটি কথা বলেছে, ওকে ভালরকম দাবিয়ে রাখতে হবে। ঐ সময় আমার হাত নিশপিশ করছিল, ইচ্ছে করছিল সোজা ওখানে গিয়ে বেশ কয়েকটা লাথি ঘুঁসি ঝেড়ে এমন শিক্ষা দিয়ে দিই যাতে সব অহংকার চূর্ণ হয়ে একেবারে শায়েস্তা হয়ে যায়। ভাইসাব মাঝে মাঝে ভাবীকে টেনে এক চড় লাগিয়ে দেন, আর তাই দেখে বহুক্ষণ আমার মন খুব খারাপ হয়ে থাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে উনি ঠিকই করেন। যতই আদর্শবাদী হই না কেন, তুলসীদাস নারীজাতি সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন সে হল হাজার বছরের কত অভিজ্ঞতার সারনির্যাস। নারী? কত তাবড় তাবড় মানুষকে কড়ে আঙুলের ডগায় নাচাতে পারে এরা। কিন্তু এরা হচ্ছে সেই বাঁদরের জাত যাদের লাঠি দেখিয়ে নাচাতে হয়।

এই তো আমিই এতক্ষণ বোকার মত কত কি ভাবছিলাম! ভবিষ্যতের দাম্পত্যসুখ, রঙ্গ কৌতুক, খুনসুটি — এই মেয়ের সঙ্গে? কখনো না, আজ আমি স্বয়ং ঈশ্বর এবং যত দেবতা আছেন সবাইকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি এই মেয়ের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখব না, কোন সমঝোতা করব না। যে নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী বলে মনে করে তার সঙ্গে মানিয়ে চলা কি সম্ভব? কখনও না, কিছুতেই না।

সত্যি সত্যি, আমার মত নির্বোধ আর দ্বিতীয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। অমব কি একটু বলল, (সত্যি না মিথ্যে তাই বা কে জানে?) আমি ওমনি জমিন আসমান এক করে ফেললাম। তাছাড়া ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কিছু বোঝেই নি। উঃ সংসারটা কি ভয়ানক জায়গা, একটু অসাবধান হলেই পা পিছলে পড়তে হবে। এই খরস্রোতে স্থির দাঁড়ানো কঠিন কাজ...সেইজন্যই তো আমাদের দেশে এ সংসারকে মায়া আর ভ্রমমাত্র বলা হয়ে থাকে।

হাল্কা পায়ের আওয়াজ, অলঙ্কারের রিনিঝিনি আর শাড়ীর খসখস শব্দ শোনা গেল এই সময়। কে যেন আসছে...আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। কে আবার...ঐ মহারাণীই আসছেন নিশ্চয়ই...কিম্বা হয়ত বুঝিয়ে সুঝিয়ে মিটমাট করিয়ে দেবার উৎসাহে ভাবী নিজেই চলে এসেছে। যদি ভাবী আসে তো এখন তিনঘন্টা ধরে শাস্ত্রজ্ঞান ঝাড়তে থাকবে। মনে মনে দৃঢ়ভাবে আবৃত্তি করতে লাগলাম — আজ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পৃথিবীর যে কোন শক্তিই আসুন না কেন কিছুতেই মিটমাট হবেনা, হবেনা, হবেনা। আমি জানি ও কিছুতেই নত হবে না। ওর অহঙ্কারই ওকে নত হতে দেবেনা আব এদিকে এ শর্মাও মাটিতে গড়া নয়, লোহার মত কঠিন ইস্পাতে গড়া — দেখা যাক কে কাকে ভাঙতে পারে!

দরজার কাছে এসে পড়েছে, ভাবী নয়, ওই এসেছে। কোন দ্বিধা না করে চৌকাঠ

পেরিয়ে এল, কোন দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেল নিজের জিনিষপত্রগুলোর দিকে। আমি যেন কিছুই দেখিনি এইভাবে সোজা হয়ে বসে আছি। সিন্দুকটা আবার খুলল, তারপর ঝাঁপিটাও খুলে কি বার করল, আবার কি সব রাখল কে জানে। আমি চোখের কোণা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি আর শব্দ শুনে অনুমান করছি। ঘরের অন্য প্রান্তে খাটের পাশে মেঝেতে কিছু একটা পাতা হল এবং পুরানো মত একটা শাড়ী তালগোল পাকিয়ে বালিশের মত মাথায় দিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে পড়ল।

থাক শুয়ে...! আমার কিছু আসে যায় না। উপেক্ষাভরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে আমি আবার 'সোহরাব ও রুস্তম' খণ্ডকাব্যে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। আচ্ছা, ও নিজেকে কি মনে করে? স্বর্গের অপ্সরী না দেবী সরস্বতীর অবতার? মাথায় কি আছে কে জানে। কেমন লোকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে তা তো বাছাধন এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতেই পেরেছেন। মোম তো আর নয় যে একটু আধটু গরম লাগলেই গলে যাবেন। ফুলশয্যার রাত্রিতে আমার মত এতখানি সংযম আর দৃঢ়তা দেখানো — পৃথিবীতে আর কখনো কেউ দেখেছে? উদাহরণ দিয়ে দেখাক তো! সব অহঙ্কার তো সেইদিনই চূর্ণ হয়ে গেছে। বোধহয় ভেবে রেখেছিল, খুব শাসনে রাখবে আর স্বামীটি পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়বে। যখন দেখল ঠিক তেমনটা ঘটলনা, তখন হয়ত ভেবেছিল দু একদিন যাক নিজেই ছুটে আসবে। কিন্তু আমি...? আমি সারাজীবন এইভাবেই কাটিয়ে দেব এ কথা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। একটু লেখাপড়া শিখেই নিজেকে একেবারে তীসমার খাঁ (কেউকেটা) মনে করেছেন উনি। কি রকম কাঠ হয়ে পড়ে আছে দেখ না...থাকো পড়ে, সারারাত ঐভাবে পড়ে থাকো, সারাজীবন পড়ে থাকো। কেন পড়ে আছ তাও আমি জিজ্ঞাসা করব না। মরে গেলে তুলে ফেলে দেব। নিজের বাপেরও দম্ভ আমি সহ্য করিনা আর তোমার...! কি এমন অমূল্য রত্ন হে তুমি?

আর সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে তো আমার কোন প্রয়োজনই ছিল না। বাড়ির লোকে আমাকে এইভাবে ফাঁসিয়ে না দিলে এসব কিছু ঘটতই না কখনো। নিজের বাড়িতেই দিব্যি মনের আনন্দে থাকতে। আমিতো ভেবেছিলাম বুদ্ধিশুদ্ধি একটু আছে। বুদ্ধিশুদ্ধি...? বুদ্ধি কাকে বলে এ তো তাই জানেনা দেখছি। কুকুর ভাবছেন গাড়িখানা বুঝি তার জোরেই চলছে...কি এক চোরাবালির মধ্যে বাবুজী আমাকে ফাঁসিয়ে দিলেন যে..আপনমনে আমি তো দিব্যি খেলছিলাম। যাক, এখন প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলতে হবে — বেশ তাই সই।

ক্রমশঃ রাত গভীর হচ্ছে। নিস্তব্ধ নিঝুম পথঘাট, বাজারের মধ্যে এদিকে ওদিকে মাঝে মাঝে চৌকিদারের দীর্ঘ টানা সুরের ডাক যেন ঢেউ খেলানো ফিতের মত এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে...তার প্রতিধ্বনি এদিকে ওদিকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কান্নার সুরের মত আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। কখনও বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছে রেলের ইঞ্জিনের বিচিত্র তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দ অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক ভয়ানক দৈত্যের মত তা ঊর্ধ্ব

আকাশে উঠে যাচ্ছে আর তারই পাশে পাশে শোনা যাচ্ছে কুকুরের ডাক, সে আওয়াজ এতই তুচ্ছ যে মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা বহু উঁচু চকচকে উজ্জ্বল লৌহস্তম্ভের আশেপাশে কয়েকটা ক্ষুদে ইঁদুর নাচানাচি করছে। মাঝে মাঝে দু একটা এক্কা বা টাঙ্গা ঘড়ঘড় শব্দ আর ঘোড়ার গলার ঘন্টাধ্বনিতে অন্ধকার মুখরিত করে চলে যাচ্ছে, তারপরেই নির্জনতার আবরণে মুড়ি দিয়ে পৃথিবী আবার যেন পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ছে। আমার কোন কিছুই খেয়াল ছিল না। প্রভার কাল্পনিক মূর্তির সামনে খাড়া করে আমি ভীষণ উত্তেজিতভাবে মনে মনে সওয়াল জবাব চালিয়ে যাচ্ছিলাম, যেন আমার বক্তৃতায় পেয়েছে। আগে যা কিছু ভেবেছিলাম তার প্রতিটি কথা এখন ক্রুদ্ধভাবে পুনরাবৃত্তি করছি আর দ্বিগুণ উত্তেজিতভাবে তার জবাব দিয়ে চলেছি। ওর ব্যর্থতা অথবা নিজের বোকামির কথা স্মরণ করে গালাগালি দিচ্ছি, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি। থেকে থেকেই উত্তেজনা আর নিস্ফল ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠছি, 'প্রভা দেবী তুমি এখনও বোঝনি যে ভাগ্য তোমাকে কার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। এইবার তুমি বুঝবে এবং জানবে আমি লোকটা কেমন!' এর ফাঁকে ফাঁকে সোহরাব-রুস্তমের লাইনগুলো এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পড়ে চলেছি যেন এসব কথা ঠিক এই সময়ের জন্যই লেখা হয়েছিল। রুস্তমকে উত্তেজিত করে তুলবার জন্য সোহরাব বলছে, 'যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘটেছে বহু সহস্রবার, কিন্তু আমার শত্রু জীবিত ফিরে গেছে অথবা আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছি এমনটি আজ পর্যন্ত কখনও ঘটেনি,' বুঝলে প্রভাদেবী? মনে রেখ, 'নেভার দ্য ফীল্ড ওয়জ লস্ট নট দ্য ফো সেভড.'

আমার প্রথমদিনের ব্যবহার একেবারে ঠিক ছিল। আমি কোন অন্যায় করিনি। এমন লোকের সঙ্গে ঐরকম ব্যবহারই করা উচিত। আজ থেকে তো আমার একমাত্র লক্ষ্য হবে ওর দর্প চূর্ণ করা।

রাত্রির পাহাড়ীপথে অন্ধকারের ঝরণা বয়ে চলেছে নিঃশব্দে, ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মত একটির পর একটি মুহূর্ত গড়িয়ে চলেছে...রাত এগিয়ে চলেছে। লণ্ঠনটা বহুক্ষণ ধরে জ্বলছে একভাবে, পলতেটার একটা দিক ক্ষয়ে গিয়ে অন্য প্রান্তটায় আলোর শিখা একটু বেশী উঁচুতে উঠে গেছে। আমি চুপচাপ বসে ভেবে চলেছি। শোয়ার কথা মনেই নেই! মাঝে মাঝে প্রভার কুঁকড়ে পড়ে থাকা দেহটার দিকে চেয়ে দেখছি ঘৃণাভরে তারপর আবার ডুবে যাচ্ছি নিজের চিন্তায়। মুখ ভেংচে মনে মনে বিদ্রূপ করে বলছি, 'আমি যাবোনা ওখানে'! তা এলি কেন এখানে আবার? ওখানেই মরে থাকলে পারতিস।

আলোটা গোলমাল করছে, খুব ধোঁয়া হচ্ছে। লণ্ঠনের শিখা থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে চিমনীর কাঁচের ওপর ধোঁয়ার কালিমা জমে উঠছে একটু একটু করে...।

সাত

পরদিন সকালে নিজের ওপর আমার প্রসন্নতার সীমা ছিলনা, কে জানে কবেকার কোন পুণ্যের ফলে যেন একটা বিরাট দুর্ঘটনা থেকে একচুলের জন্য বেঁচে গেছি, অথবা মস্ত একটা কিছু অপরাধ করে ফেলতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছি। ভাবের আবেগে ভেসে কতবড় ভুল করতে যাচ্ছিলাম, কপালজোরে বেঁচে গেছি এরজন্য থেকে থেকেই নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। দেবীকৃপা ছাড়া আর কি বলা যায়? আর কতটুকুই বা বাকি ছিল? এবার এই শ্রীমতীটিকে একটু শিক্ষা দিতে হবে...প্রভার কথা মনে পড়লেই আমার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে আর কথাগুলো এমন আশ্চর্য হয়ে মনে মনে আবৃত্তি করি যেন এই প্রথমবার এগুলো শুনছি। এত অহঙ্কার? খাবার সময় ভাবীর সামনে বোর্ডের পরীক্ষার কথা বলেছিলাম, তাই নিয়ে আমায় খোঁটা দেওয়া? ঠিক আছে! কালকের সব কথা মনে মনে যতবার ভাবছি মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নে আমি প্রায় মরতে মরতে হঠাৎ বেঁচে গেছি আর এখনও যেন বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে ভয়ে আর আশঙ্কায়।

খেতে বসে ভাবীকে বললাম, 'ভাবী, আমি পরীক্ষায় পাশ করি, এটা তুমি চাও কি চাও না?'

ভাবী ফুলে ওঠা রুটিটা চিমটে দিয়ে তুলে চাকির উপর আছড়ে ফেলে ভাপটা বার করে দিচ্ছিল, আমার কথায় চমকে তাকাল, 'কেন গো, আমি আবার কি করলাম?'

'তুমিই কি সবকিছু কর নাকি? তোমরা সবাই কি ভেবেছ বলতে পার?'

মাথা নিচু করে পরাতের ওপর মাখা আটার তাল থেকে লেচি কাটার জন্য আটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ভাবী বলে উঠল, 'হেঁয়ালি না করে, খুলে বল তবে তো উত্তর দেব।' কার সম্বন্ধে বলছি তাও নিশ্চয় বুঝেছে।

'বলব আবার কি, তুমি যেন জান না কিছু'। আমি কতবার বলেছিলাম এ সব ঝামেলায় আমাকে ফাঁসিওনা তোমরা। কিন্তু তখন তো সবাইকার জিদ চেপে গিয়েছিল। এখন যদি ফেল করি, তোমরাই আবার কাঁদুনি শুরু করবে, আজকালকার ছেলেগুলোর ধরণই এইরকম! মন দিয়ে একটু লেখাপড়া করব বলে আলাদা একটা ঘর ঠিকঠাক করলাম, সেখানেও যদি একে ওকে তাকে এনে ঢুকিয়ে দাও তাহলে পড়াটা হবে কি করে শুনি? আর তো মোটে তিনটি মাস, সেটুকুও দেরী সইল না তোমাদের?' বেশ গলা তুলেই কথা বলছিলাম, ও এদিক ওদিক কাছাকাছিই কোথাও নিশ্চয় আছে। তখন অবশ্য অতটা মনে ছিলনা, কিন্তু পরে এই ভেবে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে উঠলাম যে রাত্রের কথাগুলোর উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে।

'দেরী সইল না, বলছ কেন ঠাকুরপো', ভাবী বেশ গুরুজনসুলভ ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার চেয়ে কি অন্য কেউ আমাদের বেশী আপনার লোক হতে পারে? তোমার অসুবিধা হবে এমন কাজ আমরা করবই বা কেন? কিন্তু আমার অবস্থা তো তুমি

দেখতেই পাচ্ছ। যে কদিন পারছি, করে যাচ্ছি, কিন্তু এরপর তোমাদেরই স্কুল কলেজ যেতে দেরী হবে তো? এখন তবুও মুন্নীবিবির সঙ্গে হাত লাগালে এদিকটা তো সামাল দেওয়া যাবে। ও মহারাণীর কাছে আর বেশী কিছু আশাই করিনা, ঐটুকু যদি করতে পারে তাহলেই হরির লুট দেব। আমার তো মনে হচ্ছে এই নিয়েও হয়ত বিশরকম কথা উঠবে,' একটুক্ষণ চুপ করে রুটি বেলতে বেলতে আবার বলে উঠল, 'দেখি কেমন খাওয়ায় দাওয়ায় সবাইকে'।

'তুমি যা বলছ এটা তো সকলেরই কাজ, কিন্তু তার জন্য আমার উপর এই জুলুম কেন? এর ফলে আমার পড়ারই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হচ্ছে,' ভুরু কুঁচকে কথাটা বললাম আমি।

'মাও মোটেই সন্তুষ্ট নন। ওখানে গিয়ে যা সব কথা লাগিয়েছে সব অমর ঠাকুরপো এসে বলেছে। — পয়সার কাঙাল, হ্যানা ত্যানা কত কি! বোঝ একবার, এখন তো এটাই তোমার নিজের সংসার, এ বাড়ির নামে এই রকম সব কথা বলে বেড়ালে বদনামটা কার হবে? আর পয়সার কাঙাল কে নয় শুনি? তোমার বাপ নয় নাকি? তুমি তো তার একটিমাত্র আদুরে মেয়ে, তাতেও তো দেওয়া থোওয়ার ঐ ছিরি। অমন পয়সার মুখে আগুন। টাকা কি বুকে করে সঙ্গে নিয়ে যাবে নাকি? একেবারে খালি হাতেই তো সবাইকে যেতে হবে শেষকালে বাপু? তা বিয়ে-শাদীতে যদি একটু দরাজ হাতে খরচাপাতি না করে তো অমন টাকা থেকে লাভটা কি? এইসবই তো পয়সা খরচ করার উপযুক্ত সময়।' উপযুক্ত সময়ের কথাটা তুলেই ভাবী হঠাৎ চুপ করে গেল। কারণটা আমি বুঝলাম, যদি ছেলে হয় ওর বাপের বাড়ি থেকে কি রকম তত্ত্ব আসবে তাই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গ ভাবী এড়িয়ে গেল, খানিকক্ষণ খুব ব্যস্ত হয়ে লেচি কেটে রুটি বেলতে লাগল। আমি খাওয়ায় মন দিলাম। মেয়েমহলের এই ধরণের গল্প আমার কোনকালেই রুচিকর ঠেকে না। একটু পরে আবার বলে উঠি, 'ভাবী, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আমি এখন কি করি?'

'তা ঠাকুরপো, তুমিই না হয় বল আর কোথায় জায়গা দেওয়া যায়? এই তো কটা মাত্র ঘর'।

'চুলোয় যাক, যেখানে খুশি থাক, কিন্তু আমায় রেহাই দিক,' ঝাঁঝিয়ে উঠলাম আমি।

'না না , ও আবার কি কথা।' সহানুভূতির সুরে ভাবী বলে ওঠে, 'দ্বিতীয়বার ঘর করতে এল বউ, আর তুমি কিনা এই সব কথা বলছ?'

'প্রথমবারই আসুক আর দ্বিতীয়বারই আসুক, আমার যখন তাতে কিছুই যায় আসে না তখন আমি এই ঝামেলা ঘাড়ে নেব কেন?'

'ওরে বাবা, এত চেঁচিয়ে এসব কথা বোলনা, এখনি মুন্নীবিবি বলে বসবে আমি তোমার কান ভাঙানি দিচ্ছি।' ভাবী চুপ করে গেল। একটু পরে বেশ অন্তরঙ্গভাবে নরমসুরে প্রশ্ন করল, 'তুমি ওর ওপর এত বিরক্ত কেন বল তো?'

'বলব?' বিনা দ্বিধায় আমি উত্তর দিলাম, 'প্রথমতঃ, এখন বিয়ে আমি করতেই চাইনি। জবরদস্তি করে এই পাথরটি আমার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তাছাড়া ওর মুখ দেখলেও আমার বিতৃষ্ণা হয়। এখন তোমরা সবাই বলছ বলেই ওকে পছন্দ করতে হবে এ কোনদেশী জুলুম বলতো? তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব তা তুমি করেছ। কিন্তু আমার সব কিছু ব্যাপারের সমস্ত দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে এমন কোন কড়ার তো করা হয়নি?'

'তোমার যে কেন পছন্দ হয় না তাও তো বুঝিনা বাপু। মুন্নীবিবি, মা, এরা কেউই যদিও খুশি নয় কিন্তু একথা তো ওরাও বলছে যে এত সুন্দর বউ নাকি এবাড়িতে আগে আসেই নি।'

'তা হয়ত আসেনি, তবে আমার তো এমন কিছু অপরূপ মনে হচ্ছে না,' একটু অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর দিই।

'বাপ তো বলে, লেখাপড়ার জন্য বিশ হাজার খরচ করেছে, বাজনা শিখিয়েছে, গান শিখিয়েছে, কতরকম ভাল ভাল সেলাই ফোঁড়াই শিখিয়েছে। নগদ বেশী দিতে পারেনি, তাতে কি? দেখো এবার কোনো আপিসে গিয়ে না বসে।' ঠাট্টার সুরে আবার বলে, 'তা ভাই, তুমি না হয় ওর একটা ডিউটি লাগিয়ে দাও, রোজ ভোরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে 'জাগো মোহন পেয়ারে'...'গান গেয়ে তোমার ঘুম ভাঙাবে', নিজের রসিকতায় ভাবী নিজেই হেসে সারা হয়।

গেলাসের বাকি জলটুকু এক চুমুকে শেষ করে আমি বলে উঠলাম, 'ঠাট্টা নয়, দোহাই তোমাদের, আমাকে একটু পড়াশোনা করতে দাও।'

'ঠিক আছে ঠাকুরপো, মাকে বলে দেখি, আর কোথায় ওকে জায়গা দেব আমি তো ভেবে পাচ্ছি না।'

'মাকে বল নয়তো ভাইয়াজীকে বল, মোটকথা আমার একটু শান্তি চাই...।'

বইখাতা নিয়ে কলেজ যেতে যেতে একটা কথা মনে এল, সবাইকার মুখে শুনছি প্রভা নাকি ভারি সুন্দর, একবার চেহারাখানা ভাল করে দেখে নিতে হবে কিন্তু তখনি আবার মনে হল, 'না কখনো না'। মনের মধ্যে এই ধরণের কোন দুর্বলতাকে একেবারেই আমল দেওয়া চলবে না। একবার একটু নরম হয়ে পড়লেই কে জানে কোথায় গিয়ে আছাড় খেতে হবে। সারাদিন ধরে এই ব্যাপারটাই মনের মধ্যে ছেয়ে রইল,— যাক গে, যা হয়েছে ভালই হয়েছে. অনেক ঝামেলার হাত এড়ানো গেছে, না হলে মিছিমিছি বহু সময় নষ্ট হত। এবার নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়ায় মন দেওয়া যাবে। এখনই তো আমার নিজেকে গড়ে তোলার সময়। পৃথিবীতে কেউ কারো নয়, সবাই নিজের নিজের পথে চলে। তাছাড়া, আমার তো সর্বদা মনে রাখা দরকার যে আমার পথ অন্যাদের থেকে একেবারে আলাদা। আমাকে বড় হতে হবে, কিছু করে দেখাতে হবে। সব কিছু ভুলে পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে যেতে হবে, প্রচুর পরিশ্রম করা দরকার। সারা সংসার চুলোয়

যাক, আমার লক্ষ্য স্থির থাকবে। আজ সারাদিন মনটা বেশ প্রফুল্ল, কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে কি যেন একটা অস্বস্তি বোধ — এ তো উপেক্ষা, আজ পর্যন্ত আমি তো কখনও কারো উপেক্ষা চুপচাপ সহ্য করিনি।

রাতে ও আমার ঘরে আসেনি। মুন্নীর কাছে, না ভাবীর কাছে কোথায় শুয়েছে কে জানে। আমি ওকে দেখতেই পাইনি। মুন্নীর নির্লিপ্তভাব আমার মায়ের নৈঃশব্দ সত্যিই আমার বেশ আশ্চর্য লাগছে। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে মুন্নী প্রভার প্রতি সহানুভূতিশীল। ও খুব সম্ভব মুন্নীর কাছেই শুচ্ছে। যাক, যেখানেই শুক, আমার কিছুই যায় আসে না। কি করে ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া যায় এই বিষয়টা নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম। ওকে উপেক্ষা দেখাবার বা অপমান করবার এতটুকু সুযোগ পেলেও, আমি তা ছাড়বো না। ভেবে দেখলাম, ওর সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ও নির্লিপ্ত ভাব দেখানোটা ঠিক হবে না। তাহলে তো ও বুঝেতেই পারবে না কোন অপরাধের জন্য ওকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আমি এখন কোমর বেঁধে রণক্ষেত্রে নেমে পড়েছি, ওর অহঙ্কারের জোর কতখানি তাই আমি দেখব। স্নান সেরে এসে ভাবীকে বললাম, 'এখনও তুমি এত খেটে মরছ কেন বল তো? এখন বিশ্রামের দরকার। মুন্নীতো আছে, বাড়িতে আরো তো লোক আছে, সব দায় কি তোমার একলার নাকি? খাওয়ার বেলা তো সবাই আছে, কাজ করবার বেলা কি বাইরে থেকে লোক ডাকতে হবে?'

দেখতে পাচ্ছিলাম রাত্রের ডাঁই করে রাখা এঁটো বাসন মাজতে বসেছে প্রভা, এমন আলগোছে বাসনগুলো ধরছে যেন গরম, হাতে ছ্যাঁকা লাগছে। মনে মনে ক্রূর হাসি হাসলাম, 'আহা, একমাত্র আদুরে মেয়ে! এ সব কখনো ছুঁয়ে দেখেছে কি? বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে।'

এরপর থেকে দুবেলার রান্নার দায়িত্ব ওর ওপরই চাপানো হল। ভাবী তো এই দিনটির পথ চেয়ে বসেছিল। মুন্নী দু চারদিন একটু আধটু সাহায্য করল, তারপর সেও কেটে পড়ত। একলা কোথাও বসে বসে ভাবনা আর কান্না এই দুটোই মুন্নীর ভাল লাগে। অবশ্য মুখে সে সর্বদাই প্রভার প্রতি সহানুভূতি দেখায়। রুটি বা অন্য রান্নার কেউ খুঁত ধরলে ও প্রভার পক্ষ নিয়ে জবাব দেয়, 'সারাদিন ধরেই তো বেচারা রুটি বানিয়ে চলেছে, মানুষেরই তো শরীর, না কি?'

আমি তো দু একবার মুন্নীকে খুব করে ধমকে দিয়েছি, বলেছি 'অত যদি দরদ তো নিজেও সঙ্গে সঙ্গে কাজ করলেই পারিস।'

'ভাবী, যদি খোকা হয় তো, আমি সবগুলো শাড়ী নিয়ে নেব কিন্তু, তখন কথাব খেলাপ করা চলবে না, আগে থেকে ঠিক করা হয়েছে', মুন্নী কথাগুলো বলছে ওদিক দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ভাবীর সঙ্গে আমি বাজি রেখেছি' আমাকে দেখে ভাবী লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, আজকাল ওর মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা অদ্ভুত মাধুর্য ওর চেহারাখানায়, ভাবীকে এত ভাল আমার কোনদিন লাগেনি।

সলজ্জভাবে মুন্নীকে একটা ঠেলা মেরে ভাবী বলে উঠল, 'আচ্ছা হয়েছে, থামো তো! সব সময় মুখে এই এক কথা। পুরুষমানুষের সামনে এ সব বলতে নেই, বুঝেছ?'

বাড়ীর আবহাওয়ায় বেশ একটা উত্তেজনার ভাব। ধাই তো আগেই ঘোষণা করে রেখেছে শাড়ী ব্লাউজ নেবে। যে এ বাড়িতে আসে তার মুখেই এখন এই কথা। সবাই চাইছে একটি খোকা হোক, তাই সমস্তক্ষণ সবাই ছেলের কথাই বলছে। কিন্তু ভাবী আর মা দুজনেরই যেন আশঙ্কা যে তাঁদের অন্তরের ঐ মধুর কল্পনাটিতে কারো কুনজর না লেগে যায়। তাই তাঁরা কেবলই বলেন 'সবই তো ভগবানের হাত', মেয়ে হলে কেউ কি আর আটকাতে পারবে?' সত্যি যদি মেয়েই হয় তখন সেই আশাভঙ্গের বেদনা যাতে খুব অসহ্য না মনে হয় তার জন্যেই যেন ওঁরা ঐ সব বলে নিজেদের শঙ্কিত চিত্তকে কিছুটা প্রস্তুত করে রাখতে চান। এদিকে কিন্তু মনে মনে ষোল আনা বিশ্বাস যে নিশ্চয়ই ছেলে হবে। বাড়ীর প্রথম নাতি আসছে, বাবুজী এবং মা দুজনেই এতে খুবই উৎফুল্ল, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে খরচাপত্র যা হবে সে কথা মনে পড়লেই বলেন, 'কি যে হবে ঈশ্বরই জানেন'। কারণ ঐ সময় খরচের আর অন্ত থাকবে না, বড়রকম একটা ভোজ তো দিতেই হবে। সুতরাং ছেলে, না মেয়ে? এই চিন্তাতেই সবার দিন কাটছে। ভাবী শাড়ীখানা কোনরকমে ঢিলেঢালা ভাবে গায়ে জড়িয়ে রাখে, চলাফেরা বিশেষ করেনা, আর আপনমনে কি যে ভাবে, তখন মুখে ফুটে থাকে একটু হাসি।

অবশেষে একদিন রাত্রি বারোটায় যথেষ্ট ছুটোছুটির পর ভাইসাহেব একটি কন্যাসন্তানের জনক হলেন। মা মাথায় চাপড় মেরে বললেন, 'নাও, শেষ পর্যন্ত ঘরে মা ভবানীই প্রথম এলেন।' প্রত্যাশিত আনন্দের ওপর যেন হিমপাত হয়ে গেছে তবু সবাই আনন্দিত হবার চেষ্টা করছে। ধাই এর কত কি পাবার আশা ছিল কে জানে, তার তো মুখ চুণ হয়ে গেছে। নার্স গম্ভীর মুখে বাচ্চাকে নাওয়াচ্ছে ধোয়াচ্ছে, ধাইয়ের মতে কেসটা একটু গোলমেলে ঠেকছিল, তাই নার্স ডাকতে হয়। কার্বলিকের গন্ধে বাড়ি ভরপুর, সে রাতে সারাবাড়িতে ছুটোছুটি পড়ে গিয়েছিল — জল গরমকরা, এটা নিয়ে আয়, ওটা নিয়ে আয়...আমরা তো সারারাত জেগে। ভাবীর কেমন লাগছিল কে জানে, কিন্তু বাবুজী যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এটা ঠিক। এখনকার মত একটা বড় খরচ তো বেঁচে গেল। এখন যদি কেউ কিছু বলতে আসে তো জবাব দেওয়া যাবে, 'তার জন্য আবার মিষ্টি আর ভোজ!' তারপর এটাও বলা চলবে, 'নাও, এই প্রথম দফা এসে গেল বাড়ীতে।'

মুন্নী আমাকে খেপাচ্ছিল, 'সবচেয়ে বড় কাকা হয়ে গেছ, এবার তো মিষ্টি খাওয়াতেই হবে'। কাকা হয়ে কতখানি খুশি হয়েছি তা জানিনা কিন্তু একটা কথা ভেবে বেশ আনন্দ হচ্ছে — এখন বাড়িতে কাজ খুব বাড়ল। কাজ করার লোক প্রভা ছাড়া আর কেই বা আছে? ভাবীর সেবা শুশ্রূষা করার জন্যই একজন চাই। মায়ের তো বয়স হয়েছে, শরীরও অসুস্থ, কোন কাজই করতে পারবেন না। জপের থলির মধ্যে হাতটি ভরে মালা জপতে জপতে মুন্নীর কাছে সারা সংসারের খবর নেওয়াই তাঁর একমাত্র কাজ। তা ছাড়া

নাপতিনীকে ও দরকার মত আদেশ-নির্দেশ দিতে পারেন। ভাবীর দরকারি কাজকর্ম করে দেবার জন্য নাপতিনীকে পাঁচসাত দিনের জন্য ডাকা হয়েছে। আগে তো রাত্রের রান্না সেরে ভাবীই ওঁর পা টিপতে বসত এবং সেই সময় সারাদিনের রিপোর্ট পেশ হত আর তাই নিয়ে সাতকাণ্ড রামায়ণ চর্চা হত। কিন্তু মা আর বাবুজী তো মেয়ের হাতের রান্না খাবেন না, সুতরাং ঐ কর্মটি প্রভাকে তো করতেই হবে।

প্রভা সেই কোন ভোরে উঠে ভাবীর জন্য হরীরা (পুষ্টিকর পানীয়) তৈরী করে। সকাল ছ'টার মধ্যেই ওদিকের সব কাজ সারা হয়ে যায়। তারপর রাত্রের বাসন মাজা, রান্নাঘর ধোওয়া সেরে স্নান করে চটপট রান্নাঘরে ঢোকে যাতে কলেজযাত্রীদের দেরী না হয়ে যায় এবং ভাইয়া খেয়ে যেতে পারেন। দুপুর বারোটা নাগাদ ওর রান্না শেষ হয় তারপর বাসনপত্র ধুয়ে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে ঘন্টাখানেক গম নয়ত ডাল বাছে, আর না হলে ভাবীর কাছে বসে অমর বা কুমারের জামাকাপড় কিছু রিফু করার কাজ সারে। নামকরণের দিন অন্তত তিরিশ চল্লিশজন লোক খাবে, তাছাড়া সত্যনারায়ণের কথাও হবে। তার জন্য ডাল মশলা ইত্যাদি ঝেড়ে বেছে রাখতে হবে। বিকেল তিনটের মধ্যেই আবার উনুনে আগুন পড়ে, প্রভা মাথা ঝুঁকিয়ে কাঠে ফুঁ দিতে থাকে, ধোয়ায় চোখে জল এসে যায়, আঁচলে চোখ মোছে, সারাটা মুখ একেবারে লাল হয়ে ওঠে। রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত চলে এই পর্ব। তারপর আবার ভাবীর প্রয়োজনমত কাজগুলো করতে হয়। অনেক রাত্রে দিবাকরের বাড়ি থেকে ফিরে প্রায়ই দেখি ও মায়ের পায়ের কাছে বসে পা টিপছে। এইসব করতে করতেই বোধহয় রাত এগারোটা বারোটা বেজে যায়। আমার এত আশ্চর্য লাগে দেখে, ও কি অনায়াসে আর নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে, যেন একটা যন্ত্রের মত — এত কাজ করতে ওর যেন কোন কষ্টই হচ্ছে না। প্রতিটি নতুন কাজ ও এমন সহজ স্বাভাবিক ভাবে হাতে তুলে নেয় যে দেখে একবারও মনে হয়না ওর মধ্যে কোন ক্লান্তি বা এতটুকুও অনিচ্ছার ভাব আছে। আর এইটে দেখেই আমার রাগ হয়ে যায়। ওর একটু ক্লান্তি বা অনিচ্ছা দেখতে পেলে তবেই তো আনন্দ, ওর কষ্ট দেখে মনে মনে বলতে পারতাম, 'কি গো বাছা? কেমন লাগছে এখন?'

প্রথম প্রথম যখন সর্বদাই মাথা নত করে থাকত তখন এটা কারো চোখে পড়েনি কিন্তু আজকাল একটা ব্যাপার সবাই লক্ষ্য করছে সেটা হল, প্রভা পর্দা মানেনা। বাবুজী তো সবসময় একটু জানান দিয়েই অন্দরে আসেন। দু একবার প্রভার ঘোমটাহীন মুখ দেখে ভেবেছেন হয়ত উনি আসছেন সেটা ও বুঝতে পারেনি। কিন্তু যেদিন বুঝলেন প্রভা একটু মুখটা ফিরিয়ে নেয় মাত্র, পর্দা মানে না, সেদিন কথায় কথায় মাকে বললেন, 'বউ আর মেয়েতে আর কোন তফাৎ রইল না। মেয়েও ঘোমটা খুলে চুল এলিয়ে ঘুরে বেড়ায় আবার বউয়েরও দেখি মাথার আঁচল কোথায় রইল তার কোন হুঁশ নেই।' এই নিয়ে প্রথমটা বেশ হাঙ্গামা হল। ভাবী যা ফোড়ন কাটবার তা তো কাটলই, মাও মালাজপা বন্ধ করে বেশ ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'দেখ বউমা, তোমাদের বাড়িতে পর্দা মানা

না হয় তো নাই হল, কিন্তু এ বাড়ির নিয়মকানুন তো মানতে হবে। আমাদের কাছে না হয় নাই মানলে, কিন্তু অতবড় গুরুজন তাঁর সামনে তো একটু লজ্জাশরম থাকা উচিত? এমন কাণ্ড কখনো দেখিওনি শুনিওনি। আত্মীয়- স্বজন সবাই পাঁচকথা বলছে, যে দেখছে সেই ছিঃ ছিঃ করছে। এই তো 'দষ্ঠৌন'- এর দিন কত লোক আসবে, কি বলবে তারা ফিরে গিয়ে? আরে বাবা, নিজেদের বাড়িতে তোরা ন্যাংটা হয়ে নাচ গে যা, আমাদের কিছু যায় আসে না।' ভাইয়াতো দু একবার আমাকেও বকুনি দিয়েছেন, 'কিরে সমর, বউকে তুই বারণ করতে পারিস না? মা বাবুজী সবাইকারই এটা খুব খারাপ লাগছে। অন্তত ওঁরা যতদিন আছেন, ওঁদের মানমর্যাদা তো বজায় রাখা দরকার। পর্দা মেনে চলাটা যে খুবই মহৎব্ তা আমিও মনে করিনা, কিন্তু আমাদের পরিবারে তো এ প্রথাটা পালন করা হয়! তোর বউটি যে কি ধাতুতে তৈরী তা বুঝে উঠতে পারিনে, কারো কথাই তো শোনে না। মা যে এত বকাঝকা করেন তাতে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই।' কথাটা সত্যি। ও একটিও কথা বলেনি, কিন্তু এত বলা কওয়া ধমক ধামকের পরও মুখ ঢাকেনি। মনে হয় যেন কথাগুলো ও শুনতেই পায়নি। মা আরও খেপে যান এইজন্য — এত কথা শোনার পরও ওপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ে না, এই ব্যাপারে ও যেন একেবারে পাথরের মত নিষ্প্রাণ। তবুও মা কেবলই বলে চলেন, 'বউ-এই বেহয়াপনার দরকারটা কি শুনি? মাথায় আঁচলটা তুললে তোমার কি ক্ষতি হবে? আজ পর্যন্ত এ বাড়িতে কারো ঘোমটা কখনও চিবুকের ওপরে ওঠেনি।'

নীতিগতভাবে আমি পর্দাপ্রথার বিপক্ষে। আমি ইতিহাসের ছাত্র, তাই এটা জানা আছে যে মুসলমানদের আগমনের পরই পর্দা নিয়ে বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয়। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা ঘটতে দেখে মনের মধ্যে একটা জোর ধাক্কা খেলাম। মা বাবা সকলের সামনে প্রভা অবগুণ্ঠনহীন মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ দৃশ্যটা খুবই অদ্ভুত আর অভিনব লাগছিল। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করার জন্য অন্য কোন উপায় আছে কি? মানলাম যে তুমি মাথা নত করেই ঘোরাফেরা কর, কিন্তু কেবল চোখ আর মাথা নত করলেই তো শ্রদ্ধা দেখানো যায় না! কিন্তু ওকে বলবই বা কি করে? দু একবার মুন্নীকে একটু উচ্চকণ্ঠে বলেছি, 'মুন্নী, তোর এই ভাবী বড় বেয়াদব, কেউ কি একে ভদ্রতা, শিষ্টাচার এসব শেখায়নি?' কিন্তু সে সব বোধহয় ওর এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন অশান্তির পর অবশেষে বাড়ির সবাইকে ব্যাপারটা মেনে নিতেই হল। আর আজকাল তো বাড়িতে যদি নতুন কেউ আসে কেবল তখনই এ কথাটা সবার মনে পড়ে। মা তখন চেষ্টা করতে থাকেন যাতে প্রভা একটু আড়ালেই থাকে, কারণ লোকের সামনে তাকে তো বলাও যাবে না।

একা হাতে এত কাজ প্রভা যে ভাবে সামলাচ্ছে তা দেখে প্রথম কিছুদিন সবাই একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই খুঁত ধরা আরম্ভ হয়ে গেছে। মুন্নী পর্যন্ত মাঝে মাঝে বলে ফেলে, 'ভাবী, এত ঘি খরচ করোনা, শেষে ফুরিয়ে যাবে।'

নতুন প্রাণীটির আগমণের পর এ সংসারের আর্থিক কাঠামোটা আরও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। মায়ের চারপাই এর আশে পাশে পায়চারী করতে করতে মাথায় হাত বুলিয়ে বাবুজী প্রায়ই বলেন, 'খরচ বড় বেশী হচ্ছে 'ধীরজের মা', বেচারা ধীরজ আর কত টানবে, ও তো মরে মরেও করছে, ওর আর দোষ কি, পরিবারটিতো ছোট নয়? সমরটা এবার কোনমতে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে কোথাও একটা লেগে গেলে ও বেচারা একটু হাঁফ ছাড়তে পারে। ওকে দেখলে আমার প্রাণটা যেন কণ্ঠায় উঠে আসে। খাটুনী আর চিন্তা ভাবনায় শুকিয়ে একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছে। না একটু গল্পগুজব করে, না কোন বন্ধু বান্ধবের কাছে যায়। তাছাড়া শরীরেই বা আর কত সহ্য হয়? হেসে খেলে খেয়ে পরে কাটাবার দিনগুলোতে এদেব শুকিয়ে মরতে হচ্ছে। কি দিনকালই যে এলো, এমনটা কেউ কখনো ভেবেছিল? তাব ওপর আবার হতভাগী মুন্নীটাও ঘাড়ে পড়েছে। এবার তো ওকে যেতেই হবে। সমাজের মুরুব্বিদেব দিয়ে একটু বলা-কওয়া করিয়েছি, একটু আশার আলোও দেখা গেছে। কিন্তু এমন টি টি পড়ে গেছে চারদিকে যে কেউ সোজাসুজি কথা বলতেই চায়না। আগে হাতে কিছু না পেলে কেউ কিচ্ছু করতে চায়না।' প্রভাকে আসতে দেখে নিজেই অন্যদিকে ঘুবে গেলেন, তাবপর ভারী গলায বলে উঠেন, 'একটু হাত টেনে কাজ কর বউমা এককালে এ বাড়িতে টাকা থাকত থলি ভবা ভবা, চার টিন করে ঘি আসত, আজ আর কিছুই নেই.'

এইসব চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যেও আমার কাজকর্ম কিন্তু ঠিকঠাক চলছে। কলেজে কিম্বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ি কিছুক্ষণের জন্য গেলেও ফিরে এসে দেখি এরই মধ্যে আমাব ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছড়ানো জিনিসপত্র সব যথাস্থানে বাখা, লন্ঠনটি ঝকঝক করছে। মাঝে মাঝে এ সব দেখে মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু কষ্ট হত, কিন্তু আমি সেটাকে পড়ার চাপের জন্য ক্লান্তি বলে ধরে নিতাম।

মাঝে মাঝে নিজের ওপরেই রাগ হয়। দিনে রাতে কেবল প্রভা আব প্রভা। কি খাচ্ছে, কোথায় থাকছে, কি করে কাজ করছে, এক মুহূর্তও বিশ্রাম করতে পায়না তো। দিব্যি খাসা ডাল তরকারী খেয়েও যখন তখন নুন, ঝাল কম, বেশী হয়েছে বলে চেঁচামেচি করি, সুযোগ পেলেই মা, মুন্নী বা ভাবীর সঙ্গে ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে খোঁচা দেওয়া কথা বলি, কতরকম কুকথা বলি। অর্থাৎ কোন না কোন ভাবে নিজের সমস্ত মন ওর দিকেই নিবিষ্ট রেখেছি। পৃথিবীতে আমার যেন আর কোন করবার মত কাজই নেই। আমার তো পড়াশোনা আছে, এই মনোযোগটা সেখানে লাগাচ্ছি না কেন? যদি ফেল করি বদনাম তো যতদূর হবার তা হবেই, ভবিষ্যতেরও সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ওর প্রতি কোনরকম মনোযাগ দেবার যখন প্রয়োজনই নেই তখন ওকে নিয়ে এত চিন্তিত হওয়া কেন? ও কখন কোন কাজটা করছে তার হিসেব রাখাই যেন আমাব স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ওকে এতটা গুরুত্ব দেবার দরকারই বা কি? বাড়িতে কুকুর বেড়াল যেমন আছে তেমনি 'সে'ও আছে ধরে নিলেই তো হয়। অনেকবার মনে মনে

স্থির করেছি ওর সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব কম চিন্তা করব কিন্তু যেকোন ব্যাপার নিয়েই ভাবি না কেন চিন্তাটা শেষ পর্যন্ত ওর কাছেই এসে পৌঁছয়। এই তো, যেই দেখলাম ময়লা গেঞ্জিটা কে জানে কখন কাচা হয়ে সন্ধ্যায় বাইরে টাঙানো দড়িতে মেলা রয়েছে, আবার ফিরে এসেই দেখি পাট করে আলনায় রাখা — ব্যস, হয়ে গেল আমার পড়াশোনার দফা রফা, এখন বসে বসে ঐ প্রভার কথাই ভাবছি।

আজকাল আরো একটা পরিবর্তন অনুভব করছি। আগে আগে যখন প্রভার ঘাড়ে নতুন কোন কঠিন কাজ চাপানো হত তখন আমার খুব একটা তৃপ্তি হত এই ভেবে যে 'বেশ হয়েছে, ও আরো খানিকটা কষ্ট পাবে।' ওর কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটাও আমি উৎসুক ভাবে লক্ষ্য করতাম। মনের গভীরে বোধহয় ইচ্ছাটাও থাকত যে, দেখতে হবে এইসব অত্যাচারে কাতর হয়ে ও কখন কোথায় বসে কাঁদে। সেই সময় ওকে হাতে নাতে ধরে লজ্জায় ফেলার সুযোগ খুঁজতাম। রাত্রে বা ভোরবেলায় শীতে গায়ে যখন কাঁটা দিয়ে উঠত তখন ভাবতাম, প্রভাদেবী এখন বোধহয় বাসন মাজতে বসেছেন অথবা রান্নাঘর ধুচ্ছেন, কেমন আরাম লাগছে তাঁর! কিন্তু যখন দেখলাম সব কাজই ও সহজভাবে কোনরকম প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে বিনা প্রতিবাদে করে চলেছে তখন আমার ঔৎসুক্যের তীব্রতা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে এল। প্রথম প্রথম এই সব দেখে যে তৃপ্তি পেতাম তার বদলে এখন মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি আর ক্ষোভ অনুভব করছি। একটা অস্ত্র যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে, এখন উপায়? এরপর কি করা যায়? এভাবে পরাজয় স্বীকার করা তো হতেই পারেনা!

খেতে বসে ভাইসাহেব মাঝে মাঝে বলেন, 'দেখ বউমা, দু চার মিনিট ওর কাছে গিয়ে একটু বসো। বেচারা একলা রয়েছে, কখন কি দরকার পড়ে।' প্রভা পর্দা যদিও মানে না কিন্তু সে বাবুজী অথবা ভাইসাহেবের সঙ্গে কখনও কথা বলেনি। মাথা নিচু করে কাজ করে যায়। দুপুরবেলা সে রোজই ভাবীর কাছে গিয়ে বসে, তাই ভাইসাহেবের কথার উত্তর দিতে গিয়ে ও চমকে মাথা তোলে, ঠোঁট কেঁপে ওঠে কিছু বলার জন্য কিন্তু পরক্ষণেই আবার মাথা নামিয়ে নেয়।

নামকরণ উৎসবের দিন এসে পড়ল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি খুব শোরগোল চলেছে। মা দারুণ চিৎকার চেঁচামেচি করে চলেছেন, 'কিছু বলা হয়না তাই একেবারে মাথায় চড়ে বসেছে। সংসারের সব কাজকর্ম কি তোর ইচ্ছেমত হবে নাকি? আমরা কি মানুষ নই? সবাই আমরা মুখ্যু, আর যতকিছু জ্ঞান সব উনিই গিলে বসে আছেন? শুভকাজের দিনে একি অলুক্ষুণে কাণ্ড! এত কাণ্ড হয়ে গেল, এদিকে আমরা কিছু জানতেও পারলুম না, বোঝ ব্যাপার!

বাড়িশুদ্ধ লোক ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যে নিজের খাটে শুয়ে ভাবী তো ডুকরে ডুকরে কাঁদছে আর বিলাপ করছে, 'অমন লেখাপড়ার মুখে আগুন। ওঁর পড়ার ঠেলায় মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। হে ঠাকুর। কি যে কপালে আছে কে

জানে! মুন্নী চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গুরুতর ব্যাপার কিছু যে ঘটে গেছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। ভীত আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখলেই বোঝা যায় সেই অপরাধটি করেছে। কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে সে ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি জানলে কখনও করতাম না মা। আমি ভেবেছিলাম বুঝি সাদা একটা মাটির ঢেলা।'

'সাদা মাটির ঢেলা!' ঠিকরে উঠল মা। 'ভারি আমার সাতকেলে ঠানদিদি এলেন জবাব দিতে। বলি তুই ভেবেছিস কি শুনি? বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়েছে? চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি যে দেখতে পাসনি ওতে সুতো বাঁধা রয়েছে? সমানে মুখে মুখে তক্কো করে চলেছে, প্রত্যেকটি কথার জবাব দিতেই হবে যেন। কি শিক্ষাটাই দিয়েছে তোর বাপ মা, গুরুজনের মুখের ওপর কেবল চোপা করা! একে তো ঘোমটার বালাই নেই, বাইজী নাচউলিদের মত সবাইকার সামনে মুখ খুলে ঘুরছে, কে এলো কে গেল কোন ভ্রুক্ষেপই নেই, তার ওপর জিভের ধার যেন কাঁচির মত। আমার মেয়ে হলে ঐ জিভ টেনে ছিঁড়ে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতুম।' মা ভীষণ চটেছে। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছে, কারণ জবাব দেবার কথা বলতে বলতে কাঁদতে শুরু করল।

ব্যাপারটা কিছুটা বুঝলাম, কিন্তু সবটা নয়। মুন্নীকে বেশ জোর গলায় প্রশ্ন করলাম, 'মুন্নী, হয়েছেটো কি?' আমার চড়া মেজাজ দেখে মুন্নী কোন উত্তর দিল না। কুঁয়র বলল, 'সকালে পণ্ডিতজী যে গণেশঠাকুরের পূজো করেছিলেন সেইটি দিয়ে ভাবী এঁটোবাসন মেজেছে।' এইসময় ভাবীর কান্নার জোর বেড়ে গেল, সব কথা আবার নতুন করে মনে পড়ে গেল বোধহয়।

আমারও বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। মায়ের ফোঁপানি এখনও শোনা যাচ্ছে। ভাবী বলে চলেছে, 'কিছু একটা যদি ঘটে যায় তো ওর আর কি? ওতো নিজের হাত ঝেড়ে ফেলে আলাদা হয়ে যাবে। হে ঠাকুর তুমি সব দেখছ, সব বুঝছ। দুনিয়ায় কত দুঃখ হে ভগবান!'

রূদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁতে দাঁত ঘষে ছুটে গেলাম ওর সামনে, বেড়াল যেমন করে ইঁদুর ধরে তেমনিভাবে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে ডানহাতখানা তুললাম তারপর সমস্তশক্তি একত্র করে সপাটে এক চড় কষিয়ে দিলাম; প্রভার বাঁ গালে আমার পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল। ও পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিল তারপর ধপ করে বসে পড়ল। আমি বলে উঠলাম, 'হারামজাদী, এ বাড়িতে বাস করতে হলে বুঝে সুঝে থাকবি, আর না হলে যেখানে ইচ্ছে বিদেয় হ। কত বড় নাস্তিক দেখা যাক'।

ফুটবলের মাঠে গোল দেবার মত খেলোয়াড় যেভাবে ফিরে আসে তেমনি ঘাড় বেঁকিয়ে টলতে টলতে ফিরে এলাম নিজের জায়গায়। সবাই স্তব্ধ, মায়ের রাগ আর কান্না বন্ধ, ভাবীও একদম চুপ। কিন্তু চড়টা মারবার পরই এমন একটা তীব্র আত্মগ্লানিবোধ আমার সমস্ত অন্তরকে প্রচন্ডভাবে আঘাত করল যে আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। নিঃশব্দে চলে এলাম ওখান থেকে। চড় মারার পর কে কি বলল, ও কাঁদছিল কি না, ওইখানেই পড়েছিল না কেউ উঠিয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল এ সব

কিছুই জানিনা। তবে এটা মনে আছে যে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিদারুণ জোরে চড়টা মেরেছিলাম, এত জোরে যে আমার নিজের আঙুলগুলো বেদনায় ঝনঝনিয়ে উঠেছিল।

নিজের ঘরের চৌকাঠ পেরোতেই আমার ভিতর থেকে কে যেন কেবলি বলতে লাগল, এ আমি কি করলাম? কি ভূতে ধরেছিল আমায়? জীবনে এই প্রথম স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুললাম! আমার সারা হাতখানা নিষ্পন্দ, যেন গলে যাচ্ছে। ভাইসাহেব ভাবীর গায়ে হাত তোলেন বলে এই আমিই কত কটু সমালোচনা করেছি। সে সব কথা মনে পড়ছে। কিসের ঘোরে আমি এমন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম? সাত আট মাস পরে আমি প্রথম কথা বললাম, আর সেই কথা কিনা হল এই গালাগালি? চড় মেড়ে প্রথম কথা বললাম? কি যে ব্যাপারটা ঘটে গেল সেটাই যেন বহুক্ষণ ভাল করে মাথায় ঢুকছিল না।

নিজের অন্তরের ভিতর থেকে তীব্র বিষতিক্ত ঘৃণাভরা স্বরে কে যেন বলে উঠল, 'ওরে নীচ কাপুরুষ, এই তোর আদর্শবাদ? এই তোর মহান হয়ে ওঠার স্বপ্ন? পড়িস তো সবেমাত্র ইন্টারমিডিয়েট, এরই মধ্যে সারা দুনিয়ার ভালমন্দ বিচার করতে শিখে ফেলেছিস?' আর বেশী ভাবতে পারলাম না, কতদিনের সঞ্চিত অশ্রু বন্যার মত নেমে এসে আমাকে বিবশ করে ফেলল, যেন প্রবল তুফানে ভেসে গেলাম, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম, এত কান্না যে মনে হচ্ছে যেন আমার সমস্ত সত্তা গলে অশ্রু হয়ে বয়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড ধিক্কারে নিজের দুইগালে পাগলের মত চড় মেরে মেরে অজস্র আঙুলের দাগ এঁকে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

আট

মুন্নী জিজ্ঞাসা করল, 'ভাইয়া তোমার পরীক্ষা কবে থেকে?' 'পরীক্ষা'? ঘাড়টা চুলকোতে চুলকোতে চমকে উঠলাম, পরীক্ষার তারিখটা মনেই পড়ছে না, অথচ ইদানিং আমি রোজ একবার করে পরীক্ষার তারিখ আর গুরুত্বের কথা স্মরণ করে থাকি। মুন্নী যে কি কথাটা বলল তার মানেই ঠিকমত আমার বোধগম্য হলনা। শুধু তাই নয় প্রথমটা তো আমার সামনে কে দাঁড়িয়ে কথা বলছে সেটাই যেন বুঝতে পারছিলাম না। তারপর পরীক্ষার কথা শুনে সেইকথা ভাবতে ভাবতে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মুন্নী আর তার প্রশ্নের কথাও ভুলে গেলাম।

আমি একটু একটু করে পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো? কথাটা মনে হতেই আমি খুব জোর দিয়ে বলে উঠলাম, 'না, না, আমি কোন অস্বাভাবিক ব্যবহার করছি না, আমার

চিন্তা ভাবনার মধ্যে কোন অসংলগ্নতাও নেই। চালচলন সম্বন্ধেও আমি পূর্ণসচেতন।' কিন্তু আমি পাগল নই এই কথাটা নিজেকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করি ততই মনের মধ্যে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যাচ্ছে যে আমি ক্রমশই পাগল হয়ে যাচ্ছি। যদি কথাটা সত্যি বলে ধরে নিই, তাহলে কবে থেকে এ ব্যাপারটার সূচনা হল?

সেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মারা নিদারুণ চড়, দেওয়ালে সেই মাথা ঠুকে যাওয়া, তারপর টলমল করে লুটিয়ে পড়া সেই দেহ — কেবলি বিদ্যুৎঝলকের মত সেই দৃশ্যটা আমার চোখের ওপর যেন ঝলসে ওঠে আর সমস্ত হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। অনুতাপ আর আত্মগ্লানিতে আমার সমস্ত অন্তরটা যেন মোচড় দিচ্ছে, প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে, এটা করা আমার কোনমতেই উচিত হয়নি। ওর গায়ে আমার হাত উঠল কি করে? এমন অসভ্যতা আমার দ্বারা কি করে সম্ভব হল? সত্যি কি ব্যাপারটা ঘটেছিল? সবটাই স্বপ্ন বা কল্পনা নয় তো?

কিন্তু ওরও তো এমনটা করা ঠিক হয়নি। গণেশঠাকুর আর মাটির ঢেলার প্রভেদ কি ওর চোখে পড়ল না? কোন পরিবারের এই ধরণের বিশ্বাস যদি থাকেই, তাকে অপমান করবার অধিকার ওকে কে দিল? লেখাপড়া শেখার অর্থ কি এই? পড়াশোনা তো আমরাও করি। তাছাড়া, হাজার হোক এই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, দেব দেবীর প্রতি অবজ্ঞা তো কোনমতেই সহ্য করা চলেনা। ভালই হয়েছে, একটু শিক্ষা হয়ে গেল। এইভাবে ওর অপরাধটাকে খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আমি আমার নিজের ব্যবহারের ঔচিত্য নিজেকেই বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। ধর, যদি কিছু একটা ঘটেই যায় তাহলে তারজন্য কে দায়ী হবে? 'সত্যার্থপ্রকাশ' এবং ঐ ধরণের বইপত্র পড়ার ফলে এইসব যতরাজ্যের দেবীদেবতার প্রতি বিশ্বাস আমারও নেই, কিন্তু তাই বলে অন্যদের বিশ্বাসে যাতে আঘাত না দিয়ে ফেলি সে বিষয়ে আমি সর্বদা সচেতন থাকি। কোন দেবতাকে তুমি পূজা না করতে পার কিন্তু তাঁকে অপমানই বা করবে কেন? এই সব বলে বলে নিজেকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করি, তবু ভিতর থেকে কে যেন কেবলই বলতে থাকে, 'গায়ে হাত তোলা কোনমতেই উচিত হয়নি।'

ঐ ঘটনার পরের দিন আমার বাইরে বের হতে যেন সাহস হচ্ছিল না। সকালে ঘুম ভাঙতে মনে হল যেন কতকাল ধরে আমি অসুস্থ। সারা শরীরে কি যন্ত্রনা। মুখ তুলে কারো দিকে চাইব কি করে? এতবড় একটা অপরাধ করার পর বাইরে আলোয় গিয়ে দাঁড়াব কেমন করে? ও যদি সামনে এসে পড়ে, গালের ওপর সেই পাঁচ আঙুলের দাগ যদি আবার আমায় দেখতে হয়? সে দৃশ্য সইব কি করে? এই দ্বিধা আর দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি চোরের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম আর সারাটা দিন এধার ওধার ঘুরে বেড়ালাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। পার্কে গাছতলায় বসে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম — এই যে সারাদিন ধরে আত্মচিন্তায় ডুবে থাকা, কথায় কথায় তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠা, অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাওয়া, আত্মসংযম হারিয়ে মারপিট করে বসা, ঝগড়া,

কান্নাকাটি — এসব কি করে চলেছি আমি? নিজেকে আমি যা কিছু বোঝাই না কেন, বাইরে থেকে আমার এইরকম কাণ্ডকারখানা দেখে যে কেউ এই কথাই নিশ্চয় ধরে নেবে যে আমি ক্রমশ পাগল হয়ে যাচ্ছি। খুব একখানা বিয়ে হল বটে! কি অবস্থা আজ আমার!

বহুকাল পরে আজ আবার মন্দিরে (ভিতরে নয়) গিয়ে নিজের জায়গাটিতে বসে রইলাম সারাটা দিন...উঃ কি জঘন্য কাজই না করে ফেলেছি! হায় ভগবান, কি করি আমি এখন?

কি এক চিন্তার বোঝা আমার মাথায় চেপে বসল কথাটা ভাবলেই থেকে থেকে নিজের ওপর নিজেই ফুঁসে উঠছি। সমস্তক্ষণ কেবল 'প্রভা' আর প্রভার ওপর কি ব্যবহার করেছি সেই চিন্তারই রোমন্থন করে চলেছি। এইভাবে নিজের যে কত ক্ষতি করছি আমি! দুনিয়ায় কি আর কোন কাজ নেই? ক্লাসে গিয়েও গোমড়ামুখে বসে থাকি আবার বেজারমুখে ফিরে আসি, চব্বিশঘন্টা কেবল ঐ এক কথা, ঘুমে জাগরণে ঐ এক চিন্তা — এই আট দশ মাসের মধ্যে একবারও মনখুলে কথা বলিনি, হাসিঠাট্টা সে সব তো ভুলেই গেছি।

সেই দিন আবার মনে মনে সঙ্কল্প করলাম, যা হয়ে গেছে তা গেছে! এখন থেকে ঘর, বাইরে সব কিছু ভুলে কেবল পরীক্ষার কথাই ভাবব, অন্য কোন দিকে আর মন দেব না। যা ঘটে গেছে তারজন্য দিবারাত্র চিন্তা করে নিজের মাথা খারাপ করার কোন মানে হয়না। পৃথিবীতে কেউ আমার আপন নয়, কারো সঙ্গে নিজেকে জড়াব না। কারো প্রতি আমাব কোন দায়িত্ব নেই, কোন অপরাধও নেই। সবাই নিজ নিজ ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, নিজেব নিজের পথে চলবে। হে ঈশ্বর, তুমি সাক্ষী রইলে, আমার আজ পর্যন্ত যত অপবাধ তুমি ক্ষমা কব। এখন থেকে কেবল নিজেকে নিয়েই থাকব এবং পড়াশোনা করব।

সেইদিন থেকে সত্যিই নিজের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। বাড়ির এবং বাইরের যে সব ব্যাপার আগে আমাকে সর্বদা বিব্রত করত, যে সব চিন্তা ঘন্টার পর ঘন্টা আমার মানসিক শান্তির বিঘ্ন ঘটাত সে সব এখন আমি শুধু দেখে যাই, কিন্তু নিজেব পড়া এবং পরীক্ষা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তাও করিনা। পড়াটাকেই যেন একটা ভূতেব মত নিজের সামনে খাড়া করে তারই সঙ্গে দিবারাত্র লড়াই করে চলেছি। বাড়িতে থাকলেই মেজাজ খারাপ হবে তাই বেশীরভাগ বাইরেই কাটাই। সেখানে তো সর্বদাই কিছু না কিছু ঘটছে। পথ চলতে চলতে কোন দোকানদারের কাছে চেয়ে নিয়ে সেদিনের খবরের কাগজখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিই আর দিনের অধিকাংশ সময়টাই কাটে দিবাকরের ওখানে। গল্পগুজব কমই হয়। সে নিজে থেকে কোন কথা শুরু করলে কিছুক্ষণ আলোচনা চলে। দিবাকরের কে এক শিরীষ ভাইসাব আছেন তাঁর কথা ও খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে বলতে একেবারে গদগদ হয়ে ওঠে। সর্বদাই বলে তিনি

এলেই আলাপ করিয়ে দেবে। আমার অবশ্য ঔৎসুক্য নেই, আসে যদি তো আলাপ করা যাবে। আমার পড়ার নেশা দেখে সবাই তো আশ্চর্য হয়ে গেছে।

সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে কেউ কিছুই বলেনি। বাবুজী, ভাইসাহেব সবাই শুনেছেন। ভাবী তো বেশ খুশিই হয়েছে। ছোটভাইরা আমাকে দেখলে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, আমাকে কি দেখতে খুব ভয়ানক পাষণ্ডের মত লাগে? মরুকগে যাক, মাথা ঝাঁকিয়ে আমি আবার নিজের কাজে মন দিই। বাড়িতে এখন সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। ভাবীর সঙ্গে তো আজকাল দেখাসাক্ষাৎ কমই হয়। আমি যখন বাড়ি ফিরি তখন ভাবী কে জানে কোথায় নিজের খুকী নিয়ে মগ্ন, কখনও দুধ খাওয়াচ্ছে, কখনও বা তেল মাখিয়ে গরম জলে স্নান করাচ্ছে। বাচ্চা হবার পর থেকে সংসারের কাজ করা ও একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। মুন্নীতো নিজের খুশিতে চলে। কখনও ভাবীর বাচ্চাকে খেলায় নয়তো মুখ গোঁজ করে বসে থাকে। বাড়ির সমস্ত কাজ এখন প্রভার ঘাড়ে। তবে তারজন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই, আর এটা এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপারও নয়। ও কখন খায়, কখন বিশ্রাম করে এসব কথা ভাবতে আমি ভুলেই গেছি। মাঝে মাঝে ওর নামে চিঠি আসে, আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ সে চিঠি খুলে দেখি, আমরা পড়ে তারপর চিঠি ওর হাতে দেওয়া হয়। ও চিঠি লিখে যাকেই ডাকে ফেলতে দিক না কেন, সে চিঠিও খুলে পড়া হয়। জল দিয়ে খামের মুখ খোলা হয়, এ বাড়ির নামে কিছু নিন্দে মন্দ লিখছে কিনা দেখতে হবে তো? তবে আজকাল মনে হয় ও চিঠিপত্র লেখা বন্ধই করে দিয়েছে।

একদিন শুনতে পেলাম মা প্রভাকে ডেকে বলছে 'হ্যাঁরে বউ, বাড়িতে চিঠিপত্র লিখিসনে নাকি? এনার কাছে তোর বাপের চিঠি এসেছে যে, জিজ্ঞাসা করেছে তোর অসুখ বিসুখ করেনি তো?'

চাটনীপেষা থামিয়ে প্রভা উত্তর দিল, 'কি আর লেখার আছে মাজী, আপনি তো দেখছেনই সব ঠিকই আছে।'

'সে তো আমরা দেখছি। তা বাছা, মাঝে মধ্যে দু ছত্তর লিখে দিস, মা বাপের প্রাণ তো! লিখেছে পাঁচ ছ'খানা চিঠির তুই নাকি একটারও জবাব দিসনি।' কে জানে কতকাল পরে প্রভা মায়ের কাছ থেকে এমন নরমসুরে কথা শুনল।

আমি রেশন আনবার জন্য থলিগুলো খালি করছিলাম, দেখতে পেলাম প্রভার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। একটুক্ষণ চুপ থেকে তারপর ঢোঁক গিলে আস্তে আস্তে বলল, 'লিখব মাজী'।

কোন দিকে না তাকিয়ে আমি চলে এলাম ওখান থেকে। আর কি কথাবার্তা হল শোনা হলনা। সে কথা কেবল মনে হচ্ছিল, জোর করে পড়ায় মন দিলাম। আমার মনে হচ্ছে আমার মনের অনুভূতিগুলো ক্রমশঃ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, সংবেদনশীলতা জিনিসটা আমার মধ্যে যেন নিঃশেষিত। কোন ব্যাপারই আমার কাছে মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য

বলে মনে হয় না। এই যেমন, আজকাল আমার সব কাজই তো ও করে, কিন্তু আমি একেবারে নির্লিপ্ত। রাত্তিরে ঘটিভরে জল রেখে যায়। ভাইসাব বা মা বাবুজী কারো যদি গুড়ের চা খাবার ইচ্ছা হয় তাহলে ঐ চা তৈরী হয়। গেলাস বা বাটি ভর্ত্তি গুড়ের চা আমার কাছেও পৌঁচে যায় নিঃশব্দে। কে আনছে আমি চেয়েও দেখি না, চুপচাপ খেয়ে নিই। রান্নাঘরে তো প্রায় সর্বদা ওই থাকে, সুতরাং প্রথম প্রথম খাওয়ার সময় ভারি মুশকিল হত। আরো রুটির দরকার হলে ডাক দিতাম মুন্নীকে। এখন ও নিজেই বুঝে নিয়ে পরিবেশন করে। থালাটা চটপট টেনে নিয়ে আমি ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে খাওয়া শুরু করে দিই। আবার রুটির দরকার হলে থালাটা ঠেলে দিই ওর দিকে। পাতে যেটা কম থাকে সেটাই আরো খানিকটা দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম এইসব নিয়ে হাসি পেত এখন আর এতে কিছু নতুনত্ব নেই। এখন তো মনে কোন অস্বস্তিবোধও নেই, মনে হয় সারাজীবন এইভাবেই চালিয়ে যাওয়া যায়। যন্ত্র থেকে যেমন ভাবে কাজ নিতে হয়, জলের কল থেকে জল নিতে হয় তেমনিভাবে নিজের দরকারটুকু মিটিয়ে আমি আবার ডুব দিই নিজের মধ্যে। সত্যি বলতে কি, কথা বলা ছাড়া সব কাজই তো চলছে। প্রভা যে একটা জীবন্ত সংবেদনশীল প্রাণী এ বোধটাই যেন আমি ভুলে গেছি, ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই। সব ব্যাপারই এখন আমি এমনভাবে দেখি যেন ওগুলোর থেকেআমি একেবারে আলাদা। এমনিভাবে সবকিছু ক্রমশ ভুলে যাচ্ছি।

এই ভুলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা ঘটছে এত দ্রুত যে আমি নিজেও একটু ভয় পেয়ে যাচ্ছি। এটা কি পাগল হয়ে যাওয়ার পূর্বলক্ষণ? যে দিনটা শেষ হল সেটা আমার কাছে স্বপ্নের মত ঝাপসা আর অলীক মনে হয়, আবার ভবিষ্যতের প্রতিও জাগেনা কোন ঔৎসুক্য, জড়তা যেন আমার সর্বাঙ্গ ছেয়ে। তাছাড়া এটাও অনুভব করছি যে শুধু সংসার বা পারিপার্শ্বিক নয় আমি নিজেকেও ভুলতে বসেছি, নাওয়া খাওয়ার ঠিক থাকেনা। যখন তখন ঝোঁক উঠলেই সব কাজ ফেলে গীতা পড়তে বসে যাই। নিজের কাপড় জামা, জিনিসপত্র কোথায় রাখি ভুলে যাই। পড়তে পড়তে বই কোথায় রাখি, তারপর খুঁজতে খুঁজতে কতক্ষণ কেটে যায়। তারপর হঠাৎ বইয়ের রাশির মধ্যেই পাওয়া যায় তখন তুলে মাথায় ঠেকাই। কলম, পেন্সিল, চাবী, পয়সাকড়ি সবই রাখি আর ভুলে যাই। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সকালে যা পড়েছি সন্ধ্যায় তা ভুলে যাই, যে বইখানাই তুলে নিই মনে হয় একেবারে নতুন। সবসময়ই কেমন আত্মবিস্মৃত ভাব। আমার চেতনা যেন ধীরে ধীরে নিভে আসছে। অন্তরের গভীরে এক সময় যেমন বিচিত্র অনুভূতির ঢেউ খেলে যেত, তা আজ আর চঞ্চল তরল নয়, যেন জমাট বরফের মত নিষ্পন্দ প্রাণহীন কঠিন। তারওপর কোন কথা পড়লে তা ছিটকে দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ে। কোন সাড়া জাগায় না।

কেবল একটি কথা আমি ভুলিনি, তা হল, আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে।

কঠিন পাথরের বুকের ওপর দিয়ে যেমন বয়ে যায় জলের ধারা তেমনি করে সময়

দিন আর রাত্রির তরঙ্গ তুলে তুলে বয়ে চলেছে, আর আমি যেন ঐ প্রাণহীন পাথর, যেমনকার তেমনিই পড়ে আছি।

বেলা দশটা প্রায় বাজে, এখনও ডাল ফুটতে শুরু করেনি। প্রভা দ্রুতহাতে আটা মাখছিল। আমি রান্নাঘরে একবার ঢুকে বাইরে আসতে আসতে শুনলাম মুন্নী ছুটে এসে বলছে, 'ছোটভাবী, ও ছোটভাবী তুমি বড়ভাবীকে এখনও দুধ দাওনি কেন? সে রেগেমেগে কাঁদছে'।

প্রভা আটা মাখতে মাখতেই নরমসুরে বলল, 'মুন্নীবিবি, দুধ তো জ্বাল দেওয়াই আছে। কিন্তু এখনি এদিকে ডাল ফুটে উঠবে, সবাই খেতে এসে পড়বে, রুটির জন্য সবাইকে বসিয়ে রাখতে ভাল লাগেনা, তাই দুচারখানা আগে থাকতে সেঁকে নিচ্ছি।' একটু মিনতির সুরেই এবার সে বলে, 'তুমি একটু দিয়ে এসনা ভাই, ওই যে উনুনের ও পাশে বাটিচাপা দেওয়া আছে।'

মুন্নী ওদিকে গিয়ে দেখল তারপর চমকে বলে উঠল, 'ও ভাবী, দুধ যে পড়ে গেছে গো? কি হবে এখন?' 'পড়ে গেছে?' মুখ শুকিয়ে গেছে প্রভার। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে উঠে এল এদিকে, 'ঠিকই তো রেখেছিলাম, কি জানি...'

'বড় ভাবী তো এখন বাড়ি মাথায় করে তুলবে।'

ওদিকে শোনা গেল অমর মায়ের কাছে নালিশ করছে, 'দেখছ তো মা দশটা বাজছে; এখনও খাবার তৈরী নেই, কখন খাব আর কখনই বা পড়তে যাব?'

'তোমাদের দেরীই হোক আর যাই হোক, ও তো ওর কাজ সেই ঢিমে তালেই করবে', মা ঝাঁকিয়ে উঠল। এইসব কথার সময় মা পূজো বন্ধ করে ফোড়ন কাটে, তারপর আবার যেখানে থেমেছিল সেইখান থেকে পূজো শুরু করে। মা বলে, 'এক আধদিনের কাজে দেরী হলে বোঝা যায়, কিন্তু যে কাজ রোজকার সেটুকুও সামাল দিতে পারে না।'

অমর ওখান থেকে বক বক করতে করতেই রান্নাঘরে এসে ঢুকল, 'ভাবী তো এখনও আটা মাখছে, ডালও হয়নি বোধহয়।' রান্নাঘরের মাঝখানের কোমরসমান উঁচু পাঁচিলটার কাছে এসে অমর দেখতে পেল ডাল হয়ে গেছে কিনা, ধোঁয়ায় ওর চোখে জল আসছিল। ওদিকে তখন উল্টেপড়া দুধের কাছে মুন্নী দাঁড়িয়ে আছে আর ভীত সন্ত্রস্ত প্রভা আটামাখা হাতেই মাটি থেকে দুধ পরিষ্কার করছে। অমর ওখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, 'খুব দুধ ফেলাফেলি হচ্ছে এখানে।'

মায়ের পূজোপাঠ মাথায় উঠল। বারুদে অগ্নিসংযোগ হল যেন, 'দুধ ফেলেছে, খাসা, খুব কাজ করেছে, পয়সা তো ওর গাঁট থেকে যায় না! ওর বাপ আমার দরজায় একপাল মোষ বেঁধে দিয়ে গেছে কিনা, তাই কখনও দুধ পড়ে যাচ্ছে, কখনও উথলে যাচ্ছে। ডাল ফুটে ফুটে উথলে পড়ে যাচ্ছে, কেউ দেখবার নেই, চোখের মাথা খেয়েছে সব, যেমন চালচলন তেমনি সংসারের হাল করে তুলেছে, হাঁটাচলার যা ছিরি, কখনো

এটা ভাঙছে, কখনো ওটা ফেলছে, হাতে পায়ে যেন জোর নেই। কাজ করে যেন থুতনি ওপরদিকে তুলে। মজা দেখছেন উনি, নিজে নিশ্চয় আড়াইসের গিলেছে, এখন বড়বউটা উপোষ করে মরুক। এমন অলুক্ষুণে মেয়ে আমি জন্মে দেখিনি বাপু। এমন লেখাপড়ার মুখে আগুণ, দশ কেলাস পর্যন্ত পড়েছেন, হুঁ দশকেলাস...রান্নাঘরটার কি দশা করে রেখেছে, চাকি এখানে পড়ে, বেলন ওদিকে গড়াচ্ছে। খেতে বসলে যেন বমি উঠে আসে। আমার মাথায় একি বোঝা চাপালে ঠাকুর, কেঁদে কঁকিয়ে যা হোক করে দিন কাটছিল, এ সব দেখে দেখে আর সহ্য হয়না...ওঁর যেন আকাশ থেকে টাকাবৃষ্টি হচ্ছে...।'

তারপর কি হল তাই নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে নিজের বই খাতা নিয়ে পড়তে চলে গেলাম। আগে হলে এরকম ক্ষেত্রে কি করতাম বা বলতাম জানিনা, কিন্তু এখন মনে হল এ সব তুচ্ছ কথায় কান দেবার দরকারই নেই। প্রভা কি করেছে বা কি করে থাকে, সেগুলো ভাল কাজ না খারাপ এসব নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন অনুভব করি না। যেমন চলছে চলুক এতে আর বিশেষত্ব কিছু নেই। প্রভার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং বাড়ির লোকেরাও কেউ আমার আপন নয়, এই রকমই একটা মনোভাব আমার মধ্যে গড়ে উঠেছে।

মাঝে দু এক পিরিয়ড ক্লাস ছিলনা, সেই ফাঁকে বাড়ি এসে দেখলাম আমার ঘরে থালা ঢাকা দেওয়া রয়েছে। চটপট খেয়ে নিয়েই আবার ফিরে গেলাম। বিশেষ কিছুই মনে হলনা। তবে বাড়ির আবহাওয়া দেখে মনে হল বটে যে সকালে তারপর ভালরকম কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে। হোক গে, আমার তাতে কি যায় আসে...।

ফেব্রুয়ারী চলছে, শীতটাও পড়েছে দারুণ। মার্চের গোড়াতেই পরীক্ষা, তাই এখন পরীক্ষার প্রস্তুতিব জন্য কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। আমি প্রায়ই দিবাকরের বাড়ি পড়তে চলে যাই, কারণ বাড়িতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে দুপুরে নির্বিঘ্নে লেখাপড়া কবা যায়। কিছু না কিছু হাঙ্গামা লেগেই আছে, আর নয়ত কোন একটা কাজ ঠিক এসে ঘাড়ে পড়বে। মুন্নী হয়তো এসে বলবে আটাকল থেকে চট করে আটা এনে দাওনা ভাইয়া, ভাবী বলবে 'বৈদ্যজীর কাছ থেকে একটা ভাল ওষুধ এনে দিলে না তো ঠাকুরপো?' তাছাড়া দুজনে একসঙ্গে পড়লে অনেক কিছু ভালভাবে বোঝাও যায়। আমরা দুজনে মাঝে মাঝে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেও চলে যাই। একলা যাবার সাহস আমার নেই। দিবাকরের একেবারে নিজস্ব একটা আলাদা ঘর আছে, তাই মাঝে মাঝে রাতে ওর ঘরে থেকেও যাই। সত্যি বলতে কি ওর বাড়িতে পড়তে বা ঘুমোতে গেলে আমি অনেক শান্তিতে থাকি। নিজেদের বাড়িতে তো সর্বদাই কিছু না কিছু ঝামেলা লেগে আছে, বাড়ি ঢুকলেই সবাইকার বেজার মুখ দেখতে হয়। কখনো মায়ের কান্না, ভাবীর গজগজ লেগেই আছে। তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস আমার মনের মধ্যে মাঝে মাঝেই যেন ধাক্কা মারে — সেটা প্রভার ভাবলেশহীন মুখ, ও যেন

পাথর হয়ে গেছে। সর্বদাই গম্ভীর আর বিষন্ন, দু'চোখের তলায় গভীর কালিমা, শীতে ঠোঁটদুটো শুকনো, পায়ের গোড়ালিতে ময়লা ফাটা দাগ উঁকি দিচ্ছে।

সকালে দিবাকরের বাড়ি থেকে ফিরে শুনলাম মা ওকে একটু স্নেহের সুরেই বকাবকি করছে, 'কতকাল মাথাটা ধুসনি বল তো? মাঝে মাঝে তো একটু তেল জল দিতে হয় রে মুখপুড়ী, মাথাটা একেবারে জংলিদের মত করে রেখেছে, একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিলেই হয়, আপদ চুকে যায়। কত উকুন যে আছে চুলের মধ্যে, রান্নায় পড়ে কিনা কে জানে। মায়ের বলার মধ্যে ক্রোধ বা শ্লেষের সুর ছিলনা বলেই হয়ত প্রভা সাহস করে উত্তর দিল, 'তুমিই বল মাজী, কখন ধোব?' কিসে যে মায়ের রাগ হয়ে যায় বোঝা মুশকিল। ঐ কথা শুনেই গলা চড়ে গেল, 'আ মরে যাই, এত কাজ আমি কেন করব, এই তো শোনানো হচ্ছে? কিঁ বউই এনেছি , কাজের খোঁটা দিচ্ছেন উনি। নিজের কাজটুকু করার সময় পাসনা, খাবার তো সময় ঠিকই পাস? কি এত কাজ তুই করিস একটু হিসেব দে দেখি। দুবেলার রান্নাটুকু, এই তো কাজ, তা এই কাজেই তো তোর সারাদিন কেটে যায়। আমাকে দেখা দিকিন কোন বাড়িতে বউকে কাজ করতে হয়না? তোর বাপের ঘরে হয়তো দশটা চাকরবাকর আছে, আমার বাড়িতে তো বউদেরই কাজ করতে হবে।'

কলের কাছে দাঁড়িয়ে কয়লার গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজছিলাম। দুহাতে দুলিয়ে দুলিয়ে বাচ্চার কান্না থামাতে থামাতে ভাবী আমার দিকে ঈশারা করে বলল, 'দেখছো তো, একটু কাজ করতে হচ্ছে বলে রোজ একটা শোরগোল লাগিয়ে দেবে। আমি কি কাজ করতাম না? মাকে কখনও কিছু বলতে শুনেছ তখন? কি এত কাজ করছে যার জন্য এত ঢাক পেটানো? সবাইকে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে হবে ওর কাছে। ওরে, আমার জন্যে যা করতে হয়েছে তা আমি সুদসমেত চুকিয়ে দেব, পরে যেন না কথা ওঠে...।'

ভাইয়া ওদিক থেকে গর্জে উঠলেন 'দিনরাত খিটিমিটি চলছেই, ভোর থেকে শুরু হয়ে গেল, আর কোন কাজকর্ম নেই? ওদিকে ন'টা বাজছে।'

কিন্তু কেউ কান দিল না ওর কথায়। মা নিজের মনেই বলল, 'খিটমিট করি বলেই তো তবু সংসারটা চলছে, না হলে এতদিনে সব লাটে উঠত। এ বাড়িতে লাথি না মেরে কাজ হয় না। যতক্ষণ কিছু বলা না হবে ততক্ষণ কেউ কুটোটিও নাড়বে না। না বললে পরণের শাড়ীখানাও সেলাই করবে না, ছেঁড়া ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে, তারওপর ময়লা চিটে। শাড়ীখানা এত নোংরা আর ছেঁড়া সেটাও কি তোর চোখে পড়েনা? আসল কথা কাচাকুচি করতে উনি হাঁফিয়ে ওঠেন, কে অত খাটে! ততক্ষণ একখানা বই হাতে ধরিয়ে পালঙ্কে বসিয়ে দাও তাহলেই খুশি...'।

চোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে দেখতে পেলাম শাড়ীখানা এতই জরাজীর্ণ অবস্থা যে সেলাই করা বা পরিষ্কার করার কোন মানেই হয় না। শীতে ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে ছেঁড়াশাড়ীর ফাঁক দিয়ে তাও দেখা যাচ্ছে। যাক গে, আমার কি! মুখ হাত ধুয়ে

গামছায় মুখ ঘাড় মুছতে মুছতে চলে এলাম। কলহ কতদূর গড়াল, আরো কি কি কথা হল সে সব জানবার জন্য বিন্দুমাত্র কৌতুহল বোধ করলাম না। এসব ব্যাপার নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার শক্তি যেন আমার মধ্যে কোনকালে ছিল বলে মনেই হয়না।

দুপুরের পর ফিরে এসে দেখলাম বাবুজী রাগারাগি করছেন, 'পর্দা না হয় নাই মানল। বুকে পাথর চাপিয়ে তাও সহ্য করছি, কিন্তু নির্লজ্জপনারও একটা সীমা আছে। ওপরে গিয়ে মাথা ঘসতে বসেছে, চারপাশের লোকজন দেখলে কি বলবে সে খেয়াল পর্যন্ত নেই? শীতের সময়, রোদে বসবার জন্য সকলেই ছাদের ওপর থাকে। এদিক ওদিক নজর চালাতে তো কোন বাধা নেই। মুন্নীটার এতখানি বয়স হল তারও কি এতটুকু আক্কেল বিবেচনা নেই, বসে বসে ওর মাথায় জল ঢালছে।'

মুন্নী মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'কি যে আজগুবি কথা বল বাবুজী। এখন কি রকম শীত, তুমি তো কোনরকমে 'রাম'-রাম করতে করতে দু ঘটি জল ঢেলে স্নান সেরে ফেল, আমাদের মাথা ঘসে চুল ধোওয়া কি অত সহজে হয় নাকি? দু ঘন্টা লাগে। এই ঠাণ্ডায় ভিজে গায়ে অতক্ষণ নিচে থাকা যায় নাকি? জলে হাত দিলে হাত যেন কেটে যায়। ছাদে রোদ ছিল তাই সেখানে গেছে তো কি এমন ক্ষতি হয়েছে শুনি?'

'তা শীত তো পড়বেই', মুন্নীর রকমসকম দেখে বাবুজী একটু ঠাণ্ডা মেরে গেলেন। মা বলে উঠল, 'তিনটাকা মন কাঠ কিনে সারাদিন ধরে গরমজল করা হবে অত পয়সা নেই আমার। একজন হলেও বা কথা ছিল, এই বাড়ি শুদ্ধ লোকের গরমজল করতে তো কাঠ লাগবে দু মন।'

মায়ের কথা বলার ক্ষমতা আজকাল অদ্ভুতরকম বেড়ে গেছে। আর ভাবী তো সবসময় বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘুরছে।

আমাব সারা দেহ এমন অবসন্ন যেন আফিমের ইঞ্জেকশন নিয়েছি। মাঝে মাঝে মনে হয় আমাকে এমন একটা শক্ত খোলার মধ্যে পুরে বন্ধ করে ফেলা হয়েছে যেখানে কারো কণ্ঠস্বর পৌঁছয় না, কেউ আমাকে ছুঁতে পর্যন্ত পারেনা। আমার মনের মধ্যে কোন অনুভূতি জাগে কিনা, কেউ কথা বলে উঠতে চায় কিনা তাও আমি বুঝতে পারি না। হয়ত সব অনুভূতি দম আটকে চাপা পড়ে গেছে আর নয়ত তাদের কোন অস্তিত্বই আর নেই। বাইরে ভিতরে সবকিছুই যেন মিথ্যে, অর্থহীন, মনের ওপরকার স্তরটা তো কঠিন হয়েই গিয়েছিল, এখন ভিতরটাও ক্রমশ জমাট বেঁধে যাচ্ছে। আমি কি ক্রমশ বাইরে থেকে ভিতর পর্যন্ত একেবারে প্রস্তরীভূত হয়ে যাচ্ছি?

না, না এসব কথা আর ভাবব না। পরীক্ষার আর পাঁচ সাত দিন মাত্র দেরী আছে।

নয়

শেষ পেপারটা দিয়ে হল থেকে যখন বেরিয়ে এলাম মনটা তখন বেশ হাল্কা আর খুশি খুশি লাগছে। লিখেছি ভালই। মাথা থেকে যেন একটা ভারি বোঝা নামল। এতদিন তো এই একটা উদ্দেশ্যের পেছনে প্রাণপণ করে খেটেছি, এবার কি করা যায়? এই সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করার আগেই দিবাকর বলে উঠল, 'চল, আজ জমিয়ে একটা সিনেমা দেখা যাক। কতকাল যে সিনেমা দেখিনি।' তারপর, 'আজকের সিনেমা আমি দেখাব, মাকে রাজি করাতে পারলে কিরণকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। বেচারী কতকাল যে কোন ছবি দেখেনি, নিশ্চয় মনে মনে ভাবে 'কি এক গাড্ডায় এসে ফেঁসে গেছি।' দিবাকর নিজে থেকে সিনেমা দেখাবার কথা না বললে আমি সঙ্কটে পড়ে যেতাম।

বাড়ি আসবার সময় ও আবার মনে করিয়ে দিল যেন সন্ধ্যায় ঠিক সময়ে পৌঁছে যাই, আমি আবার নিজের দার্শনিক চিন্তায় ডুবে ভুলে না বসে থাকি। কিন্তু বাড়িতে সেদিন কি ঘটনা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তা আর ও কি করে জানবে।

একযুগ পরে হঠাৎ মুন্নীর স্বামীদেবতাটি এসে হাজির হয়েছেন। কেন জানিনা এই লোকটার চেহারা দেখলেই আমার বিতৃষ্ণা আসে। সারাবাড়িতে হৈ চৈ পড়ে গেছে, সকলেই খুব আশ্চর্য হয়ে গেছে। বাইরের বৈঠকখানা ঘরেই বসানো হয়েছে তাকে। বাবুজী আর ভাইসাবই সাধারণত ঐ ঘরটায় বসেন। আর কিছু এখনও বোঝা যাচ্ছে না, তবে এসেই এটুকু সে জানিয়ে দিয়েছে যে মুন্নীকে নিতে এসেছে। এই দু আড়াই বছরের মধ্যে মুন্নী বেঁচে আছে না মরেছে সে খবরটুকুও নেয়নি, একটা চিঠিপত্র লেখেনি, বাবার লেখা অন্তত খান কুড়ি চিঠি বেমালুম হজম করে বসে আছে, আত্মীয় কুটুম্বদের কারো অনুরোধ উপরোধেও এতটুকু নরম হয়নি তাকে হঠাৎ আজ আবির্ভূত হতে দেখে সবাই একেবারে যাকে বলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। মুন্নীকে নিতে এসেছে শুনে আমি তো একেবারে স্তম্ভিত। বাড়ির সবাই কেমন যেন ভয়ে ভয়ে ঘোরাঘুরি করছে, ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার জন্য সবাই উৎসুক। প্রভা আর মুন্নী রান্নাঘরে নিঃশব্দে কাজ করছে। মা আর ভাবী নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কিছু আলোচনা করছে এবং মাঝে মাঝে কুঁয়ার কে বাইরে পাঠাচ্ছে, 'যা দেখি চুপি চুপি শুনে আয় তোর বাপের সঙ্গে কি কথাবার্তা হচ্ছে।' ভাবী নিজেও পা টিপে টিপে দরজার আড়ালে এসে কান পেতে দাঁড়াচ্ছে আবার ফিরে গিয়ে মাকে বলে আসছে। যেটুকু শুনতে পাচ্ছে তার ওপর নিজের আন্দাজ মত বাড়িয়ে কমিয়ে বলছে। এই অপ্রত্যাশিত হৃদয় পরিবর্ত্তনের কারণটা জানতে সবাই উৎসুক। বৈঠকখানায় বেশ গুরুগম্ভীর ভাবে আলাপ আলোচনা চলেছে।

রাত্রে খাওয়ানো দাওয়ানো শেষ হবার পর বাবা এসে মাকে জানালেন, 'মুন্নী কাল সকাল দশটার গাড়ীতে যাবে'। সারাবাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

ব্যাপারটা জানবার জন্য আমরা সবাই বাবার কাছে এসে ঘিরে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ ধরে আসল কথাটা জানবার জন্য প্রতীক্ষা করতে করতে মা একেবারে অধীর হয়ে পড়েছে, ঝাঁঝিয়ে বলে উঠল, 'বসো তো আগে, সব খুলে বলবে তো, তা না কোথাও কিছু নেই হঠাৎ 'কাল মুন্নী যাবে'। ঐ আঁটকুড়ের হঠাৎ কি এমন বিপদটা হল শুনি? এই দুটো বছর উনি ছিলেন কোন চুলোয়?' মা বেশী গলা তুলতে পারছেনা, ওদিকে আবার বৈঠকখানায় শোনা গেলে বিপদ।

মায়ের খাটের পায়ের দিকে বসে পড়লেন বাবুজী। মেঝেতে একটা ছোট লণ্ঠন জ্বলছে, আমরা সবাই শীতে জড়োসড়ো হয়ে তার এদিকে ওদিকে বসা, হাঁটুর ওপর মুখ ঠেকানো, বাবুজী কি বলেন শোনার জন্য সবাই উৎকর্ণ। মুন্নী এদিকে বসে আছে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। কোনরকমে বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে একগলা ঘোমটা টেনে ভাবীও এসে হাজির। প্রভাকে দেখা যাচ্ছে না। ভাইসাব, অমর, কুঁয়ার সবাই মিলে ঘিরে বসায় লণ্ঠনের আলো আরো ঢাকা পড়ে সবকিছু ঝাপসা দেখাচ্ছে। কুঁয়ারের হাত আবার লণ্ঠনের মাথায়, হাতখানা একটু গরম করতে চেষ্টা করছে, কেউ অবশ্য ওর দিকে নজরই দিচ্ছে না।

বাবুজী বেশ গম্ভীরভাবে বললেন, 'ও এসেছে মুন্নীকে নিয়ে যেতে। অনেক করে ক্ষমা- টমা চেয়েছে, বলছে 'খুব অন্যায় হয়ে গেছে, আর কখনও এমন করব না। যদি করি তো আমার কান মুলে দেবেন। সমাজের মাথারা যা দণ্ড দিতে বলবেন সব নেব।' কান্নাকাটি শুরু করে দিলে আমি আর কি বলব বল?'

'কথাবার্তা কিছু বলল, না কেবলই কাঁদল? হতচ্ছাড়ার হঠাৎ এত দরদ উথলে উঠল কেন শুনি? সেই পেত্নীটা কোন চুলোয়?' জামাই সম্বন্ধে মায়ের মুখে বেশ অভিনব ভাষা বেরোচ্ছে।

আরে, সেই পেত্নীটার জন্যই তো বেটার আক্কেল হয়েছে। কাপড় চোপড় গয়নাগাঁটি সব পোঁটলা বেঁধে নিয়ে পাঁচ ছ মাস হল সে চম্পট দিয়েছে। পুলিশে রিপোর্টও করেছিল, কোনই ফল হয়নি। এতদিনে হুঁশ হয়েছে।'

আমরা চমকে উঠলাম, ওঃ, তাহলে এই ব্যাপার! এখন ঠেকায় পড়ে লাটসাহেবের এখানকার কথা মনে পড়েছে। কুঁয়ার চটে বলল, 'মুন্নীদিদিকে তুমি কিছুতেই পাঠাবে না বাবুজী!' কিন্তু ওই গুরুগম্ভীর পরিবেশে কেউ ওর কথায় কান দিল না। ভাইসাহেব বললেন, 'এখন তো বলছে ঐ মেয়েটাই আমার সর্বনাশ করল। একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, নিজের ভাল মন্দও বোঝবার ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। ঐটে আমায় কি যে মন্তর করেছিল কে জানে, আমার বুদ্ধি বিবেচনা সব কে জানে কোথায় চলে গিয়েছিল!'

মা মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল 'বুদ্ধিশুদ্ধি তোর মায়ের বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল,' তারপর গভীর একটা শ্বাস নিয়ে মা বলল, 'এমন লোকের উপর ভরসা করা যায়? দুদিন পরে আবার কার খপ্পরে পড়বে কে জানে? আমি তো বাপু মেয়েকে পাঠাব না। সেবারে আধমরা করেছিল, এবার একেবারেই শেষ করে দেবে'।

'আরে বাপু সে তো শপথ করে বলছে,' বাবুজী বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'কথা শুনে মনে হচ্ছে এখন ও নিজের ভুল বুঝেছে, বুঝলে ধীরজের মা, একবার দোষ করে ফেলেছিল বলে সারাজীবনই কি ঐরকম ভাবে চলবে নাকি? ঐ বয়সে অনেকেই বুদ্ধিশুদ্ধি খুইয়ে বসে। আমি ওর সঙ্গে সব কথা সোজাসুজি আলোচনা করে নিয়েছি।'

মা কিন্তু একেবারে রাজি নয়, আগের মত তাচ্ছিল্যের সুরেই বলল, 'তোমার আবার আলোচনা, যে যেমন বুঝিয়ে দেয় তাই বিশ্বাস করে বসে থাক।'

'তোমার এইটেই বড় খারাপ, এতেই আমার রাগ হয়ে যায়। বোঝ তো কচু, কিন্তু নিজের জিদ কিছুতে ছাড়বে না। মাঝে মাঝে অন্যের কথাটাও শুনে দেখ দেখি।' ক্লান্ত ও হারমানা বাবুজী আবার বললেন, 'এখন দায়ে ঠেকেছে, সেইজন্যেই নিজে থেকে এসেছে। একবার ঘা খেয়ে এখন ওর চোখ ফুটেছে। কথা শুনেই মনে হচ্ছে যথেষ্ট অনুতপ্ত, এখন আর হম্বিতম্বি করবেনা। এখন পাঠিয়ে দিলে ক্ষতি কি? আর তাছাড়া, ওকে কি এইভাবেই সারাজীবন রেখে দিতে চাও? লেখাপড়া বা কোন হাতের কাজ শেখাব এমন সামর্থ্য তো নেই, ছেলেদেরই তো ঠিকমত মানুষ করতে পারছি না। সবাইকারই নিজের নিজের দায়িত্ব আছে। আমরা আর কতদিন? আর নয়ত বল, মুন্নীর আবার একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাক।'

মা চটে মটে বলে উঠল, 'তোমার মুখে আগুন! ছেলেপিলের সামনে এমন কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা করল না একটু? আবার বিয়ে দেবেন! সারা সমাজ গায়ে থুথু দেবে, এমনিতেই তো বদনামের শেষ নেই। ঐ আর্যসমাজীগুলোর সঙ্গে মিশেই তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি গোল্লায় গেছে।'

'তা হলে বল কি করব? উচিত কথা বলছি, তা তো তুমি বুঝছ না, কিছু বলতে গেলেই তোমার রাগ হয়ে যায়, তুমিই বল কি করা যায়? আমার তো মনে হচ্ছে এমন সুযোগ আর আসবে না। নিজে বাড়ি বয়ে এসেছে। মুন্নীর ভবিষ্যৎটা একটু ভেবে তো দেখ। এইখানে পড়ে থেকে কেবল এই সংসার ঠেলবে? সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে তখন আপশোষ করতে হবে বসে। সেই যে পুরাণে আছে না, নাগদেব স্বয়ং যখন উঠোনে এলেন তখন পুজো না করে এখন সাপের গর্তের সামনে পুজো করতে যাওয়া, সেই অবস্থা হবে।'

মা কিছু বলবে বলে মুখ খুলেছিল, এমন সময় হঠাৎ মুন্নী ডুকরে কেঁদে ওঠায় সবাই চমকে উঠল। এতক্ষণ ও হাঁটুতে মুখ ঠেকিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ছিল নিঃশব্দে। শীতের জন্যই হোক, বা মুখটা আড়াল করার জন্য হোক দুই বাহু হাঁটু ঘিরে জড়িয়ে রেখেছিল। এখন কান্নার দমকে ওর মাথাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমি ছিলাম সবচেয়ে কাছে। আমি ওর মাথাটা তুলে ধরে নরম সুরে প্রশ্ন করলাম, 'কি হল মুন্নী, কাঁদছিস কেন রে? বল, কেন কাঁদছিস?'

ও ঝটকা মেরে মাথাটা সরিয়ে নিল, কান্না আরো বেড়ে গেল।

এবার ভাইসাহেব সহানুভূতির স্বরে বলে উঠলেন, 'কিছু বলবি তো, নইলে আমরা কি করে বুঝব মুন্নী?'

কোন উত্তর নেই, ও কেঁদেই চলেছে। একটু পরে বহুকষ্টে নিজেকে সামলে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে উঠল, 'বাবুজী, তুমি আমাকে বিষ এনে দাও, গলা টিপে আমায় মেরে ফেল...কিন্তু ওখানে পাঠিও না, আমাকে পাঠিও না বাবুজী আমি মরে যাব...তোমার পায়ে পড়ি বাবুজী আমাকে যেতে বোল না,' বলতে বলতে ও বাবুজীর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমাদের সবারই চোখে জল এসে গেছে। মা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ফুঁপিয়ে উঠছে। 'আরে, একি, কি করছিস তুই,' বলতে বলতে বাবুজী ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছেন তখনও ও এমনভাবে কাঁদছে যেন কেউ ওকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছে। কান্না চাপতে মুন্নী বাবুজীর জামার কোণাটা দলা পাকিয়ে মুখের মধ্যে ঠুসে দিয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ওর পাঁজর ভেঙে বন্যার মত বেরিয়ে আসতে চাইছে কান্না, সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। ওর কালো চুলে ভরা মাথার ওপর নিজের মুখ নামিয়ে বাবুজীও কাঁদছেন নিঃশব্দে। বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝড়ে পড়ছে মুন্নীর চুলের ওপর। ওর পিঠের ওপর সান্ত্বনার হাত বোলাতে বোলাতে বাবুজী যেন নিজের মনের অস্থিরতাকে দমন করার চেষ্টা করছেন। আমাদেরও চোখ দিয়ে জল পড়ছে, মাঝে মাঝে লবনাক্ত অশ্রুর স্বাদ ঠোঁটের কোণ থেকে মুখের মধ্যেও চলে আসছে। কান্নার ঝোঁক সামলাতে সবাই নাক টানছে, জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। কুঁয়ার শেষ পর্যন্ত আর সামলাতে না পেরে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, 'মা মুন্নীদিদিকে যেতে দিওনা, ওকে পাঠিয়ে দিওনা।' এই দুঃখী মেয়েটার ওপর আমরা কত দুর্ব্যবহার করেছি, কত তাচ্ছিল্য দেখিয়েছি সেই সব ভেবে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি স্থির করে ফেললাম, মুন্নীকে আমার কাছেই রাখব, তার জন্য আমাকে যা কিছু করতে হয় সব করব। একটা মেয়েকে আমরা খেতে পরতে দিতে পারব না? মিনিট দশেক পরে কিছুটা শান্ত হয়ে মুন্নী বলে উঠল, 'বাবুজী, আমি কারো বাড়ি বাসন মেজে, মশলা বেটে যা হোক করে চালিয়ে নেব, কিন্তু ওর সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিওনা'।

বাবুজী এতক্ষণে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছেন। ওকে বুঝিয়ে বলবার ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, 'ওরে পাগলী আমরা কি তোর পর? তেমন কোন গোলমাল দেখলে তুই মাঝরাতেও সোজা এখানে চলে আসবি। এটা তো তোর নিজের বাড়ি, তারপর আমাদের। কিন্তু এইবারটা তুই রাজি হয়ে যা, আর কোন ঝামেলা হবেনা।'

'না না, বাবুজী না' কোন বিভিষিকা দেখার মত করে মুন্নী যেন আঁতকে উঠল, 'আমাকে ঐ কুয়োর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিওনা বাবুজী।'

ওর সেই আর্ত কণ্ঠস্বরে বাবুজী এবার যেন একটু বিব্রতভাবে বললেন, 'বেটি, তোর ভালর জন্যই তো বলছি। ঐতো তোর নিজের ঘর, যদি নিজে না সামলাস তাহলে

আবার যে ঘর ভাঙবে। এতেই তোর মঙ্গল হবে মা। না হলে এদিকে সারা সমাজে বদনাম হচ্ছে, লোকে নানারকম কথা বলছে, কতজনের মুখ চাপা দেব বল?'

'আমার সম্বন্ধে কোন খারাপ কথা যদি কোনদিন তোমার কানে আসে বাবুজী, তাহলে সেইদিনই তুমি আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলো' কাঁদতে কাঁদতেই বলল মুন্নী, অনেক চেষ্টা করেও ও কান্না থামাতে পারছে না।

বাবুজী আবার কেঁদে ফেললেন। মনে হল এবার তিনিও নিজেকে আর সামলাতে পারবেন না, ডুকরে কেঁদে উঠবেন। আবেগের আতিশয্যে ওঁর ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে। মুন্নীকে খাটের একপাশে সরিয়ে দিয়ে বাবুজী উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

তারপর প্রায় ঘন্টাখানেক আমরা সবাই সেইভাবেই বসে রইলাম নির্বাক হয়ে। অবশেষে শীতের এবং ঘুম পাওয়ার জন্য একে একে সবাই চলে গেলাম, কেবল মুন্নী একলা মায়ের খাটে পড়ে ফোঁপাতে লাগল।

পরদিন সকালে মুন্নীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। চিৎকার করে কাঁদছিল ও, কেঁদে লুটিয়ে পড়ছিল, কোন কথা বলেনি, শুধু পাগলের মত কান্না, দেখে মনে হচ্ছিল যেন হিস্টিরিয়ার ঘোরে রয়েছে। প্রভাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না, যেন জন্ম জন্মান্তরের মত বিদায় নিচ্ছে ও। দুজনে দুজনকে ছাড়তেই চায়না। ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে তাই জোর করে ছাড়াতে হল। বাবুজী সেই সময় কাজের অজুহাতে আড়ালে চলে গিয়েছিলেন।

মুন্নী আমার ঠিক পরের বোন, তাই বাড়ির মধ্যে আমিই ওকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। আমার গলা জড়িয়ে ও ডুকরে ডুকরে কাঁদল। কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল যেন আমার শরীরের শিরা উপশিরাগুলো এক বিরাট বিস্ফোরণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, হৃদপিণ্ডটা বুঝি ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসবে। কোনমতে ও শুধু এইটুকুই বলতে পারল, 'ভাইয়া, ভাবীর সঙ্গে কথা বলো, ওতো কোন দোষ করেনি...'।

চলে গেল মুন্নী, তখনো কাঁদছিল, আর কোন চেতনাই যেন নেই ওর। গাড়ীটা যতক্ষণ দেখা যায় আমি ওকে দেখছিলাম, তারপর নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, গাল বেয়ে পড়ছে, আমি যেন সমাধিস্থ হয়ে বসে আছি। মনের মধ্যে কি একটা গুঞ্জরণ চলেছে, ঠিক বুঝতে পারছিনা।
সারা বাড়ি বিষাদাচ্ছন্ন, কেউ কাঁদছে, কেউ বিষন্ন মুখে বসে আছে, মনে হচ্ছে যেন কাউকে দাহ করে ফিরেছি আমরা। বাড়ির দেওয়ালগুলো তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, শূন্যতা যেন গিলে খেতে আসছে।

দশ

খাওয়াদাওয়া সেরে দিবাকরের বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে এগারটা বেজে গেল। বাড়ি গিয়ে যা বকুনী খেতে হবে — একেবারে প্রাণজুড়োন কথা — 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে, সেটা অন্তত একটু বলে কয়ে গেলেও তো পারো।' ঐই রাতদুপুরে এখন দরজা খোলানোও এক মহা ঝামেলার ব্যাপার। দরজাটা যে খুলতে আসবে সেই তার নিজের কষ্ট এবং আমার দায়িত্বহীনতা সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করবে। প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন ক্রমশঃই দমে যাচ্ছে। বড় রাস্তা, গলি সব নির্জন নিস্তব্ধ। বাড়িগুলো উঁচু নিচু হওয়ার দরুণ জ্যোৎস্নার আলো পথের ওপর খাপচা খাপচা ভাবে পড়েছে, তার সঙ্গে কুয়াশা মিশে একটা কেমন যেন অদ্ভুত ধোঁয়াটে ভাব চারদিকে।

কেন জানিনা মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠেছে, একটা ব্যথা যেন ভিতর থেকে মোচড় দিচ্ছে। ব্যাপারটা হল এই যে সেদিন তো মুন্নীর জন্য সিনেমায যাওয়া হলনা, তাই দু তিন দিন পরে সেই প্রোগামটাই বাস্তবে পরিণত কবা গেল। সিনেমা শেষ হল রাত্তির দশটায়, এমন কিছু ভাল লাগেনি তবে নায়ক নায়িকাব কিছু কিছু প্রেমের দৃশ্য সত্যি মনে ছাপ ফেলেছে। আহা আমার জীবনেও যদি এমনটা ঘটত! এইটা মনে করেই বোধহয় কষ্ট হচ্ছে। বহুদিন পরে সিনেমা দেখলাম। হেঁটেই ফিরছিলাম আমরা, আমি আর দিবাকর পাশাপাশি, কিরণ একটু পিছনে সামান্য দূরত্ব বেখে হাঁটছিল। আবও অনেক অপরিচিত নরনারী ঐ সিনেমারই কোন না কোন চরিত্রেব সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে পথ চলছিল। কিরণ আমার সঙ্গে, বা আমার সামনে পারতপক্ষে কথাই বলেনা। সিনেমায় আসার সময় যে সঙ্কোচ অনুভব করছিলাম সেটাই এখন আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। আমার পরণের কাপড় চোপড় ওদের চেয়ে অনেক খেলো। কুঁচকোনো দুমড়োনো খাটো কামিজ আর প্যান্ট, পায়ে পুরানো আধছেঁড়া স্যাণ্ডেল। আরো আশ্চর্য এই যে নিজের মাথার গিঁটবাঁধা টিকিটা নিয়ে আমার এর আগে আর কখনও এমন লজ্জাবোধ হয়নি। ওটাকে আমি খুলে ফেলে বেশ কায়দা করে চুলেব সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে প্রায়ই দেখে নিচ্ছি টিকিটা আবার আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না তো! একবার এটাও মনে এসেছে যে, টিকিটা কেটে ফেললেই হয়। পরক্ষণেই অবশ্য নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি,— ছি ছি, কি যে সব চিন্তা মাথায় আসে আজকাল।

দিবাকর কাছে ঘেঁসে এসে বলল, 'কি হে, আজকাল দিন কাটছে কেমন? কি করছ সারাদিন?'

ভাইসাবের কথা মনে পড়ে গেল আমার। আজ সকালেই তো বৈঠকখানায় বসে উনি বলেছেন, 'কি করবে ঠিক করেছ কিছু? পরীক্ষা তো শেষ হয়ে গেল।'

'আমি আর কি ঠিক করব, যা আপনারা বলেন, '— আমি তো বুঝেই গেছি ওঁর ইচ্ছে যে আমি একটা চাকরি শুরু করি।

'এবার এখানে ওখানে একটু চেষ্টা চরিত্র কর। তোমার ঐ বন্ধুটিকেও বলে দেখ।'

'রেজাল্টটা তো বের হোক আগে, এখন কোথাও এ্যাপ্লাই করলে কি লিখব?'

'রেজাল্ট বের হতে তো এখন দু আড়াই মাস দেরী। ততদিন কিছু তো করবে, না এমনিই সময় নষ্ট করবে?' বেশ চিন্তিতভাবে বলেন ভাইসাব, 'সংসারের অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখছ। আমার ঐ নব্বই-একশ টাকাতে কিছুই হয়না, একটা কিছু তো করতেই হবে। অমর, কুঁয়ারকে যদি আমরা দুজনে ভাল করে পড়াতে পারি, তাহলে ওরা ভাল চাকরি পাবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়, আমি তো চেষ্টা দেখবই,' আমি পাশ কাটাতে চেষ্টা করছিলাম।

'তোমার ঐ বন্ধুটিকে বল, সে কোথাও না কোথাও একটা হিল্লে করে দেবে, তার তো অনেক জানা শোনা আছে।' দিবাকরের সম্বন্ধে উনি আবার ইঙ্গিত করলেন।

'জিজ্ঞাসা করব', আসলে অন্দরমহল থেকে বাবুজীর উঁচু গলার চিৎকার শোনা যাওয়ায় আমার মনোযোগ সেইদিকেই চলে যাচ্ছিল তখন। কথাটা ঘোরাবার জন্য বললাম, 'বাবুজী চটে গেলেন কেন আবার?' যদিও সে ব্যাপারে আমার কোন উৎসুক্য নেই। কারো না কারো ওপর চটেছেন হয়ত। যার যা কাজ, সে তাই করছে, এতে আর ভাববার কি আছে? তবে উপস্থিত এই প্রসঙ্গটা এড়াবার দরকার ছিল তো।

'চলো দেখি গিয়ে কার ওপর আবার রেগে চেঁচামেচি শুরু করেছেন', ভাইসাব ও আমি ভিতরে গেলাম, উনি আবার মনে করিয়ে দিলেন 'ওকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবে। অন্ততঃ কথাটা পেড়ে তো রাখ'।

এখন দিবাকরের প্রশ্নে ভাইসাবের কথাটা মনে পড়ে গেল, বললাম, 'কিছু না, তুমিই বল তো কি করা যায়?'

'আরে বাবা, কি আবার করবে? টিকি নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়াও মৌজ করো। আরাম করাটা খুব ভাল কাজ বুঝলে? মাথা মুখ ঢেকে, টেনে ঘুম দাও,' হাল্কাসুরে কথাটা বলেই ওর সহসা কিছু মনে পড়ে গেল, বলে উঠল, 'কিন্তু বিশ্রাম করার কথাটা তোমার মগজে ঢুকলে তবে তো! তুমি তো আরামের পরম শত্রু, হয়ত এখন থেকেই থার্ডইয়ারের বইগুলো ঘাঁটতে শুরু করেছ নয়ত ভারতীয় দর্শন পড়তে আরম্ভ করেছ।'

উদাসভাবে জবাব দিলাম, 'না দিবাকর, আমার হয়ত পড়া আর হবেনা'।

'পড়া হবেনা? তার মানে?' হেসে উঠল ও, 'কিরণ শুনছ, আমাদের সমর সিনেমার ডায়ালগ বলছে'।

কিরণ মুখটিপে হাসল, এতক্ষণ ও একেবারে নির্লিপ্তভাবে হাঁটছিল।

'হ্যাঁ, অন্যমনস্ক ভাবে বললাম, যাক গে, এখন তো অনেক সময় আছে। তা তুমি আজকাল কি করছ শুনি?'

'আমি? আরে আমার কি আর কিছু করবার জো আছে? এখন কেবল কিরণ আর আমি। মাঝে তো বেজায় চটে গিয়েছিল কিনা, — সারাক্ষণ কেবল পড়া আর পড়া, আর যেন কেউ কোথাও নেই! সুতরাং এখন আমি নিজেকে পুরোপুরি ওর হাতে ছেড়ে দিয়েছি'। কথাটা বলে ও বেশ জোরেই হেসে উঠল, কিন্তু রসিকতাটা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, নিজেদের অন্তরঙ্গ বিষয় এমনভাবে বলে ফেলায় কিরণের ভুরু কুঁচকে উঠেছে'দেখে তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠল, 'এখন তো ওকে আবার মাকে সামলাতে হবে গিয়ে, তাই না কিরণ? মা নিশ্চয় বেশ রেগে রয়েছে, তখন তো বেশ চটেই বলে দিল 'যাও, সিনেমা দেখো গে'। এখন চোখে অনেক রান্নার ধোঁয়া ঢুকেছে, কাজেই এত বকাবকি করবে যে প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবে!'

'হুঁ'। তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠল কিরণ, 'আর কত দমবন্ধ হয়ে মরব। ছ'মাস পরে তো একবার সিনেমা দেখতে বেরিয়েছি, তাতেও যদি গালাগাল খেতে হয় তো কি করা যাবে?'

'কথাটা ওঁর সামনে একবার বলে দেখো,' ঠাট্টার সুরে বলে উঠল দিবাকর।

আমার ভারি খারাপ লাগল। দিবাকরটা কি রকম ছেলে যে নিজের মায়ের সম্বন্ধে বউয়ের মুখ থেকে এই ধরণের কথা শুনছে! আর কিরণ...মাতৃসমা শাশুড়ীকে এমনভাবে অবজ্ঞা করছে? আবার আমার সামনে? প্রভা এমনভাবে কথা বললে আমি তো সব প্রতিজ্ঞা ভুলে টেনে এক চড় লাগাতাম। কথাটা মনে হতেই সেদিনের সেই চড়মারার দৃশ্য আবার ঝলসে উঠল। কিরণের এই অসভ্যতা আমার মোটেই ভাল লাগল না।

'বুঝলে ভাই সমর'। দিবাকর হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি তোমার ওয়াইফকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসনি কেন? ঠিক আছে কিরণ, একদিন ওদের নিমন্ত্রণ করে ফেল, তাহলে ও ভাবীজিকে নিয়ে আসবে।'

মহাসঙ্কটে পড়ে গেলাম আমি। দিবাকরের কথার কি উত্তর দিই দেখার জন্য কিরণ উৎসুকভাবে চেয়ে আছে। কোনরকমে তোৎলাতে তোৎলাতে বললাম, 'ও ও তো বাপের বাড়ি, এবার এলে নিশ্চয় আনব।'

কথাটা এখানেই চাপা পড়ে গেল। কিন্তু বরফের স্তরের নিচে হৃদয়ের কিছুটা অংশে বোধহয় আমার অজ্ঞাতেই একটু উত্তাপ তখনও ছিল, সেখান থেকে যেন একটা শীতল দীর্ঘশ্বাস উঠে এল — আমিও যদি এমনি করে স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যেতে পারতাম! সিনেমায় ওরা দুজনে কেমন পাশাপাশি বসে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল — সঙ্গে সঙ্গে সিনেমায় দেখা কিছু কিছু দৃশ্যও যেন মনের মধ্যে ঢেউ তুলে নেচে গেল। কিন্তু 'স্ত্রী' বলতে যা বোঝায় প্রভা তার মধ্যে আসে কি? আমার মনে জেগে ওঠা এই আকাঙক্ষার সঙ্গে প্রভার কোন সম্পর্ক আছে এটা মেনে নিতে পারছি না আমি। প্রভাকে তো মন থেকে একেবারে দূর করে দিয়েছি। আমার যে 'স্ত্রী' হবে সে যেন আছে অন্য কোথাও, প্রভা কিছুতেই সে নয়।

দিবাকর জিদ করায় ওখানেই খেয়ে আসতে হল। ফিরে এলাম যখন তখন আবার সেই পাঁচঘন্টা আগেকার সময় — যে বিতৃষ্ণা আর কষ্ট ভুলতে দূরে পালিয়েছিলাম তা আবার যেন ফিরে এলো আরো তাজা হয়ে। এতক্ষণ ছিলাম যেন কোন স্বপ্নলোকে, এখন নেমে এলাম ধরাতলে। এতক্ষনে আরো কি ঘটেছে কে জানে।

ভাইসাহেব আর আমি ভিতরে ঢুকেই দেখি প্রভা অপরাধীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আর বাবুজী দুর্বাসামুনির মত হাত উঁচিয়ে গর্জন করছেন। মা মাঝে মাঝে তাতে যোগ দিচ্ছে আর ভাবী হাতির শুঁড়ের মত ঘোমটা টেনে দরজার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'ডাল বাছবার আর জায়গা জুটলনা?' আমাদের দেখতে পেয়ে বাবুজী ঘটনাটা আবার নতুন করে ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলেন, 'ছাদের ওপর বসেই ডাল বাছতে হবে? ঐ সেদিন যেমন বালতি নিয়ে ছাদে উঠে মাথা ঘসা হল! মুন্নী এমন ওকালতি করল যে সেদিন তো আমাকে চুপ করে যেতে হল। কিন্তু এবার কি খাওয়াদাওয়া ঘুম সবই ছাদের ওপর চলবে নাকি? সবসময় চোখ নামিয়ে বোবার মত ঘুরছে, যত অলুক্ষুণে কাণ্ড; লাটসাহেবের বেটির ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই? ছাদের ওপরে তোর কিসের এত কাজ শুনি? আজ স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি, এসব আমি পছন্দ করিনা। এই শুনে রাখ, শীতের দিন, রাজ্যের লোক এখন রোদ পোহাবার ছুতোয় ছাদে উঠে এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মারে, বউকে নিচে আটকে রাখবে।'

'সবাইকার চোখ এড়িয়ে একা একা ছাদে না উঠলে পাড়াপড়শির সঙ্গে চোখের ইশারায় কথা চলবে কি করে?' আমাদের দেখে মায়েরও খোঁচামারার উৎসাহটা হঠাৎ বেড়ে গেল, তা নাহলে কেবলই অত ছুটে ছুটে ছাদে যাবার তাড়া কেন শুনি?'

প্রভা একেবারে নিঃশব্দে মাথা নিচু করে এতক্ষণ সবকিছু শুনে যাচ্ছিল কিন্তু এই কথাটায় একেবারে চমকে উঠে মাথা তুলল, তীব্রদৃষ্টিতে একবার তাকাল মায়েব দিকে তারপর আবার আস্তে আস্তে মাথা নামিয়ে নিল, বুঝি দু ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল চোখ থেকে।

'ঠিক কথা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ পাণ্ডেজীর মেয়ের মত আবার কারো সঙ্গে পালিয়ে না যায়,' খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে চিন্তিতভাবে মাথা নত করে বাবুজী বৈঠকখানায় চলে যেতে যেতে বললেন।

চমকে উঠে মা প্রশ্ন করে, 'কোন পাণ্ডেজী? আমাদের এই পাড়ার? ওর কোন মেয়েটা পালাল? বড়টা নাকি? যেমন হাতির মত মেয়ে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছিল, এমনটা তো হবেই। তারপর দু হাতে মাথা চাপড়ে আবার বলে ওঠে, 'হায় রাম, কি দিনকালই এল, ধর্মকর্ম তো মাথায় উঠেছে, বাবুজী চলে যেতেই মা প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁরে ধীরজ, কার সঙ্গে পালিয়েছে?'

'কার সঙ্গে আবার, নিশ্চয় ঐ যে মাস্টারটা পড়াতে আসত তারই সঙ্গে,' ভাইসাব বলে ওঠেন, 'খোঁজ এখন'।

'হায় হায়, এত পাপ শুরু হয়েছে! কেউ জানল না শুনল না অথচ দেখতে দেখতে এত কাণ্ড করে বসছে সব, সংসারটা কোথায় যেতে বসেছে প্রভু!' মুখের ভাব অতি করুণ করে কথাগুলো উচ্চারণ করে মা।

ভাইসাবও বাইরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন। ঘোমটা তুলে ভাবী এতক্ষণে বাইরে বেরিয়ে মায়ের কাছে এসে বলে, 'এইসব লেখাপড়া জানা মেয়েরা পারেনা এমন কাজ নেই, মাজী।'

হঠাৎ আসল বিষয়টা মনে পড়ে যায় মায়ের, বলে ওঠে 'আরে অন্যদের ব্যাপার চুলোয় যাক, কিন্তু আমাদের ইনি এমন ছুটে ছুটে ওপরে যান কেন? ওখানে কে বসে আছে ওর জন্য?' এবার আমার দিকে ফিরে দেখে বলে, 'খবরদার, ওদিকে পা বাড়ালে আমি কিন্তু রক্ষে রাখবনা বলে দিচ্ছি।'

ভাবী ওর বাচ্চাটাকে মায়ের কোলে তুলে দিতে দিতে বলে, 'এই নাও, তুমি আবার ঐ নিয়ে মাথা গরম করছ কেন মাজী?'

আমিও ওখান থেকে চলে এলাম; পিছন থেকে মায়ের কথা কানে এল, 'মাথা গরম না করে করি কি? এই সব আচরণ দেখেই তো বর ফিরে তাকায় না ওর দিকে। এদিকে বউ এর ভরা যৌবন, ওদিকে ছেলে আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে দিন দিন, কি যে অসুখ বুঝতেও পারিনে। কি যে এক গলার কাঁটা হয়েছে আমার, মরেও না যে পাপ বিদেয় হয়। এ যেন গরম দুধ, গেলাও যায় না ফেলাও যায়না। ছেলের জীবনটা নষ্ট হতে বসেছে। মরে যদি তো কালই আমি ছেলের আবার বিয়ে দিতে পারি...' বলতে বলতে মায়ের গলার স্বর ভিজে ওঠে। বাইরের উঠোনে এসে সিড়ি বেয়ে নিজের ঘরের দিকে চললাম। এ বাড়িতে রোজ কিছু না কিছু নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। কতদিকে আর খেয়াল রাখা যায়? কিন্তু যাবার সময় মুন্নী যে কথাগুলো বলেছিল তা আবার মনে পড়ল, মনের মধ্যে প্রায়ই কথাগুলো গুঞ্জন তোলে কিন্তু অর্থটা ঠিক ধরতে পারিনা। অথচ ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা বোধ করি।

এরপর আমি সিনেমা চলে গিয়েছিলাম। ভয়ে ভয়ে একবার দরজায় কড়া নাড়বার পর সেই অস্থিরতাবোধ আবার অনুভব করলাম। এর থেকে মুক্তি পেতেই তো চলে গিয়েছিলাম দিবাকরের ওখানে। এতক্ষণ সব ভুলেছিলাম। এখন আবার সমগ্র দৃশ্যটা চোখের ওপর ফুটে উঠল। দরজা খুলতে এল অমর, বাঁচা গেল, না হলে সবরকম বকুনি শোনবার জন্য আমিতো তৈরীই ছিলাম। অমর বলল, 'ভাইয়া, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? বাড়িশুদ্ধ সবাই চটে আছে। সবাই চিন্তা করছিল তুমি না জানি কোথায় চলে গেছ!' আমি চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তো?' উত্তরে ও বলল, 'হ্যাঁ' আমিও চুপচাপ সিঁড়ি বেয়ে চলে এলাম নিজের ঘরে। ভয় হচ্ছিল যে আমার খাবারটা হয়ত ঘরে ঢাকা দেওয়া আছে, কিন্তু দেখলাম খাবার রাখা নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে কাপড় বদলাতে শুরু করলাম।

মার্চের শেষ, শীত একেবারে কমে গেছে। আমরা দরজা খুলে ঘরেই শুই। রাত প্রায় সাড়ে এগারটা বা পৌনে বারোটা হবে। বাইরে একাদশীর ভরপুর জ্যোৎস্না... কুয়াশায় মিশে গিয়ে কিছুটা ধোঁয়াটে এবং আরো গাঢ় দেখাচ্ছে। বেশ তেষ্টা পেয়েছে, এদিক ওদিক চেয়ে দেখি ঘরে জল নেই। আজ ব্যাপার কি — ঘরে না জল, না খাবার। প্রভার তো নিজের কাজে কখনও ভুল হয় না। হয়ত ভুলেই গেছে। একবার মনে হল চেপে যাই, কিন্তু তৃষ্ণার দাবী শেষ পর্যন্ত মানতেই হল। ছাদের অন্যদিকে দেওয়ালের গায়ে লাগানো পাথরের ওপর জল রাখা থাকে, অতদূর যেতে আলস্য লাগছিল।

উঠে বাইরে এলাম, খুব হিম পড়ছে। জলের কাছে যেতে যেতে হঠাৎ দারুণ চমকে উঠলাম, সামনে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কে যেন বসে আছে — সাদা সাদা। প্রাণটা যেন ধক করে উঠল, হে ঈশ্বর, কে ওটা? ভূত প্রেত থেকে শুরু করে চোর ডাকাত পর্যন্ত সবরকম সম্ভাবনাই খেলে গেল মাথার মধ্যে। সাহস করে আরও একটু ভালভাবে ঠাওর করে দেখতে দু পা এগিয়ে গেলাম। প্রভা বসে আছে। ওকে চিনতে পেরে নিশ্চিন্ত হলাম, আবার তেমনি আশ্চর্যও হলাম। রাত বারোটার সময় এই হিমের মধ্যে একলা বসে কি করছে? প্রভাই যে ওখানে বসে আছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার পর আমি বেশ ধীর পদক্ষেপে জলের দিকে এগিয়ে গেলাম। অবশ্য সমস্তক্ষণ মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই ঠোকর মারতে লাগল যে এইসময় ও এখানে কেন বসে আছে? একবার মনে হল ঐভাবে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েনি তো? কিন্তু পাশ দিয়ে যাবার সময় ফোঁপানি শুনে বুঝলাম ও কাঁদছে।

জল খেয়ে, ওকে লক্ষ্য করতে করতে চুপচাপ চলে তো এলাম কিন্তু বিছানায় শুয়ে কেবলই এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। কে যেন কেবলই প্রশ্ন করছে, এই রাত বারোটায় ও একলা বসে কাঁদছে কেন? কাঁদবার কি আর জায়গা ছিলনা? বিছানায় শুয়ে শুয়ে তো কাঁদতে পারত। বাইরে বসে, এই মাঝরাতে? সত্যি, এটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার, এত বড় বড় অশান্তি হয়েছে কিন্তু কেউ কখনও বলেনি যে ও কেঁদেছে, আর আমিও কখনো কাঁদতে দেখিনি ওকে। সমসময় চুপ অথচ জেদী মনে হয়েছে। কিন্তু আজ হঠাৎ কি হল?

আমার এইসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারটা কি? কিন্তু এই চিন্তাটা মনে আসতেই আমার অন্তর থেকে কে যেন ধিক্কার দিয়ে উঠল — ছিঃ নীচতারও একটা সীমা আছে! তারপর কতরকম যে উল্টোপাল্টা চিন্তা মনে আসতে লাগল। সিনেমায় বারুদ দিয়ে পাহাড় চুরমার করে দেবার একটা দৃশ্য ছিল, সেই দৃশ্যটা হঠাৎ যেন মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনে হল হঠাৎ যেন একটা বোমা ফেটেছে আর আশেপাশে সবকিছু চুরমার হয়ে গেছে। আহত, ভীত, সন্ত্রস্ত নরনারী চিৎকার করছে, তুমুল কোলাহল করতে করতে সাবই ছুটোছুটি করছে, এত শোরগোল যে কেউ কারো একটা কথাও শুনতে পাচ্ছেনা। শোনা যাচ্ছে কেবল কোলাহল, এক সমবেত, অন্ধ কোলাহল যা ঐ

বোমাফাটার আওয়াজের মতই মাথার মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরছে। অনেকক্ষণ পরে সেই কোলাহলের মধ্যে থেকে যেন দু একটা স্বর মনে হলো বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কোথায় যেন একটা কড়িকাঠের নিচে চাপাপড়া মুন্নী চিৎকার করে বলছে, 'ভাইয়া, ভাবীর সঙ্গে কথা বল'। আমার নিজের কণ্ঠস্বরও শুনলাম, কোথা থেকে চাপা গলায় বলছে 'না, এখন তো বাপের বাড়িতে, এলে নিশ্চয় নিয়ে আসব।' আর সব কোলাহল ছাপিয়ে গুরুগম্ভীর ঘন্টাধ্বনির মত একটা শব্দ ক্রমাগত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বলে চলেছে, 'বাইরে হিমে রাত বারোটায় কেউ একা বসে কাঁদছে'। প্রত্যেকবার মনে হচ্ছে ঐ শব্দটা বিস্ফোরণের পর ওঠা ধূলোর পুঞ্জের মত আকাশে উঠে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের রূপ নিচ্ছে। কিন্তু এই বিস্ফোরণটা যেন মস্তিষ্কের চেতনাবাহী স্নায়ুগুলোর ওপর একটা বিরাট আঘাত, যাতে আমার সমস্ত স্নায়ু শিরাগুলো একেবারে ঝনঝনিয়ে উঠছে। এইসব ভুলে দু একবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু মনে হল আমার বুকের ওপর কারো হাতের ছড়ানো পাঞ্জাখানা যেন একটা ভারী মাকড়শার মত চেপে বসেছে, ওটাকে সরাতে না পারলে, ছুঁড়ে ফেলে দিতে না পারলে ঘুমোতে পারব না, কিছুতেই ঘুমোতে পারব না। দ্বন্দ্ব আর উদ্বেগের এই উত্তাল তরঙ্গে কতক্ষণ ধরে দুলেছিলাম জানিনা, কখনও ঈষৎ তন্দ্রায়, কখনও পুরোপুরি সচেতন জাগরণে।

শেষপর্যন্ত আর থাকতে না পেরে উঠে পড়লাম। যেই উঠেছি, আমার আত্মসম্মানের ভূতটাও তৎক্ষণাৎ এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। একবার দ্বিধা এল, কিন্তু মন্ত্রবদ্ধের মত জোর করে দ্বিধাকে পথ থেকে সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সোজা ওর কাছে যেতে যেন সাহস হচ্ছে না, ইতস্তত করছি, আবার সোজা জলের জায়গাটার দিকে গেলাম। জ্যোৎস্না এখনও তেমনি উজ্জ্বল, হিম এখনও ঝরছে। আর প্রভা এখনও তেমনি বসে কাঁদছে। আমার স্পন্দিত হৃদয় যেন মোচড় দিয়ে উঠল। প্রায় ঘন্টাখানেক পার হয়ে গেছে, এখনও বসে কাঁদছে। তেষ্টা পায়নি, তবু একটু জল খেয়ে আবার ধীরে ধীরে ফিরছি, প্রভার সামনে এসে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়ালাম, আশা করেছিলাম ও আমাকে দেখে চমকে উঠবে অথবা নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সামনে যে কেউ দাঁড়িয়ে আছে সে সম্বন্ধে যেন ওর চেতনাই নেই, এমনভাবে ও বসে আছে আর কেঁদেই চলেছে নিঃশব্দে, সামান্য নড়াচড়াও নেই। এবার যে কি করা যায় আমার মাথায় আসছে না। একটু কেশে নিজের উপস্থিতি জানান দেব কি? কিছুই যখন ভেবে পেলাম না, ধীরে ধীরে ফিরে এলাম। কিন্তু পা যেন চলতে চাইছে না, যেন চোরাবালিতে আটকে গেছি, বহুকষ্টে একটি করে পা টেনে তুলতে হচ্ছে। পেছন থেকে টানছে যেন কেউ। অবশেষে আবার ফিরলাম এবং এসে দাঁড়ালাম একেবারে ওর সামনে। ও এমনভাবে বসে আছে যেন কেউ ওকে পাথর করে দিয়েছে। একটুক্ষণ চেয়ে রইলাম তারপর বহুকষ্টে আমার আড়ষ্ট ভাঙ্গাগলা থেকে উচ্চারিত হল, 'মাঝরাতে এখানে বসে কি করছ?'

ও এবার মাথা তুলে চেয়ে দেখল আমার দিকে, যেন এই প্রথম দেখছে আমাকে, তারপর হঠাৎ আঁচলে একেবারে ঢেকে ফেলল নিজের মুখখানা। চাঁদের আলোয় ওর জলভরা চোখ বিদ্যুতের মত চমকে উঠেই আবার লুকিয়ে পড়ল, কান্নার বেগ বেড়ে গেল দ্বিগুণ। আমি দাঁড়িয়েই আছি, কিন্তু এখানে আমার উপস্থিতি যেন ব্যর্থ, অনাবশ্যক এমনকি অপমানজনক মনে হচ্ছে। এবার একটু কড়া আদেশের সুরে বলে উঠি, 'সকালে উঠে কেঁদে নিও, এই হিমে শরীর খারাপ হবে, অনেক রাতে হয়েছে।' কথাগুলো কোনরকমে তো বলে ফেললাম, কিন্তু তখনি আমার মনে হল আমরা মনে যা ভাবি তা মুখে বলতে গিয়ে কত অন্যরকম হয়ে যায়। ঐটুকু কথা বলতে গিয়েই আমার গলা ধরে এল। ভিতরে ভিতরে কি যেন গলতে শুরু করেছে, বুকের মধ্যে একটা কিসের পিণ্ড আটকে আছে যেন, আমি ঢোঁক গিললাম।

'আপনার তাতে কি? আপনি শুতে যান না!' আঁচল সরিয়ে মাথা তুলে ও বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল, 'এই এক বছরে আমি বেঁচে আছি না মরেছি তা নিয়ে তো কখনো চিন্তা করেননি? আজ হঠাৎ কি এমন দরকার পড়ল, যান, ঘুমোতে যান,' সোজা আমার চোখের দিকে চেয়ে আছে, দুচোখে উপছে পড়ছে জল।

ওর সেই দৃষ্টি যেন আমার দেহের প্রতিটি অণুকে বিদীর্ণ করে গেল, সেই তীব্র অগস্ত্যদৃষ্টি যেন এক গণ্ডুষে আমার সমস্ত শক্তির সাগর পান করে নিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের সমস্ত শক্তি কে যেন মন্ত্র পড়ে টেনে বের করে নিয়েছে। শক্তিহীন আমি যেন ভেঙে গেলাম, কতকালের রোগীর মত ওর সামনে ধপাস করে বসে পড়লাম মেঝের ওপর। ভয়ে ভয়ে অতি দুর্বল কম্পিত হাত প্রভার কাঁধের ওপর রেখে ভাঙাগলায় বলে উঠলাম, 'প্রভা, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো?'...আমার নিজেরই আশ্চর্য লাগছিল, এ কে আমার ভিতর থেকে কথা বলছে?

আমি আর কিছু বলার আগেই ও দুহাত বাড়িয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরল আমার দুই কাঁধ, যেন একটা উন্মত্ত আবেগের তাড়নায় কেঁপে উঠল, ' কি করেছি আমি বলে দাও? কি দোষ করেছি আমি তোমার কাছে? তোমার যোগ্য নই, আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি তো নিজে হাতে আমার গলাটিপে মেরে ফেলো, আমি টুঁ শব্দটি করবনা। তুমি নিশ্চিন্তে আবার বিয়ে কোর, কিন্তু আমাকে...আমাকে বল, বল অন্তত...' দুনির্বার কান্নার বেগে ওর শরীরের প্রতিটি কণা যেন গলে গলে ঝরে পড়ছে। আত্মবিস্মৃতের মত আমার কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়ল, এলিয়ে পড়ল আমার গায়ে। কান্না যেন ওর মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না, চাবুকের আঘাতে সারা শরীর যেমন দুমড়ে মুচড়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে তেমনি করেই ফোঁপানির আবেগে ও থরথরিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে পাতার মত, হেঁচকি তোলার মত শব্দ আর সেই সঙ্গে আপাদমস্তক কাঁপছে। আমার চেতনা নেই কখন থেকে আমিও কাঁদছি, ওর চেয়েও বেশী প্রবলভাবে আগ্নেয়গিরির রুদ্ধমুখ এতদিনে বিদীর্ণ হয়েছে, বন্দী লাভার স্রোত ঝলকে ঝলকে

বেরিয়ে আসছে আজ। সেই নিস্পন্দ অনুভূতিহীন পাথরের তলা থেকে প্রেসিয়ার বাইরে এসেছে, বরফের মত জমে যাওয়া হৃদয় থেকে যেন এক একটা চাঙড় খসে পড়ছে আর বিগলিত হয়ে অশ্রুর ফোয়ারা রূপে বাইরে বেরিয়ে আসছে। গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ আমরা দুজনে কেঁদেই চলেছি — বেহুশ, চেতনাহীন।

নিরীহ নির্দোষ কর্ত স্নেহে আদরে পালিতা মা বাপের একমাত্র মেয়েটিকে এ বাড়িতে এনে আমি কোন অত্যাচারটা করিনি? ওর ঘাড়ে কত রকমের কষ্ট যে চাপিয়ে দিয়েছি, কোন যন্ত্রনাটা দিতে বাকি রেখেছি আমি? এখানে ওর কেউ নেই যার কাছে কেঁদে ও একটু দুঃখের ভার নামাতে পারে। এই সব কথা যত মনে পড়ছে ততই যেন হাজারটা বর্শা এসে বিঁধছে আমার বুকে, কান্নার বেগও দ্বিগুণ চৌগুণ বেড়ে যাচ্ছে বন্যার মত। নিজের মনে গুমরে গুমরে মরা ছাড়া আর তো কোন পথ ছিল না ওর। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল আমার অনুতাপ, অস্থিরতা আর মর্মান্তিক বেদনাকে বাইরে প্রকাশ করতে পারে এমন শক্তি যেন ঐ কান্না আর ফোঁপানির মধ্যেও নেই। মনে হচ্ছিল পাগলের মত দুহাত আকাশে তুলে গলাচিরে আর্তনাদ করতে করতে শহরের পথে ছুটে বেড়াই — যতক্ষণ অচেতন হয়ে পড়ে না যাই ততক্ষণ কেবল ছুটে বেড়াই। তাহলে হয়ত এ ভার কিছুটা হালকা হবে।

এক মুহূর্তের জন্যও কি কখনও ভেবে দেখেছি যে ওরও প্রাণ আছে? ওরও সুখ দুঃখ বোধ আছে? ওবও কিছু সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে? কখনও না, কোনদিন না। কার ভরসায় কিসের জোরে ও এখানে দিবারাত্রি এমন দাসীর মত খেটে চলেছে তা কি একবারও আমার মনে পড়েছে? ও আমাদের ক্রীতদাসী তো নয়। সেদিন যে হাত দিয়ে ওর গালে চড় মেবেছিলাম আজ সেই হাতেরই কম্পিত আঙ্গুলগুলো দিয়ে সান্ত্বনার হাত বুলোতে বুলোতে মনে হচ্ছিল সেই পাঁচ আঙুলের দাগ যেন এখনও কমেনি। সত্যিই পাগলেব মত আমি ওর মুখখানা চাঁদের আলোর দিকে ফিরিয়ে কানের পাশে গালের ওপর সেই দাগগুলো খুঁজছিলাম। এখনও কি তার চিহ্ন রয়ে গেছে? ছাদের আলসে থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। যা করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত কি কোনমতেই সম্ভব নয়? এমন কিছু কি নেই যা দিয়ে অতীতটা সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায়? কিন্তু, ও দুই হাতে আমার গলা জড়িয়ে রয়েছে, আমার বাহুদুটিও ওকে বেঁধে রেখেছে আলিঙ্গনে।

কতক্ষণ ধরে দুজনে বসে এইরকম ভাবে কেঁদেছি জানিনা। কথা বলবার অবসরও হচ্ছিল না। একটু থামলেই আবার নতুন আবেগে কান্না আসছে। আমার মনে হল, বহুক্ষণ ওর যেন কোন চেতনাই ছিলনা। ওর অর্দ্ধচেতন দেহখানা দু'হাতে তুলে যখন ঘরে নিয়ে এলাম মনে হচ্ছিল বুঝি কোন আগুন লাগা বাড়ির দেওয়াল আর কড়িকাঠের স্তূপ থেকে ওকে বের করে আনছি, আমারও সারা শরীর যেন ঝলসে গেছে, পরণের কাপড়ও পুড়েছে।

আকাশে মেঘের আড়ালে জ্যোৎস্না চাপা পড়ে গেছে। সারাটা রাত একমুহূর্তের

জন্যও আমরা ঘুমোইনি, পরস্পরকে একটি কথাও বলতে পারিনি, ভালকরে যেন দেখতেও পারছিলাম না। একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরের দিকে চাইছি আবার পরক্ষণেই দ্বিগুণ আবেগে দুজনে দুজনকে আঁকড়ে ধরছি, পুরো একবছরের রুদ্ধ গ্লানি আর বেদনা যেন মুক্তির পথ পেয়েছে।

কোথায় যেন কাক ডেকে উঠল...ভোরবেলা কারো ঘুম ভাঙবার আগেই ও উঠে বাইরে চলে গেল। যাবার সময় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুধু একটি কথাই বলে গেল, 'একটা পোষ্টকার্ড চাই, অনেকদিন থেকে মাকে চিঠি লিখতে চাইছি — পয়সা ছিলনা।' আঁচলে চোখ মুছে ও বেরিয়ে গেল। সেই সময় আবার আমার ইচ্ছে হল দেওয়ালে মাথা ঠুকি।

দিনের আলোয় আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইব কি করে?

বাইরে সূর্যকিরণের ঝিলিমিলি বুননের টানাপোড়নের মত ছড়িয়ে পড়েছে তখন।

উত্তরার্দ্ধ

প্রভাত

প্রশ্ন-পীড়িত দশ দিক

এক

সারাটা আকাশ ধূসর, কেবল পূর্বদিগন্তের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত একটা বেগুনী আলোর ছটা একটু একটু করে সোনার রং ধরছে, কুয়াশার ভারী পর্দাগুলো এপাশে ওপাশে সরিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে থেকে উঁকি মারছে এক জ্যোর্তিময় মুখ, বাতাসে একটা শিরশিরে ঠাণ্ডার আমেজ — আশে পাশের গাছ গাছালির পাতায় জেগেছে কাঁপন, একটু একটু করে ঘুম ভাঙছে শহরের — বাড়ির ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে, একটি পা আলসের ওপর রেখে এই মুহূর্তটিকে চেয়ে চেয়ে দেখা আর অন্তরের স্তরে স্তরে একে উপভোগ করা — এ কি সুন্দর — জীবনে এই প্রথম জানলাম! এই প্রথম দেখলাম কেমন করে হয় সূর্যোদয়। কখনও মনে হচ্ছে লাট্টুর মত ঘুরপাক খেতে খেতে বেশ দ্রুত উঠে আসছে, আবার কখনও মনে হচ্ছে যেন ঢেউ-য়ের ওপর একটা বলের মত আস্তে আস্তে ভেসে উঠেছে। এক একটি ব্যাপার দেখছি আর মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠছে, 'আরে, সূর্যোদয়ের ঠিক আগে এমন আলোর ফোয়ারার মত সূর্যরশ্মি ছড়িয়ে পড়ে আর সামনের তিনতলা বাড়িটার এরিয়েলের বাঁশটা সর্বপ্রথম সেই কিরণের স্পর্শ পায় এটা তো জানা ছিলনা।' প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে নতুন কিছু জানছি, ইচ্ছে করছে পাশে কেউ এসে দাঁড়াক, তাকে এই সব নতুন জিনিসের কথা বলি, তাকে দেখাই এই সুন্দর সূর্যোদয়।

জীবনে যেন এই প্রথম সূর্যোদয় দেখলাম। কোন আঁধার কুঠরিতে বন্দী ছিলাম এতদিন, আমার চারপাশে কি যে ঘটে যাচ্ছে সেদিকে নজরই ছিলনা। আজ আলোয় এসেছি, কিন্তু এতদিন অন্ধকারে বন্দী থাকার লজ্জায় যেন চোখ মেলে চেয়ে দেখতে পারছি না। সত্যি...দিনের আলোয় প্রভার সঙ্গে কথা বলব কি করে? ওর মুখের দিকে সোজাসুজি চাইব কেমন করে? সেই অভিযোগ ভরা দৃষ্টির মুখোমুখি হওয়া — অন্যদের সঙ্গে কথা বলতেও আমার সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। বাড়ির সবাই, বাবুজী ওঁরা নিশ্চয় এবার খুশি হবেন। ভাবী এখন আর ইশারায় ডাক্তার দেখাবার কথা বলবে না...উঃ ঐ কথাটার ইঙ্গিতমাত্র আমার সারাদেহে যেন আগুন ধরে যেত, এখন কথাটা মনে পড়তে আপন মনেই হেসে ফেললাম।

প্রভা কিছুক্ষণ আগে উঠে চলে গেছে। আমি ওর দিকে তাকাতে পারিনি, সেও আমার দিকে সোজাসুজি চাইতে পারেনি। তারপর আমি উঠে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।

অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, এখন যে ঠিক কোন কাজটা করা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কারো সামনে পড়বার আগেই চুপচাপ বেরিয়ে পড়তে চাই। এইসময় মনে পড়ল প্রভা একটা পোস্টকার্ড চেয়েছে।•

রাস্তায় জমাদার ঝাড়ু দিয়ে পথের আবর্জনা এক জায়গায় জড়ো করছে। একটা খোলা দরজার সামনে সাইকেলে বাঁধা দুধের পাত্রগুলো নিয়ে গোয়ালা দাঁড়িয়ে, আপাদমস্তক চাদরমুড়ি দেওয়া এক বৃদ্ধ, পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে দুধ নিচ্ছেন, কোলে একটা বাচ্চা। এক জায়গায় তো আমি সত্যি সত্যি দাঁড়িয়ে পড়লাম, ফিরে ফিরে দেখতে লাগলাম গোয়ালা কেমন করে দুধের ক্যান থেকে ঘটি ভরে দুধ নিচ্ছে আর ঘটির গা বেয়ে তার আঙুল থেকে কেমন টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা দুধ পড়ছে। দৃশ্যটা বেজায় ভাল লাগছিল। যখন হুঁশ হল, নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, এমনটা তো আগে কখনও হয়নি? মনে হচ্ছে যেন পথের প্রতিটি লোকই বুঝতে পারছে আমার ভিতরে একটা আনন্দের ফোয়ারা ছুটেছে, জোর করে আমি তার মুখ টিপে বন্ধ করে পথ চলছি। প্রতিক্ষণেই ভয় হচ্ছে, এই বুঝি বাঁধ ভেঙ্গে গেল, আমি হয়ত পাগলের মত ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বলে ফেলব — দেখ, আজ আমি সুখী! আমি দারুণভাবে সুখী! এ আনন্দ ব্যক্ত করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা। প্রভার অবস্থা এখম কেমন একথা কল্পনা করেই আমার সারা দেহ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। শুষ্ক বালুকার ওপর যেন মদিরার বৃষ্টি হয়ে গেছে, প্রতিটি বালুকণা সিঞ্চিত হয়ে সমস্ত মাটি আর্দ্র হয়ে উঠেছে। কি নিদারুণ গ্রীষ্ম, ঝলসে দেওয়া লু, প্রখর রৌদ্রের পর নেমে এসেছে স্বচ্ছ শীতল শান্তিধারা, পান করে চলেছি যুগ যুগান্তরের পিপাসার্তের মত।

বেশ উচ্চকণ্ঠে কয়েকবার ডাক দেবার পর হাই তুলতে তুলতে দিবাকর দরজা ফাঁক করে মুখ বাড়ালো, 'কি ব্যাপার রে? রাত এগারোটায় গেলি, আবার সকাল সাতটা না বাজতে এসে হাজির?' ভিতরে ধারে কাছে কেউ আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে দুষ্টুমির সুরে বলে ওঠে, 'তোর বউ বাপের বাড়ি গেছে বলে এখন বউওয়ালাদের সুখ দেখে হিংসে হচ্ছে বুঝি?'

বউ নিয়ে এই রসিকতায় মনের মধ্যে কেউ যেন সুড়সুড়ি দিয়ে উঠল, ইচ্ছে হল বলে ফেলি, 'কোন আহাম্মকের বউ বাপের বাড়ি গেছে শুনি?'...কিন্তু বাইরে বেশ মুখ গম্ভীর করেই প্রশ্ন করলাম, 'তোর ইচ্ছেটা কি? আমি চলে যাব? একবার বেরিয়ে এসে দেখ বেলা কতটা হয়েছে।'

'যার যা কাজ সে তা করবেই'। এই তো সবে ঘুম থেমে উঠলাম, মুখ হাতটা ধোব তো? আরে বাবা, পরীক্ষার সময় এত খাটুনী গেছে, এখন একটু আরাম করতে পাব না? আমি বাবা আয়েসী মানুষ, তোর মত তো ঈশ্বরকে কথা দিয়ে আসিনি যে সকাল হবার চারঘন্টা আগে বিছানা ছেড়ে উঠব, উঠেই কনকনে ঠাণ্ডাজলে ডুব দেব, তারপর সারা সংসারের ঘুম ভাঙাবার জন্য বেরিয়ে পড়ব।' বৈঠকখানাঘরের দরজাটা পুরো খুলে এবার ও বলে ওঠে, 'আসতে আজ্ঞা হোক।'

'তাহলে চললাম, তোমার এখন সাজগোজ করতেই তো দু আড়াই ঘন্টা লেগে যাবে,' বলতে বলতে বৈঠকখানায় ঢুকে বেশ গুছিয়ে বসে পড়ি।

'বেজায় খুশি খুশি দেখাচ্ছে, ব্যাপার কি রে? ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করার স্বপ্ন দেখে ফেলেছিস নাকি? ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয় কিন্তু!' দিবাকর আবার হাই তোলে।

'পরীক্ষার কথা মনে করিয়ে দিবিনা তো, আমার প্রাণ শুকিয়ে যায় একেবারে। পাশ করব কিনা কে জানে। ফেল যদি করি, সত্যি বলছি, মরবারও জায়গা জুটবে না।' সত্যি বলতে কি, পরীক্ষার কথা মনে পড়লেই অন্য সব কথা ভুলে যাই, প্রাণটা যেন ধক করে ওঠে। কি যে হবে কে জানে। এক ঝটকায় এ সব চিন্তা দূরে ঠেলে দিয়ে বলে উঠি, 'ছাড়ান দে তো, যাক ওসব কথা, যা হবে সে তখন দেখা যাবে। এখন থেকে ভয়ে কাঠ হয়ে থাকার দরকার কি?' কথাটা বলে নিজেরই অবাক লাগল, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন বেপরোয়া মনোভাব আগে তো ছিলনা আমার।

একটু চুপ থেকে দিবাকর বলে, কালকের ব্যাপার নিয়ে মা এখনও মুখ হাঁড়ি করে রয়েছে। তুই বল, নিজের বউকে নিয়ে একদিন একটু সিনেমায় গেলে কি এমন ক্ষতিটা হয়? এঁদের ব্যাপার স্যাপার আমার মাথাতে ঢোকে না। বিশ্বাস কর, এমন একটা বাড়ি আমি দেখিনি যেখানে শাশুড়ী তাঁর ছেলের বউএর ওপর প্রসন্ন। যার চারটে ছেলে তারও যা, যার দুটো ছেলে তারও সেই একই মনোভাব। আজ ঝগড়াটা মিটে যায় যেন, এইটেই চাইছি এখন।

'আচ্ছা, এখনও চলছে নাকি?' মনে হল প্রশ্নটা ওকে নয়, নিজেকেই যেন করছি। দেওয়ালের গায়ে লেপটে সেঁটে দাঁড়ানো প্রভা আর ওদিকে মা এবং ভাবী — ছবিটা চোখের ওপর ভেসে উঠল। হঠাৎ চোখে জল এসে গেল। আমার শিরায় শিরায় বেজে উঠল মুন্নীর সেই কান্নাভরা স্বর, 'ভাইয়া, ভাবীর সঙ্গে কথা বল'। এ সব আগে যখন শুনেছিলাম, এককানে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে যেন সেই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি উঠল আমার অন্তর থেকে, আমার সমস্ত অস্তিত্ব ভরে গুঞ্জরণ করে উঠল। ইচ্ছে হল মুন্নীকে জড়িয়ে ধরে ওর কানের মধ্যে চিৎকার করে বলে দিই, 'দেখ মুন্নী, কথা বলেছি।' আমি, তোর ভাবীর সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু মুন্নী এখন কোথায়? ওকে তো গর্তে ফেলে তার মুখে পাথর চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হল মুন্নী যেন আমার অন্তরের মধ্যে থেকে মুক্তির জন্য ছটফট করছে। সে আমাকে একটা গর্তের মধ্যে থেকে টেনে বের করেছে, কিন্তু এখন নিজেই গিয়ে পড়েছে তার মধ্যে। আহা, ও যদি কিছুদিন আগে আমাকে এই মুক্তির স্বাদটা এনে দিতে পারত তাহলে আমি ওকে ওই নরকে কখনও ফিরে যেতে দিতাম না।

দিবাকরের কি একটা কথায় চমকে সচেতন হলাম। কি ভাবছিলাম এতক্ষণ ও বুঝে ফেলেনি তো? কথা বলতে বলতে ভাবতে শুরু করে দিই এই এক বদভ্যাস আমার। দিবাকর বলছিল, 'সমর, কাল আমার এক খুড়তুতো ভাই আসছে। তাই

ভাবছিলাম আজকের মধ্যে মায়ের রাগটা পড়ে গেলে ভাল হয়। আগের বার যখন এসেছিল তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারিনি। উঃ সে যা ঘুরেছে না — কোন শহর আর বাকি নেই। কিন্তু ভাই, ঐ টিকিটা কাটিয়ে আসতে হবে। ও যদি ঐ নিয়ে হাসি ঠাট্টা আরম্ভ করে, তোর হয়ত খারাপ লাগবে। ও আবার একটু ঐ ধরণের মানুষ কিনা! ওর এই সব ভড়ং বিশেষ পছন্দ নয়।

'এটা ভড়ং হল নাকি? যার যেমন বিশ্বাস'। আমার তর্ক করার মোটেই ইচ্ছে নেই।

'তুমি সকলের থেকে আলাদা, হিন্দুত্বের পতাকা তুমিই উড়িয়ে চলেছ এইটেই বোধহয় বিশ্বাস! যাই হোক একটা উপযোগীতা তো স্বীকার করতেই হবে, কারো সঙ্গে ঝগড়া বাধলে একলাফে গিয়ে যদি আগে টিকিটা কষে ধরতে পার, তাহলে লোকটা যতই ছটফট করুক, আর কিচ্ছুটি করতে পারবে না। তাছাড়া, পরীক্ষার সময় টিকিটা খুঁটিতে বেঁধে পড়তে বসলেও ভাল হবে,' বলতে বলতে ও নিজেই হেসে ওঠে।

'খালি খাওয়া দাওয়া আর ভোগবিলাসে ডুবে থাকা জীব তুমি, বিশ্বাস আর আত্মার আনন্দ কাকে বলে সে আর বুঝবে কি করে?'

'তোমার যা প্রাণ চায় বলে যাও সমরবাবু, কিন্তু দুনিয়ায় এছাড়া আর আছেটা কি শুনি? মাঝে মাঝে আমিও যাই তোমাদের ঐ সব মন্দিরে সেখানে তো দেখি একেবারে বাছাই করা জিনিসপত্র আসে। চিরকাল ধরে এই হয়ে আসছে, তার চারপাশে ভাল ভাল কথার জাল বিছিয়ে যতই ঢাকবার চেষ্টা করনা কেন।'

মনে পড়ে গেল, মন্দিরে যাইনি আজ কতকাল হয়ে গেল। তবু গম্ভীরভাবেই বললাম, 'দেখ দিবাকর, এসব তো নিজের নিজের বিশ্বাসের ব্যাপার। প্রত্যেক দেশেরই পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, বুদ্ধি বিচার সব নিয়ে একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। আমরা আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে চাইনা, আর এই ধরণের লোকেদের জন্যই আজ দেশের এই অবস্থা। আমাদের ক্রমশঃই অধঃপতন ঘটছে। নিজেদের জিনিস, নিজেদের দেবী দেবতাদের নিয়ে আমরা হাসি তামাশা করে থাকি আর যা কিছু বিদেশী তার পেছনে ছুটে মরি।' বেশ একখানা দীর্ঘ প্রভাবশালী ভাষণ দিয়ে ওকে বুঝিয়ে ছাড়ব ভেবেই বলতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ সেই গণেশঠাকুরকে মাটির ঢেলা ভেবে তা দিয়ে বাসন মেজে ফেলার ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। প্রভার কাজটা যে উচিত হয়েছিল তা আমি এখনও মনে করিনা, কিন্তু সেদিন থেকে আমার অজ্ঞাতসারেই এই চিন্তাটা আমাকে ক্ষণে ক্ষণে যেন হুল ফোটাতে থাকে, মনে পড়ে যায় আমার সেদিনকার ব্যবহার শুধু অনুচিত নয়, অমানুষিক ছিল। আজ যদি প্রভা আমার সমস্ত ব্যবহারের কারণ জানতে চায় তাহলে আমি যা করেছি তার স্বপক্ষে কি যুক্তি দেখাব? যদি সত্যি কথা বলতে হয়, তাহলে আমি যা যা করেছি তার অনেক কিছুরই স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই।

দিবাকর বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল, 'দেশী-বিদেশীর কথা জানিনা, কিন্তু দেশীপনার

নাম দিয়ে চেহারাটা কার্টুন ছবির মত করে ঘোরাটা আমার ভাল লাগেনা। কিছু মনে কোরনা ভাই ইস্ত্রি আর ক্রীজবিহীন খাটো প্যান্ট, নোংরা কুঁচকোন কামিজ আর বিলিতি ছাঁটে কাটা চুলের মধ্যে ঝুলন্ত লাট্টুর মত গিঁটবাঁধা টিকি — এই যদি দেশীপনার নমুনা হয় তো আমি দূর থেকেই তাকে প্রণাম জানাই। নিজের দেশেই মানুষ যদি একটু সুষ্ঠু বা ভালভাবে থাকতে চায় তাহলেই কি সে বিদেশী হয়ে যাবে? এ সব যদি ভাল নয় তো মাথায় ক্ষুর বুলিয়ে নাও আর খাদির মোটা ধুতিকুর্তা পরতে শুরু কর। জোরে বাতাস এলে ধুতির কোঁচা স্বাধীনতাদিবসের পতাকার মত উড়তে থাকবে আর তাকে সামলাতে তোমাকে ছুটতে হবে তার পিছু পিছু।'

আমার মুখ একেবারে লাল হয়ে গেল। আমাকে নিয়ে এই ধরণের কথা আগেও বলেছে, কিন্তু ওসব হল ব্যক্তিগত পছন্দ আর বিশ্বাসের ব্যাপার এই বলে আমি সেগুলো উড়িয়ে দিয়েছি। কখনও কোনদিন হয়ত নিরুত্তরও থেকেছি। এই বোকাটাকে বোঝাব কি করে যে এইগুলো ছাড়া আমার কাছে আর পরবার মত কিছুই নেই। প্রভার সেই ছেঁড়া তালি দেওয়া শাড়িখানার কথা মনে পড়ে গেল আমার। আর প্রভার মুখখানা মনে পড়তেই দিবাকরের বকবকানি ভুলে বলে উঠলাম, 'আচ্ছা বাবা, হয়েছে, থাম এবার। এটা কলেজের ডিবেট তো নয়। এই ভোরবেলাতেই আমার মুডটা খারাপ করে দিসনে তো!'

'কিন্তু আজ হঠাৎ তোর এই প্রসন্ন মুডের কারণটা বলবি তো?'

উত্তরটা ঠোঁটের কাছে এসে গিয়েছিল, কিন্তু চেপে গেলাম। বললাম, 'এমনি, বিশেষ কোন কারণ নেই। ঠিক আছে, তুই এখন স্নানটান করতে যা, আমিও চলি। কটা জরুরী চিঠি ছাড়তে হবে, দু চারটে পোস্টকার্ড থাকে তো আমাকে দে।' হঠাৎ আমার সারা শরীর যেন শিউরে উঠল, প্রভা কেমন ভাবে পোস্টকার্ড চেয়েছিল মনে পড়ে গেল। 'কোথায় কোথায় ছাড়ছিস বলতো? আমার রোল নম্বরটাও মনে রাখিস কিন্তু। কার কার কাছে খাতা গেছেরে?' বলতে বলতে হেসে ফেলে, তারপর আবার গম্ভীর হয়ে দিবাকর বলে, 'একটু চেনাশোনা খুঁজে বার কর ভাই, অন্য সব ছেলেরা তো শুনছি নাকি দিগ্বিজয় করতে বেরিয়ে পড়েছে। যাদের সঙ্গে কোন জন্মে পরিচয় পর্যন্ত নেই তাদের কাছেও দিব্যি গিয়ে হাজির হচ্ছে আর কাজ হাসিল করে আসছে। ধরাধরি করতে না পারলে আজকাল বাঁচা মুশকিল।' ও বেচারার মাথায় যেন চিন্তার পাহাড় ভেঙে পড়েছে। ওর মুখখানা দেখতে দেখতে আমার বুকের ওপর যেন আবার সেই পরীক্ষায় ফেল করার বিভীষিকাটা চেপে বসল। ফেল করার পর কি প্রতিক্রিয়া হবে তাই ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরপর কি করবি ভেবেছিস কিছু? থার্ডইয়ার জয়েন করবি না অন্য কোন লাইনে যাবি?'

'আরে ভাই, আগে পাশ তো করি, তারপর ওসব ভাবা যাবে। ফেল করে গেলে আবার একবছর এই গাধার খাটুনি চলবে। রোজ মন্দিরে দেবদর্শন আর এত মানত করা

সব বেকার হয়ে যাবে। তোর তো ফার্স্ট ডিভিশন বাঁধা, তোর আর চিন্তা কিসের? বিপদ তো আমাদেরই।'

আমার সম্বন্ধে দিবাকরের এমন ধারণা দেখে মনটা খুশি হল। কিন্তু খুশিটা চেপে রেখে মুখে বললাম, 'চুলোয় যাক ফার্স্ট ডিভিশন, কোনমতে পাশটুকু করলেই হনুমানজীকে সোয়া টাকার পূজো দিয়ে আসব। নিজের মনে ফার্স্ট ডিভিশনের আশা পুরোপুরি ছিল। একথাও মনে হয়েছিল যে বাড়ির অবস্থা যদি একটু অনুকূল হত তাহলে রেজাল্ট কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিতাম।

'আচ্ছা, আচ্ছা কল্পনা বিলাস ছাড় এখন। ভবিষ্যতে তোর কি করার ইচ্ছে? আমার পিতৃদেব তো এখন থেকে শুরু করেছেন, — বেশী লেখাপড়া শিখে কোন লাভ নেই। এখন উঠতি বয়স, এই বেলা পুলিসের চাকরিতে লেগে পড়। যেমন মান খাতির, তেমনি উপরি আমদানী। কিন্তু সমর, আমার এ চাকরি একেবারে পছন্দ নয়। কোথায় কোথায় ঘুরে মরতে হবে তার ঠিক নেই। কোন ধাব্দাড়া গোবিন্দপুরে পাঠিয়ে দেবে, সেখানে হয়ত একটা মানুষের মুখ দেখতে পাবো না। কিরণ তো কেঁদেই মরে যাবে।' একটা নিঃশ্বাস ফেলে দিবাকর আবার বলে, 'আবার ঐ উপরি আমদানী...বাবা তো এখনও নিজেদের সময়কার কথাই ভাবেন কিনা!'

দিবাকরের কথাগুলো আমার অন্তর স্পর্শ করল। তবু বললাম, 'তোর আর চিন্তা কিসের? বিপদ তো আমার। কি যে করব ভেবেই পাচ্ছি না। পড়াশোনার পাট আমার শেষই হয়ে গেল বোধহয়। কোথাও একটা শ'খানেক টাকার চাকরী যদি জুটে যায় তাহলেই ঢের।'

'কি বোকার মত কথা বলছিস? কারো কথায় কান দিতে হবেনা। আমরা দুজনেই থার্ডইয়ার জয়েন করব, এই আমি বলে রাখছি' সান্ত্বনার স্বরে বলে দিবাকর।

'না দিবাকর, নিজের ক্ষমতা বুঝেই চিন্তা করা উচিত। আমার বাড়ির অবস্থা তো তেমন নয়। এইবার যা হয় একটা কিছু আমাকে করতেই হবে। আরো পড়ার কথা এখন চিন্তাই করা চলেনা। যদি একটা কাজের সন্ধান পাই তো আমি এখন থেকেই তাতে লেগে পড়তে চাই। তোর সন্ধানে কিছু থাকে তো বল?' ভাইসাবের কথাটা মনে পড়েছে আমার।

'ওহে আমিও সেই কথাই বলছি। ঐ সব কথায় কান দেবার দরকার নেই। একটা ভাল ডিগ্রী জুটলে ভাল চাকরিও জুটবে। তা নয়ত কোন লালাজীর বাড়ি চল্লিশ টাকার মুহুরীগিরি করতে হবে। ইন্টারমিডিয়েট পাশকে কেউ পুছবেওনা।'

এই যুক্তির সামনে আমাকে নিরুত্তর থাকতে হল। সত্যিই তো, কে দেবে আমায় চাকরি? বাস্তবের এই রূপ দেখে মনটা দমে গেল। পাশ কাটিয়ে বললাম, 'যাকগে, যেতে দে, রেজাল্ট তো বেরোক আগে।' উঠে দাঁড়ালাম, চাকরির জন্য রোজ রোজ এ বেচারাকে কেন জ্বালাতন করি, যদি কিছু করা সম্ভব হত তো নিশ্চয় করত ও। বৈঠকখানা

থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলি, 'স্নান সেরেনে,' হঠাৎ মনে পড়ে যায়, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পোস্টকার্ড' 'আরে আমি তো হোলী আর দেওয়ালীতে স্নান করি' বলতে বলতে ও ভিতরে গেল পোস্টকার্ড আনতে। চিন্তা ওরও কিছু কম নেই, কিন্তু দিব্যি খোশমেজাজে থাকে। মোটে একটা পোস্টকার্ড চাইতে লজ্জা করছিল তাই চার পাঁচটা চেয়েছি। পোস্টকার্ডগুলো নিয়ে বললাম, 'ফেরৎ দিয়ে যাব।' ও হেসে উঠে বলল, 'আহা, ফেরত দেবার চুক্তিটা লিখিয়ে নেবার রসিদ, টিকিট লাগানো কাগজ তো আনিনি। তা এবার স্পষ্ট কথাটা বল তো, এত খুশির কারণটা কি?' এবার আমিও খোলাখুলি হেসে ফেললাম, 'প্রভা এসে গেছে...' বেরিয়ে পড়ি আমি।

'তাই বল বেটা!' পিছন থেকে দিবাকর বলে ওঠে।

যে লজ্জা ঢাকতে আমি সকাল থেকে সবার নজর এড়িয়ে ঘুরছিলাম তা দূর করতে সক্ষম হলাম সন্ধ্যা নাগাদ। মনে বেশ একটা দৃঢ়তা এল— হ্যাঁ, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তাতে কার কি? নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল — এতে এত লজ্জা পাবার কি আছে? দিবাকরের বাড়ি থেকে ফিরলাম যখন মনে হচ্ছিল যেন মনের মধ্যে রসের জোয়ার উঠেছে। কতকাল পরে এমন হালকা লাগছে। বহুবছর পরে যেন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছি। থেকে থেকেই অদ্ভুত একটা করুণায় অন্তর যেন বিগলিত হচ্ছে। আহা বেচারী, এতদিন ধরে কত কি যে সহ্য করেছে! মুন্নী ছাড়া আর কারো কাছে একটা পোস্টকার্ড চাইতেও সাহস করেনি! ধন্য বটে। ভাবীকে দেখেই সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য লাগে। এখনই এই দাপট, এরপর যখন সত্যি সত্যি শাশুড়ী হবে তখন যে কত জুলুম করবে কে জানে। ও নিজেও তো প্রভারই মত এ বাড়ির বউ, সেকথা ও একবারও ভাবেনা? ওরই উসকানিতে আমি কত কিছু করেছি, সেসব ভাবলে এখন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

এধার ওধার ঘোরাফেরার পর বাড়ি ফিরলাম, তখন বেলা দুটো বেজে গেছে। কলতলায় দাঁড়িয়ে বাবুজী জলের ধারায় পা ঘসে ঘসে ধুচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'এই যে নবাব সাহেব, হাওয়া খেয়ে ফিরলেন। খাওয়া পরার চিন্তা তো নেই।'

ভারি খারাপ লাগল। প্রভা শুনলে কি ভাববে? তা ছাড়া, ঘুরে ফিরে ঠিক আমার কিছু রোজগার না করার কথাটা উঠবেই এ তো জানাই আছে, তাই বাবুজীর সামনে পড়ে যাওয়ায় একটু ভয়ও করছিল। চাপাগলায় বললাম, 'দিবাকরের কাছে গিয়েছিলাম, চাকরির কথাবার্তা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল।'

সহসা বাবার গলাও বেশ নরম হয়ে এল, 'হ্যাঁ, যাহোক একটা কিছু কর বাবা, এভাবে কি আর চালানো যায়?'

ভিতরে আসতেই মায়ের সামনে পড়া গেল,—'এখন তো পড়াশোনা নেই, তবু সারাদিন বাইরে ঘোরা? দুটো বেজে গেল এইটে কি খাবার সময়? রাতে তো কখন ফিরেছ কে জানে'। চুপচাপ রান্নাঘরে ঢুকলাম ভিজে বেড়ালের মত, নিঃশব্দে পিঁড়ি

টেনে নিয়ে বসলাম। প্রভা খাবার এনে সামনে রাখতেই চমকে উঠেছি। মাথা তুলে ওকে দেখছি যেন অচেনা কেউ, ওর ধৌত পরিচ্ছন্ন মুখে এক অদ্ভুত সংযত গাম্ভীর্যের ছাপ, আঁখিপল্লব নত, ঠোঁটে হালকা হাসির আভাস। মুখখানা শুষ্ক বটে কিন্তু আজ সে মুখ এক অদ্ভুত তৃপ্তির আভায় যেন দীপ্ত, বহুকাল পরে যেন একটা ধূলি ধূসর আয়নাকে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। ইচ্ছে করছে এই আয়নাটার দিকে চেয়ে থাকি, কেবলই চেয়ে থাকি। খুব ইচ্ছে হল ওকে কিছু বলি, কিন্তু কি যে বলব ভেবেই পাচ্ছি না। মনে হল কবে থেকে আমি প্রভার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য কান পেতে আছি, ভাল করে তো শুনিই নি কোনদিন। না দেখে, শুধু গলার স্বর শুনে চেনা তো অসম্ভব আমার পক্ষে। তাছাড়া ওর গলা চিনবই বা কি করে? ও কখনও কথাটথা বলে কিনা তাই তো আমার জানা নেই। চুপচাপ মুখ বুজে শুধু কাজ করে যায়।

খাবারটা রেখে ও যখন চলে যাচ্ছে, লক্ষ্য করলাম ওর পরণের শাড়ীখানা বড় ময়লা, একহাত অন্তর ছেঁড়া আর সেলাই করা। এটা কি পরার মত কাপড়? এটা পবে ঘুরছে কেন? আর কি শাড়ী নেই ওব? বিয়ের সময় তো নিশ্চয় কিছু কাপড়-চোপড় পেয়েছে, সে সব গেল কোথায়? এদিকে আসুক, তখন এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করব। আমি তো বেচারীকে প্রায় ত্যাগই করেছিলাম, কিন্তু বাড়ির সবাই বিশেষ করে মা পর্যন্ত কি এটুকু খেয়াল রাখেনি যে ওরও কিছু জিনিসপত্রের দরকার থাকতে পারে। ওর তো মাতৃস্থানীয়া তিনি। তাঁর তো পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়। ভাবীর তো মেয়ে হয়েছে বলে তিনি যেন রাণীগিরি করার অধিকার পেয়ে গেছেন। নিজের ঘর থেকে তিনি বাইরে আসেন না প্রায়ই, ঘরেই নজর এড়িয়ে বেশ কয়েকটা শাড়ী নিশ্চয় ভাবী নিজের কাছে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু সে সব ও দেবে কেন? জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডাও এই শাড়ী পরেই কাটাতে হয়েছে প্রভাকে, কথাটা চিন্তা করেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আহা, কি কষ্টেই দিনগুলো কেটেছে ওর, একেবারে সহায়হীন, নিজের প্রয়োজন কাউকে জানাতে পারেনি, কারো সঙ্গে দুটো কথা বলতেও পারতনা...ঐ দারুণ ঠাণ্ডায় যখন হাতদুখানা বাইরে বের করতেও কষ্ট হয়...!

আবার চোখে জল এসে গেল। প্রভা রান্নাঘরের নিচু পাঁচিলটার ওধারে বসে আছে। এতদিন পরে আজ বিয়ের সময়ের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। ও এমনি করেই রান্নাঘরে বসেছিল, হাতের ঐটুকু অংশই এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল, আর আমি এক ধাক্কায় থালা ঠেলে ফেলে দিয়ে দুমদাম করে উঠে চলে গিয়েছিলাম। সেদিন এই হাতের ফর্সা নরম কব্জীতে কালো সিল্কের সরু ব্যাণ্ডের রিস্টওয়াচ কি সুন্দর মানিয়েছিল, আজ সেদিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সেদিন অত লক্ষ্য করিনি, তবু সেই হাতখানি স্পষ্ট মনে পড়ল। বাসন মেজে আর ঘরের কাজ করতে করতে সে হাত আজ খসখসে, শুকনো কালিপড়া, মনে হচ্ছে যেন হাড়ের ওপর চামড়াখানা কোনমতে জড়ানো। পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়ল, যত্নের অভাবে পায়ের পাতাদুখানাও নোংরা, কালিমাখা

গোড়ালিতে লম্বা লম্বা ফাটাদাগ। কত আশা আকাঙক্ষা নিয়ে, কত আনন্দে আমোদে ভরা সংসারে পালিতা এই মেয়েটিকে বাজনা বাদ্যি-বাজিয়ে ঘটা করে এ বাড়িতে আনা হয়েছিল, আর আজ...?

প্রভার যাতে খারাপ না লাগে এজন্য থালা খুব আস্তে সরিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম, প্রভা চমকে উঠল। মুখ তুলে উৎসুক চোখে আমার দিকে চেয়ে দেখল, ঠিক রাতের মত ভঙ্গিতে। আহা, বড় বড় চোখদুটিতে সরলতা মাখা নীরব দৃষ্টি! কিন্তু চোখের চারপাশে গভীর কালিমা। সেই কালিমাময় মুখখানা আমার হঠাৎ এমন ভয়ানক মনে হল যে আমি আচমকা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। খুব দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে প্রশ্ন শুনলাম, 'কি হল?'

বুকের মধ্যে কিসের পিণ্ড যেন চেপে বসেছে, কথা বলতে গেলেই হয়ত কেঁদে ফেলব। কোনরকমে ঠোঁটকামড়ে সামলে নিয়ে অনেক কষ্টে বলে উঠি, 'দিবাকরের বাড়ি খেয়ে এসেছি, আমার খিদে নেই'। তারপরেই বাইরে চলে এলাম।

বাইরে মা বসেছিল স্ট্যাণ্ডের ওপর কোন ধর্মপুস্তক রেখে মোটাকাঁচের চশমা পরে কিছু পড়ছিল। নিজের ঘরে যাবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করি। সিঁড়ির ওপরই একটা ছোট জানলা সামনের দিকে খোলা, ওটা ভাবীর ঘরের জানলা। হঠাৎ ভাবীর গলা শুনে চমকে গেলাম, 'আজকাল দুজনে তো কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে।'

'কে?' ভাইসাবের কণ্ঠ। খেয়াল হল আজ তো রবিবার।

'সমর ঠাকুরপো আর ছোটবউ,' মনে হল কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ মিশে আছে।

'আচ্ছা?' ভাইসাবও চমকে উঠলেন মনে হল। বোধহয় পাশ ফিরে সোজা হয়ে শুলেন, 'তুমি জানলে কি করে?'

'খেয়ে উঠে কুঁয়ার ঠাকুরপো এলাচ নিতে এসেছিল, সেই বলে গেল।'

আর কিছু না শুনে আমি উঠে এলাম ওপরে। ঘর বন্ধ করে বিছানায় পড়ে আবার কাঁদতে শুরু করে দিলাম ব্যাকুলভাবে।

সন্ধ্যায় আবার অপরাধীর মত বেরিয়ে পড়লাম আর পথে পথে ঘুরলাম লক্ষ্যহীনভাবে। সকালবেলার প্রাণভরা আনন্দ এখন গেল কোথায়? একটা তীব্র তিরস্কার আর ধিক্কারে ক্রমাগত যেন মনের ভিতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। অন্তর্যামীর কাছে বার বার প্রার্থনা করছি, হে ঈশ্বর, শাস্তি দাও আমাকে, শাস্তি দাও। এক নিরীহ অবলা নারীর ওপর ঘোর অত্যাচার করেছি। ওকে নারকীয় যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে আর আমি চুপচাপ শুধু দেখে গেছি। আমার চোখদুটো ছিল কোথায়? আচ্ছা, আমি না হয় ছেলেমানুষ কিন্তু মা আর বাবুজীর কি কোন বিবেচনাবোধ ছিল না? প্রায়শ্চিত্তের চিন্তা আমাকে টেনে নিয়ে গেল মন্দিরে। শূন্যদৃষ্টিতে একদিকে চেয়ে বহুক্ষণ বসে রইলাম। বহুদিন পরে যেন বিদেশ থেকে ফিরে এসে দেখছি এরমধ্যে কতকিছু ঘটে গেছে, এমনিভাবে আমি প্রতিটি বিষয় বিশ্লেষণ করে করে দেখতে লাগলাম। প্রায়শ্চিত্তের চিন্তা, করুণা, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি ব্যাপারকে বিচার করা — এই সবকিছুর সঙ্গে সঙ্গে মনের স্তরে স্তরে

জেগেছিল রাত্রের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা। শেষ পর্যন্ত কোথাও মন বসাতে না পেরে ফিরে এলাম বাড়িতেই।

লক্ষ্য করলাম, এর মধ্যেই আমার প্রতি সকলের দৃষ্টি একটু বদলে গেছে। প্রভা রান্নাঘরে, ভাবী মায়ের কাছে বসে ফুসুর ফুসুর করে কি সব বলছে। বাড়িতে ঢুকেই বুঝতে পেরেছি আমার আর প্রভার কথাবলার ব্যাপারটা সারাবাড়িতে জানাজানি হয়ে গেছে। সবাই এমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে যেন আমি যাদুঘর থেকে বেরিয়ে আসা কোন অদ্ভুত জন্তু। আমি সেই কখন থেকে ভাবছি, সবাই যখন জেনে যাবে তখন খুব লজ্জা করবে, সবাইকার সামনে দাঁড়াব কি করে? কিন্তু এখন এইসব দৃষ্টির খোঁচায় আমার বেশ বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। আমি প্রভার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছি এতে এত আশ্চর্য হবার কি আছে শুনি? এ নিয়ে এত আলোচনা করারই বা কি আছে? এটা কি একটা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করবার মত কথা? আরে বাবা, স্বামী-স্ত্রী এতদিন কথা বলেনি, কিন্তু এখন কথা বলছে, এতে এত কৌতুহল দেখানোর কি আছে?

চারপাশের আবহাওয়ার প্রতি নিতান্ত উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে আমি বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে আমার জীবনে এমন কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটেনি। খেয়ে উঠতেই মা বলে উঠল, 'ওরে সমর, তোর বাবুজীকে একবার ডেকে আন তো, এখনই গরম গরম খেয়ে নিক, এরপর সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'কোথায় গেছেন?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'খুকীকে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। নওলকিশোর পণ্ডিতজীর বৈঠকখানাতেই বসে আছেন বোধহয়। বাচ্চাটারও তো খিদে পেয়েছে এতক্ষণে।'

এই কথা শুনেও আমার রাগ হয়ে গেল। মা এমনভাবে বলছে যেন আমি যেতে আপত্তি করব। এই একটুতেই রাগ হয়ে যাবার জন্যও আমার হাসি পেয়ে গেল। কি যে হয়েছে আমার! বাবুজী চেয়ারের ওপর দুই পা তুলে দিব্যি আরাম করে বসেছেন আর চিররুগ্ন নওলকিশোর ওঁর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে ওঁর গল্প শুনছেন। পাড়ার আরো দুচারজন এপাশে ওপাশে বসে মন দিয়ে শুনছে। বাবুজীর বহুবার বলা বক্তৃতায় ঠিক একই ভাবে সেই জানা শব্দগুলোই উচ্চারিত হয়ে চলেছে, 'সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো আজকের এই সভ্যতার সাধ্য কি আমাদের ভারতীয় সভ্যতার ধারে কাছেও পৌঁছয়, যতই হাত পা ছোঁড়না কেন। দুনিয়াটা যে কোন রসাতলের দিকে চলেছে তা তো বোঝা দায়! আরে ভাই, কাকে দোষ দেব? সবই আমাদের কর্মফল। হাজার বছর ধরে কত বুঝে সুঝে আমাদের মুনি ঋষিরা যে পথ নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাতে কিনা একেলে ছোকরারা বলে জংলীদের তৈরী করা নিয়ম। বোঝ একবার, নিজেদের পূর্বপুরুষকে জংলী বলতে লজ্জা করেনা তোদের? বুঝলেন মশায়, কি রকম মগজ ছিল তাঁদের, কত ভেবেচিন্তে এক একটা নিয়ম তৈরী করেছিলেন তাঁরা, ভাবলে একেবারে থ' হয়ে যেতে হয়। আলাদা আলাদা জাত বানিয়েছেন, প্রত্যেকের আলাদা

আলাদা কর্ম-নির্ধারিত করে দিয়েছেন...সব যদি ঠিকঠাক নিয়মমত চলে তাহলে এত চিৎকার চেঁচামেচির দরকারই...' এই সময় নওলকিশোরজীর মনে হল এই বিষয়ে কথা বলবার অধিকার তো ওঁর, সুতরাং ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'ভগবান মনু মনুস্মৃতিতে বলেছেন...' আমি ভাবছিলাম বাবুজী বক্তৃতাটা একটু থামালে কথা বলব, এবার বকুনী খাবার আশঙ্কা সত্ত্বেও ইতস্তত করে বলে ফেললাম, 'বাবুজী আপনাকে বাড়িতে ডাকছে।'

'যাচ্ছি, ভিতর থেকে খুকীকে নিয়ে আয়', আমার কথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়েই উনি বলেন।

'পণ্ডিতজীর বাড়ি আমি সর্বদাই যাওয়া-আসা করি। ওঁর পুত্রবধূ বসে খুকীকে খাওয়াচ্ছিলেন। বললাম, 'ভাবী ওকে বাবুজী নিয়ে যেতে বললেন।' এরই স্বামী দেবতাটি সেদিন সেই শরণার্থীকে মেরে তাড়িয়েছিলেন। আমার গলা শুনে বেরিয়ে এলেন পণ্ডিতগিন্নি, দেখেই শুরু করলেন, 'কে রে, ও সমর? তুই তো যাওয়া-আসা একেবারে ছেড়েই দিয়েছিস বাছা। তা, পরীক্ষা শেষ হল? বেশ, বেশ! হ্যাঁরে, তুই নাকি তোর বউয়ের সাথে কথা বলতিস না? আজকাল নাকি বলিস? ভাল করেছিস বাছা, নিজের বউয়ের সঙ্গে তুই কথা বলবি না তো আর কে বলবে? কত কি ঘটে, তারজন্য কি কথা বন্ধ করতে হয়? কথা বলা তো ভালই, কিন্তু বাছা আমার বিসন যেমনটা করছে তেমন অন্যায় যেন করিসনে। মন্দিরে যা পূজো প্রণামী পড়ে সব এনে ঐ বউয়ের কোলে ঢেলে দেয়। তোর দিব্যি, বলছি বাছা, একটা পয়সা আমায় দেয় না। ভাল ভাল মিষ্টিগুলো নিজেরা খায়। আমাদের সামনে ফেলে দেয় এঁটোকাঁটাগুলো। এই হতচ্ছাড়ারা বুড়ো বয়সে আমাদের যে কি দুর্দশাই করেছে সে আর কি বলি! দিনরাত কেবল হায় হায় করে মরছি। কেউ দেখবারও নেই কেউ শোনবারও নেই। এরা এক ফোঁটাও ভাবেনা আমাদের জন্য। মন্দিরে কি আসছে কি যাচ্ছে, বিন্দুবিসর্গ কিছুই টের পাইনে। দুবেলা শুধু এই প্রার্থনা করে যাচ্ছি, 'হে ঠাকুর আমাদের এবার তুমি ডেকে নাও।' কিন্তু সমর তুই দেখে নিস, এই যে দুবেলা এত কলাকান্দ মিঠাইয়ের ছড়াছড়ি এ সবই পণ্ডিতজীর জন্য। এরপর যখন একটি পয়সাও প্রণামী পড়বেনা তখন বুঝবে সব কত ধানে কত চাল, এখন তো সব কিছু একেবারে ঝলমল করছে।' পণ্ডিতজীর মৃত্যুর কথা কল্পনা করেই হোক বা অন্য কোন্ ব্যক্তিগত কারণেই হোক, ওঁর গলা ধরে এল। চোখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে উঠলেন পণ্ডিতগৃহিনী।

বিসনের বউ শাশুড়ীর দিকে অবজ্ঞাভরে তাকাল তারপর একটু হেসে খুকীকে আমার কোলে তুলে দিল। খুকীকে নিয়ে বাইরে আসতে আসতে ভাবীর সেই ডাক্তার দেখাবার কথাটা আবার মনে পড়ে যাওয়ায় আমি নিজেও একটু হেসে ফেললাম।

দুই

বিস্ময়ে আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি নিজে দেখেছিলে?'

প্রভা অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, 'নিজে তো দেখিনি, কিন্তু মুন্নীবিবি বলেছিল ও দেখেছে, আপনাকে জানিয়ে দেবে বলেছিল। আমি তরকারী চড়িয়ে ওখান থেকে একটু সরে যেতেই ভাবী একমুঠো ভর্তি নুন ওতে দিয়ে দিয়েছিল।'

'হুঃ' কনুইতে ভর দিয়ে দুই হাতের চেটোয় মুখ রেখে গম্ভীরভাবে আমি চিন্তা করছিলাম। সেই ভাবেই আবার প্রশ্ন করলাম, 'তুমি প্রথমদিন আমার সঙ্গে কথা বলনি কেন? প্রথম দিনেই এতবড় অপমান কেন করলে?'

প্রভা হাঁটু তুলে বসেছিল, দুহাতে হাঁটু বেস্টন করে নিজের করতলে মুখ রেখে খুব শান্ত অবিচলিত ভাবে বসে আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। ঘরের বাইরে আজও জ্যোৎস্নার ধারাবর্ষণ চলেছে, দুধের মত শুভ্র একটুকরো আয়তক্ষেত্রের আকারের জ্যোৎস্না তির্যকভাবে এসে পড়েছে আমাদের খাটের পাশেই। অনেক কষ্টে ওকে আমি রাজি করিয়েছি বিগত দিনগুলির সব কথা খুলে বলতে। অনুত্তেজিত স্বরে ও বলল, 'অপমান তো করিনি। আপনার কি মনে হয়েছিল যে আমি অপমান করেছি?' গভীর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বলল, 'যাকগে; সেসব কথা আবার এখন তুলে লাভ কি? ভাগ্যে যা লেখা ছিল, তাই হয়েছে।'

'ওসব ভাগ্যটাগ্য কিছু নয় প্রভা! আমার জানতে বড় ইচ্ছে করছে, এত করে খোশামোদ করছি, আমাকে বলবেনা তুমি?' অনুরোধের সুরে কথাটা বলতে বলতে ওর হাতখানা তুলে নিলাম নিজের হাতে। আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল, ওর নরম হাতখানা কি প্রাণহীন, হিমঠাণ্ডা।

হাতখানা ও সেইভাবেই থাকতে দিল। আমার কথা শুনে খুব জ্ঞানী আর অভিজ্ঞ মানুষের মত সামান্য হেসে বলল, 'এতদিন ধরে জ্বালিয়ে এখন না হয় একটু খোশামোদ করলেই,' তারপর আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বলে উঠল, 'হপ্তাখানেক ভাল করে ঘুমোতে পাইনি, এত ক্লান্ত ছিলাম শরীর যেন ভেঙে পড়ছিল, মনটাও ভাল ছিলনা, কেবলই বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। তারপর মুন্নীবিবি ওর নিজের জীবনের কাহিনী শোনাল, তাই শুনে আরো মনখারাপ হয়ে গেল। ওর সঙ্গেই তো যা হোক দুচারটে কথা বলেছিলাম। আবার এমনই যোগাযোগ যে ঠিক ঐ দিনটিতেই জানলার ওপারে ঐ বাড়িতে বোকা সাঁওলের বউটা পুড়ে মরল। আরো সব কি কি যেন হয়েছিল যারজন্য তখন আমার কেবলই কান্না পাচ্ছিল, কথা বলতে মোটে ইচ্ছেই করছিল না। তারওপর আবার শুনলাম আপনি নাকি বিয়ে করতে চাননি, কথা বলব কি করে কথা বলার মত সাহসই ছিলনা আমার।'

'দেখ প্রভা, কোন কথা লুকোতে পারবে না কিন্তু, আজ যখন সব কথা বলতে বসেছ। তুমি আমাকে কথা দিয়েছ সব খুলে বলবে, এখন পাশ কাটিয়ে যেওনা, আমি সত্যি জানতে চাই।' আমার কোমল অনুরোধভরা স্বর যেন অজান্তেই কেঁপে গেল। একটু সরে গিয়ে ওর উরুর ওপর মাথাটা রেখে চিৎ হয়ে শুলাম। হঠাৎ মনে হল ও যদি এক ঝটকা মেরে মাথাটা সরিয়ে দিয়ে ঝলসে ওঠে, ওঃ ভারি প্রেম দেখাতে এসেছেন এখন! একটা মাংসল উষ্ণতার স্বাদ আমার মস্তিষ্কের শিরা উপশিরার মধ্যে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে।

'থাক না এখন এসব কথা,' অন্ধকার ঘরে ওর মুখখানা আবছা ছায়ার মত দেখাচ্ছে, কিন্তু সহসা আমার কপালে ঝরে পড়ল দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু, আর চমকে উঠলাম আমি। ওর মুখখানি নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে স্নেহের সুরে একটু বকুনি দিয়ে বললাম, 'এই, কি বোকামি হচ্ছে শুনি? চব্বিশ ঘন্টাই কেবল কাঁদবে নাকি?' খুব আলতো করে ছোট্ট একটা চাপড় দিলাম ওর গালে। ওর অধরে খেলে গেল লজ্জিত স্মিত হাসির রেখা, যা ছিল কল্পনা তা আজ আমার চোখের সামনে রূপ নিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা সরিয়ে নিলাম আমি। মনে পড়ে গেল এই গালে এই হাত দিয়েই মেরেছিলাম সেই মারাত্মক চড় যার আঘাতে ও জ্ঞান হারিয়েছিল। তাও কিনা সেই মাটির ঢেলাটার জন্য যেটাকে পণ্ডিত গণেশ বানিয়েছিল। আলো থাকলে দেখতাম সেই পাঁচ আঙুলের দাগ এখনও আছে না মিলিয়ে গেছে। মনে হল প্রভারও বোধহয় সেদিনের কথা মনে পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বিষয়টা পাল্টে ফেলার জন্য আমি বলে উঠলাম, 'আচ্ছা প্রভা, মা আর ভাবী দুজনেই তোমার ওপর এত খাপ্পা কেন বলত?' প্রথমটা প্রভা কোন উত্তর দিলনা, তারপর ঢোঁক গিলে বলল, 'আমি কি করে জানব? এই হয়ত আমার কপালের লেখা, তা ছাড়া আর কি বলব?'

'প্রভা, আমার দিব্যি, আজ এখন আমি যা যা জানতে চাইছি সব ঠিকঠাক বলতে হবে তোমায়। তখন থেকে কেবল ভাগ্য আর কপাল এই সব বলে চলেছ, ওসব চুলোয় যাক'। জীবনে এই প্রথম আমি ভাগ্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলাম।

'এটা কিন্তু ভারি খারাপ অভ্যাস, কথা বলা আরম্ভ হতে না হতেই এইসব 'আমার দিব্যি' 'তোমার দিব্যি' শুরু হয়ে গেল?' ও বলল কপট বিরক্তির ভাব দেখিয়ে। ওর হাত দুখানি এতক্ষণ আমার তপ্ত কপালের ওপর নিশ্চল হয়ে ছিল এখন সেগুলি আস্তে আস্তে সঞ্চারিত হচ্ছে আমার এলোমেলো চুলের মধ্যে। কত বোতল মদিরার নেশা যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার সমস্ত শিরা উপশিরায়। আঙুল দিয়ে চুলে বিলি কাটতে কাটতে ও বলে, 'মা, বাবুজীর অসন্তোষের কারণ তো স্পষ্ট বোঝা যায়, দেনাপাওনা ওঁদের মনের মত হয়নি। টাকাকড়ি, দামী গহনা কাপড় কিছুই তো আনতে পারিনি। তাই লেখাপড়া জানাটাও একটা দোষ হয়ে গেছে। মুন্নীবিবি তো আবার লেখাপড়ার কথাটা খুব প্রশংসা করে প্রচার করেছিল কিনা, তাছাড়া মাও চাপাগলায় বেশ খুশি হয়েই বলেছিলেন,

জিনিসপত্র কম আনলে কি হবে, দেখতে শুনতে কিন্তু বড় বউয়ের চেয়ে লাখোগুণে খাসা। তোমার ভাবীর রাগ হবার জন্য এই সব দু চারটে মন্তব্যই যথেষ্ট। সমস্তক্ষণ ও মায়ের কানে আমার নিন্দে করে চলেছে। আমি চুপ করে শুনে গেছি। কাকেই বা বলব, তুমিও তো রেগে থাকতে। কতবার মনে হয়েছে ঐ সাঁওলের বউয়ের মত...' গলা ধরে এল আর অবার দু চার ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল।

হাত বাড়িয়ে ওর মুখখানা ধরে আদরের বকুনি দিলাম, 'খবরদার প্রভা, এরকম কথা আর বলবেনা' তারপর ওর কণ্ঠ বেষ্টন করে মুখখানা নিচে নামিয়ে এনে ওর শীতল শুষ্ক ওষ্ঠাধরে এঁকে দিলাম একটি চুম্বন। এক চুমুক জ্বলন্ত ব্যাণ্ডি যেন নেমে গেল আমার মধ্যে, প্রতিটি শিরা ঝনঝনিয়ে উঠল বেজে। কম্পিত ভাঙা গলায় বলে উঠলাম, 'প্রভা এবারকার মত আমাকে মাফ করে দাও। আমার মাথায় কেন যে এমন ভূত চেপেছিল জানি না। জীবনে এই আমার শেষ ভুল করা। এস আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করে ফেলি — আমরা কখনও ঝগড়া করব না — কখনও না। যার যা খুশি বলুক...।' প্রভার গাল আমার ঠোঁটের ওপর নেমে এসে কথা থামিয়ে দিল। চোখের জল আবার ঝরতে শুরু করেছে। আমি রাগ করে বলে উঠি, 'প্রভা আবার? তুমি ভারি দুর্বল!' কিন্তু তখনি কেউ যেন আমার মুখ চেপে ধরে। এইরকম ঝড় ঝাপটার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে যে অটল ছিল সে কিনা দুর্বল? মনে পড়ল গতরাতে প্রভা ছাদে বসে কাঁদছিল, সেই প্রথম ওকে কাঁদতে দেখলাম। তখন থেকে মনে প্রশ্নটা জেগেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা প্রভা, আর একটা কথার উত্তর দেবে?'

'হুঁ', আলগোছে সাড়া দিল ও।

'কাল তুমি কেন কাঁদছিলে? এতদিনের মধ্যে কখনও তো তোমাকে কাঁদতে দেখিনি। যে দিন চড় মেরেছিলাম সেদিনও বোধহয় তুমি কাঁদনি।'

এবার প্রভা একটু দৃঢ়স্বরে বলে উঠল, 'শুধু আমি কেন, যে কেউ হলেও কাঁদত। এতখানি বড় হয়েছি, আজ পর্যন্ত আমার চরিত্র নিয়ে কেউ একটি কথাও বলতে পারেনি। কিন্তু সেদিন যা শুনলাম...' হঠাৎ চুপ করে গেল। একটু পরে ভাবের আবেগে বলে ফেলল, 'তুমিও যেদিন আমার চরিত্রে সন্দেহ করবে সেদিন বিষ খেয়ে নেব'।

আমি স্তব্ধ। ওর সেই দৃঢ়তার সামনে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হল। চিন্তিত সুরে বলি, 'আমাদের বাড়ির আবহাওয়া প্রতিদিন নোংরা হয়ে চলেছে, কি করা যায়?' তারপর সান্ত্বনা দেবার জন্য ওকে বলি, 'তুমি নিশ্চয় ভাবছ লেখাপড়া শিখে শেষপর্যন্ত এ যেন একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছি।'

প্রভা চট করে কোন উত্তর দিলনা, অনেকক্ষণ চুপ করেই রইল, তারপর যেন দূর থেকে বলল, 'কষ্ট তো চিরদিন থাকেনা। তুমি পড়া শেষ কর, তখন তো অবস্থা ভাল হবে। তোমার কাছে কাছে থাকতে পেলে কুয়ো, খাল বিল কিছুতেই ভয় করবে না। একলা হয়ে গেলেই ভয় করে।' ওর আর্দ্র কণ্ঠস্বরের রোমাঞ্চভরা অনুভূতি আমিও অনুভব করলাম হৃদয়ের গভীরে।

'আচ্ছা, তুমি তো এত কথা জিজ্ঞাসা করলে, এবার আমি কি একটু প্রশ্ন করতে পারি?'

'না প্রভা, না, আমি তোমার একটি প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারব না। ধরে নাও আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, মাথার ঠিক ছিলনা আমার।' প্রভা 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে এসেছে এটা খুব ভাল লাগছিল।

ভোরবেলা প্রভাকে বললাম, 'যা হয়ে গেছে ভুলে যাও। আমারই সমস্ত দোষ। আমার অবস্থা যদি বুঝতে পেরে থাক তাহলে আমাকে মাফ করে দাও। আমাদের বাড়ির অবস্থাতো দেখছই। তুমি নিজে বুদ্ধিমতী, এই পরিস্থিতিতে কিভাবে আমাদের মানিয়ে চলতে হবে তা আমাদেরই ভেবেচিন্তে স্থির করতে হবে'। এই সব গুরুত্ব পূর্ণ সমস্যা নিয়ে এমনভাবে ভাবতে পারছি, কথা বলতে পারছি এটা আমার নিজেরও ভাল লাগছিল।

'এতে আমার আর বলার কি আছে? তুমি যা বলবে সেইভাবেই চলব।' আমার বাহুতে মাথা রেখে ছাদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার মতের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কিছু করেছি কি?'

'কিন্তু আমি তো চাই তুমি একটু বিরোধিতা কর, আমরা তর্ক বিতর্ক করে তারপর খুব ভেবেচিন্তে এক একটা সিদ্ধান্ত নিই।' কথাটা বলে তো ফেললাম, কিন্তু তখনি ভিতর থেকে কে যেন প্রশ্ন করল 'তোমার বিরোধিতা করে কিছু বললে তাতে কান দেবে তো?' তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'তোমার পরামর্শ ছাড়া আমি কোন কাজ করব না। বাড়ির পরিস্থিতি দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে না যে এ নিয়ে একটু আলোচনায় বসা দরকার? পরামর্শ দিতে ভয় পাচ্ছ কেন? লেখাপড়া শিখেছ, বুদ্ধিশুদ্ধিও আছে।'

'আবার সেই লেখাপড়ার খোঁটা?' প্রভা একটু জোর দিয়েই বলে ওঠে, 'তুমিও এ বাড়ির অন্যদের ভাষাতেই কথা বলবে? এই লেখাপড়া নিয়ে আমি যাই কোথায়? বাপ মা পড়িয়ে ফেলেছে তো আমি কি করব? যা কিছু শিখেছিলাম সব তো ভুলিয়ে দিয়েছ। কারো কাছে আজ পর্যন্ত পড়াশোনা নিয়ে গর্ব করেছি কি আমি?' গলায় আর্দ্রতা আর ক্ষোভ স্পষ্ট।

নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। এই নিয়ে একে এত খোঁটা খেতে হয়েছে, অথচ একটি কথারও জবাব দিতে পারেনি, তাই আর ও নিজেকে সামলাতে পারছে না। আদর করে ওর মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে বলি, 'আচ্ছা বাবা, এ সব কথা তাহলে বলব কোথায় বলতো? এতদিন মুখ বুজে থাকার শোধ নিচ্ছ বুঝি? একটা কথা মুখ থেকে খসেছে কি তেড়ে এসেছ, পুরোন মদের মত ঝাঁঝ এসে গেছে দেখছি।' ওকে খুশি করতে আরো একটু যোগ করি, 'জানতো ও জিনিস একটু খেলেই এমন নেশা ধরে যায় যে সারাজীবনেও ছাড়া যায়না।'

রুক্ষস্বরে ও বলে ওঠে, 'ওসব কথার মানে আমি বুঝি।' তারপর বোধহয় নিজেরই

মনে হয় কথাটা একটু বেশী কড়া হয়ে গেছে, তাই একটু লজ্জার ভাব দেখিয়ে বলে, 'এই দু দিনে তুমি তো দেখছি নামকরা সিনেমা অ্যাকটরদের চেয়েও এক্সপার্ট হয়ে গেছ। যে সব আলোচনা হচ্ছিল তা তো চুলোয় গেল, এখন এইসব আজেবাজে কথা বলা হচ্ছে।' 'এক্সপার্ট' শব্দটা খট করে বাজল কানে। প্রভা শিক্ষিতা এই কথাটা এতবার বলা হয়েছে যে অর্থটা যেন হারিয়ে গিয়েছিল। ঐ শব্দটা কানে যেতেই এই প্রথম যেন অনুভব করলাম ও কোন গ্রাম গঞ্জের বদ্ধ পরিবেশে মানুষ হয়নি, ও শহুরে পরিবারের একমাত্র কন্যা। কিরণের সাজসজ্জার কায়দা, কথাবার্তা চালচলন দেখে আমার প্রায়ই মনে হত, আহা আমার বউ যদি এমন বুদ্ধিমতী আর রুচিসম্পন্না হত! এই প্রসঙ্গে প্রভার কথা কখনও মনেই পড়ত না। ও তো একটা নগন্য জীব, ঘরের কাজকর্ম করে, তার বেশী ওর সম্বন্ধে কিছু ভাবতামই না। এখন মনে পড়ল এ বাড়িতে এসে সিনেমা দেখা তো দূরের কথা একটা সিনেমার পোস্টার পর্যন্ত ও দেখতে পায়নি। গল্প, উপন্যাসের একটি লাইন পড়তে না পেয়ে কত ছটফট করেছে মনে মনে। শহুরে মেয়েরা স্বপ্ন দেখে, কত সখ সাধ থাকে তাদের! এ বেচারীর সব সখ সাধ এ বাড়ির চারদেওয়ালের মধ্যে কবর দেওয়া হয়ে গেছে। দিবাকরদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের বাড়ির•প্রভেদটা আজ বড় স্পষ্টভাবে চোখে পড়ল। ওদের বাড়িতে লেখাপড়া জানাটা একটা দোষ বলে গণ্য হয়না অন্তত। আমাদের বাড়িটা কি কখনও ওরকম হতে পারবে? আমি কি কোনদিন প্রভাকে ডেকে বলতে পারব, 'আজ সন্ধ্যায় চল বেড়িয়ে আসি। দিবাকর আর কিরণের সঙ্গে চা খেতে যেতে হবে।' কিন্তু...কিন্তু, আর বেশীদূর চিন্তা এগোল না। একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল শুধু।

দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে চমকে উঠে প্রভা বলল, 'আবার কি ভাবছ?' তারপর ঝুঁকে পড়ে আমার চুলে হাত বুলিয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা কি বলছিলে বল, অ্যাকটরের কথা বলেছি বলে কিছু মনে করলে নাকি?'

আমি চুপ করেই আছি। ঝুঁকে পড়া মুখখানা দেখছি খুব মন দিয়ে। কেন জানিনা হঠাৎ মনে হল ও যা বলছে আর যা কিছু করছে তা বোধহয় অন্তর থেকে করছে না। হয়ত ভাবছে, এর সঙ্গে যখন বাঁধা পড়েছি তখন ঘর তো করতেই হবে। মনে মনে নিশ্চয় ও আমাকে নিজের যোগ্য বলে মনে করেনা। 'বলনা গো', আবার অনুনয়ের সুরে বলে প্রভা, 'আমি তোমার একশটা কথা শুনব, তুমি কিন্তু আমার একটি কথা মেনে নিও। আমার খুব বক বক করা অভ্যাস, যা মুখে আসে বলে ফেলি। দোহাই তোমার, আমার কোন কথায় তুমি রাগ কোরনা। কি বলা উচিত, কোনটা বলা উচিত নয় সে সব আমার খেয়ালই থাকেনা। পরে আপশোস করে মরি। এতদিন চুপ করে ছিলাম তো, তাই এখন খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। রমাও বলে আমি খুব বাজে বক বক করি।'

ওর কথায় কিছুই মনে করিনি আমি। আমার নিজের কথা ভেবেই মনটা বিষণ্ণ

হয়ে উঠছিল। সত্যিই এ মেয়ের যোগ্য আমি নই। যাই হোক, উপস্থিত প্রশ্ন করলাম,'রমা কে?'

'আমার এক ক্লাস ফেলো' মহা উৎসাহে ও রমার সম্বন্ধে যাবতীয় খবর দিতে শুরু করল। শেষে বলল 'গতবার যখন গিয়েছিলাম তোমার সম্বন্ধে কত যে প্রশ্ন করছিল। আমরা তো ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু মেয়েদের মধ্যে ছিলাম কিনা। আমার একেবারে প্রাণের বন্ধু ও। মেয়েদের মধ্যে এত গভীর বন্ধুত্ব হয় না! আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম, কোনদিন বিয়ে করবনা, ভাল করে লেখাপড়া শিখে গ্রামে চলে যাব, সেখানকার মেয়েদের লেখাপড়া শেখাব। কখনও ভাবতাম খুব সামান্য জিনিসপত্তর নিয়ে পায়ে হেঁটে সারা ভারত 'ট্যুর' করব আর ডায়রীতে খুব বিস্তারিত ভাবে তার বিবরণ লিখব। নতুন নতুন শহর, গ্রাম, কতরকমের মানুষের সঙ্গে চেনাজানা হবে। গুণ্ডা বদমাশ আর জংলী জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা লাঠি আর ছোরা চালাতে শিখব সে পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। আরো কত কি যে বসে বসে ভাবতাম আমরা। ঘরে বাইরে সবাই বেশ বিরক্ত হত, ভাবত, এত কি গল্প করে এরা, কথা যে এদের শেষই হয়না। আমরা ইচ্ছে করেই ওদের আরো রাগিয়ে দিতাম'।

হঠাৎ ওকে কথার মাঝখানে থামিয়ে প্রশ্ন করে বসলাম, 'আচ্ছা প্রভা, বিয়ে করে তোমার খুব আপশোস হচ্ছে, তাই না?'

চমকে উঠে প্রভা বলে, 'কই না তো, আমি কি তাই বললাম নাকি?' খিল খিল করে হেসে উঠল প্রভা, 'দেখছ কি রকম বাজে বক বক করি আমি? আমাকে থামিয়ে দিও তুমি। কি যে করি, আমার যে খেয়ালই থাকে না, এই না মুশকিল।' অনেকক্ষণ ধরে হাসল ও। ওর এই খোলামেলা হাসি আমার ভালও লাগছিল আবার আশ্চর্যও হচ্ছিলাম এই ভেবে যে এত কিছু সহ্য করার পরও ও কেমন অবাধে হাসতে পারছে, গল্প করতে পারছে। আমি তো কখনও এমনভাবে হাসতে পেরেছি বলে মনে পড়েনা। হঠাৎ ও আমার মুখ ওর দু'ই করতলের মধ্যে ধরে বলে উঠল, 'শোন, আমি যা যা বলেছি সব ভুলে যাও। এখন থেকে, তুমি খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করবে এই শুধু আমি চাই। আমাকে যেমন বলবে আমি ঠিক সেইভাবেই চলব।'

দিবাকরের কথা আর বাবুজী যা যা বলেছেন সব মনে পড়ে গেল। বললাম, 'প্রভা, একটা ব্যাপারে পরামর্শ চাই'।

'বলেছি না, আমাকে পরামর্শ দিতে বোল না। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।'

'আরে, আগে শুনবে তো কথাটা। ভারি একেবারে বাধ্য মেয়ে হয়েছেন,' কপট রাগ দেখিয়ে বলি আমি, 'শোন, আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম দিবাকর। সেও খুব ধরেছে যে আমাকে থার্ডইয়ারে জয়েন করতেই হবে। এদিকে ভাইসাব আর বাবুজী চাইছেন যে আমি কোথাও একটা চাকরি শুরু করে দিই, যাতে সংসারে একটু সাহায্য হয়। কি যে করি মাথায় আসছে না, তুমি কি বল?'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল প্রভা, যেন আমাকে আরো কিছু বলবার অবকাশ দিতে। তারপর বলল, 'এ বিষয়ে আমি কি পরামর্শ দিতে পারি? তোমার যা উচিত মনে হয় তাই কর।'

বেশ বুঝলাম ওর যা বলতে ইচ্ছে করছে সেটা ও বলল না। 'নিজের যা উচিত মনে হচ্ছে তাই করতে পারলে আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করব কেন? আমি যা সিদ্ধান্ত নেব তার ওপর কেবল আমার নয়, অন্যদেরও অনেক কিছু নির্ভর করছে। এতদিন তো নিজের কাছে এবং সংসারের কাছেও আমার লেখাপড়াটা একটা অজুহাত ছিল। এখন আর সেটা চলবে না। যা দেখা যাচ্ছে পড়া চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হবে না। এতদিন কেঁদে কঁকিয়ে কোনমতে চালিয়ে এসেছি তাই যথেষ্ট। বাড়িতে এই মুহূর্ত থেকেই সাহায্য করা দরকার। কোন পথই দেখতে পাচ্ছিনা আমি।' প্রভা একটা হাই তুলে বলল, 'তাহলে কিছু কাজই কর।' 'এত অনিচ্ছা দেখিয়ে বলছ কেন?' আমি বললাম, 'আমাব কথা তোমার পছন্দ হচ্ছেনা তা আমি জানি। কিন্তু কি করব বল? আর চাকরী? বলা খুব সহজ কিন্তু একবার বাইরে বেরিয়ে দেখলে বুঝবে একটা চাকরী পাওয়া কি ব্যাপার। কত শত ইন্টারমিডিয়েট আর বি.এ. পাশ ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে, কারো এক কানাকড়িও জুটছেনা। বহু চেষ্টা করলে হয়ত একটা চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার চাকরী জুটবে। সারাটা দিন কলম পিষতে হবে আর সন্ধ্যার পর গাঁঠরি বেঁধে ফাইলের বোঝা বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। কথাবলারও অবসর থাকবে না। রাত জেগে বসে বসে কাজ সারতে হবে। ভাইসাবের তো চাকরি জুটে গিয়েছিল যুদ্ধের সময়, তাই উনি ভাবেন আজকালকার দিনেও বুঝি অমন সহজে চাকরি পাওয়া যাবে। সে জমানা আর নেই। কিন্তু এসব কথা বোঝায় কে? আমারতো কিছুই মাথায় আসছে না। ভাল একটা ডিগ্রী থাকলে তবু চেষ্টা করে দেখা যেত। এখন লোককে গিয়ে বলব কি করে যে 'মশাই, আমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছি,' আর সে বেচারাই বা কি চাকরি দেবে আমায়! তুমি কিছু বলছ না কেন বলতো?'

'কি বলব বল? কোন ইস্কুলে একটা মাস্টারনীগিরির চেষ্টা করব নাকি?' ঠাট্টার সুর ছলকে উঠল ওর গলায়। আমাদের বাড়ির হালচাল সম্বন্ধে যেন ইঙ্গিত করল ও।

আঁতকে উঠে বললাম, 'বাড়িছাড়া হতে চাও নাকি? মা আর ভাবীর কানে যদি একথা যায় তাহলে এমন ঝড় উঠবে যে ঘড়ি পরে রান্না করতে যাওয়ার দিনটাও ভুলে যাবে তখন। কিন্তু বাড়ির এই পরিস্থিতি এবং নিজেদের নিরুপায় অবস্থার কথা ভেবে রাগও হচ্ছিল, 'সত্যি প্রভা, মাঝে মাঝে এত খারাপ লাগে, এখান থেকে পালাতে ইচ্ছে করে আমার। তোমারও নিশ্চয় মনে হচ্ছে, কি এক অকর্মণ্য লোকের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছ। সত্যি বলছি, তোমার অবস্থা চোখে দেখা যায় না। আরাম স্বাচ্ছন্দ্য তো দূরের কথা, পরবার মত শাড়ী পর্যন্ত নেই তোমার। আমার নিজেরও কাপড় চোপড় কিছুই নেই'।

'আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবেনা, অনেক আছে আমার।'

কিন্তু ওর কথায় আমি কান দিলাম না। বললাম, 'দিবাকরের ওয়াইফ কবে থেকে বলছে তোমাকে একদিন নিয়ে যেতে। কিন্তু নিয়ে যাব কি করে? কোনদিন সে নিজেই না এখানে চলে আসে এই ভয় করে আমার।' দিবাকরকে কেন যে সেদিন বলতে গেলাম প্রভা এখানে এসে গেছে। যদি ওরা হঠাৎ এসে হাজির হয় বসতে দেব কোথায়?

প্রভাও ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'ওমা, সত্যি? না না, এখানে এনো না, এখানকার সব কিছু দেখে কি বলবে? তাদের আদর যত্ন করব কি দিয়ে?'

'আমিও তো সেই কথাই ভাবছি। মাঝে মাঝে এত রাগ হয়। মনে হয় যার যা খুশি বলে যাক, কারো কথায় কান দেবনা। খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করব আর তারপর একটা ভাল চাকরি জোগাড় করে বেশ ভদ্রলোকের মত থাকব। এখন যত টাকার চাকরি জুটবে তখন তো ততটাকা অনায়াসে সংসারে দিতে পারব।' যেন স্বপ্নের ঘোরে বলে চললাম, 'কত লোকের জন্য চিন্তা করব? সবাই তো নিজের স্বার্থ দেখছে, যে যার নিজের ভাগ্য নিয়ে এসেছে। কিন্তু অন্তর সায় দেয়না, মা বাপের প্রতিও তো কর্তব্য আছে।' ভাবতে লাগলাম আমি।

ভোরের আলো ফুটে উঠছে আকাশের পটে। প্রভা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙছে, অর্থাৎ এবার ওর যাবার সময় হল। উঠতে উঠতে বলল, কিন্তু ভাল চাকরি যদি কর তাহলে তো সেই কর্তব্য আরো ভালভাবেই পালন করতে পারবে, তাই না?

ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। প্রভার এই কথাগুলোর অর্থ ঠিকমত বোঝার চেষ্টা করছি।

তিন

কোন পথ নেই, কোন সমাধান নেই এ সমস্যার, কেবল দম আটকে মর, ছটফট কর, থামের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদ বসে বসে আর ঘুণপোকার মত দিনরাত নিজের অন্তরটাকে কুরে কুরে জীর্ণ করে ফেল। এমন কি একটা রাস্তা নেই যাতে এক ধাক্কায় এই সব কিছুকে শেষ করে ফেলা যায়? ধর যদি এইরকম ভাবে নাক বরাবর সিধে কেবল চলতেই থাকি, চলতেই থাকি..তবে কেমন হয়? উঃ কি যে বিদঘুটে সব চিন্তা আমার মাথায় আসছে! এখন আরো একজনের ভবিষৎ আমার জীবনের সঙ্গে জড়ানো আছে সে কথা তো অন্ততঃ খেয়াল রাখা উচিত। এখন একলা কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া

আমার উচিত নয়। কিছু একটা নিশ্চয় হবে, এত তাড়াতাড়ি হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

ভয় হচ্ছিল এত দেরিতে ফেরার জন্য বাড়িতে বকুনি খেতে হবে। এতক্ষণে সেখানে আবার কি কি ঘটে গেছে কে জানে! অন্যমনস্কভাবে ফিরে চলেছি, এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জের বিল্ডিং পেছনে পড়ে রইল, কোলাহল ক্রমশঃ মৃদু হয়ে এল।

ব্যাপার হল এই যে, দিন দুই আগে খুব ভয়ে ভয়ে ভাবীকে বলেছিলাম, 'ভাবী তোমার কাছে সাধারণ একখানা শাড়ী হবে?'

'শাড়ী কি করবে?' ভাবী ঠিকই বুঝেছে কিন্তু না বোঝার ভান করছে।

'থাকে তো প্রভাকে একখানা দাও। কেউ দেখলে কি বলবে? দেখতেও লজ্জা করে তো'। কোনমতে কথাগুলো বলে ফেললাম।

একটু কথা শোনাবার সুযোগ পেয়ে ভাবীর মুখে ফুটল বাঁকাহাসি আর চোখের দৃষ্টি হল কুটিল। ওর হাসির মধ্যে বিষের আভাস দেখেও দেখলাম না আমি। ভাবী বলল, 'দিব্যি গেলে বলছি ঠাকুরপো একখানাও শাড়ী নেই আমার কাছে। বিশ্বাস না হয়তো এসে আমার বাক্স দেখ,' দুহাতে বাচ্চাকে দোলাতে দোলাতে বলল, 'মায়ের কাছে নিশ্চয় দু একখানা আছে, একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ না?' মায়ের কাছে যাবার সাহস নেই বলেই তো ভাবীর কাছে চেয়েছিলাম। এবার একটু সাহস করতেই হল, নিজেকে বোঝালাম, এতে এত ভয় পাবার কি আছে? আমি আজকাল কথা বলি এটা তো সবাই জেনেই গেছে। একটু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে শেষপর্যন্ত মায়ের কাছে এসে বলে ফেলি, 'মা, তোমার কাছে এক আধটা শাড়ী আছে কি?' সোজাসুজি তাকাতেও সাহস হচ্ছিল না।

'কি রকম?' বলেই জিজ্ঞাসা করল 'এই তো সেদিন একটা পাৎলুন করালি?'

'আমার জন্য নয় মা, প্রভার জন্য বলছিলাম, ওর শাড়ী একেবারে ছিঁড়ে গেছে, ওর দিকে তাকানো যায়না।'

'ওঃ তাই বল বউয়ের জন্য চাই। অত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার দরকার কি?' প্রভার নাম শুনেই মায়ের মুখ বেজার হয়ে উঠল, মুখ বেঁকিয়ে বালিশের তলা থেকে চাবীর গোছা বের করে ছুঁড়ে দিল সামনে, 'যা ঐতো সামনে ঘর, কিছু পাস তো নিয়ে আয়। আমি কি দেখতে পাইনে? শাড়ী থাকলে আমি নিজে কি দিতাম না? সামনের মাসে পয়সা বাঁচলে আনিয়ে দেব এখন। তা, ওর নিজের কাছেও তো এক আধটা থাকার কথা!'

চুপ করে রইলাম। কি উত্তর দেব? যেতে যেতে খুব মৃদুস্বরে বললাম, 'ওর বিয়ের সময়কার এক আধখানা থাকে তো তাই না হয় দিয়ে দাও। লোকে দেখলে কি বলবে?'

মা এবার একেবারে জ্বলে উঠল, 'বিয়ের তো আছে ঘন্টা! তুই কি এখানে ছিলি না নাকি? বিয়েতে কত ঐশ্বর্য এসেছিল দেখিসনি? কত জন্ম আগে বিয়ে হয়েছে যে সেকথা

আবার মনে করিয়ে দিচ্ছিস? তখনকার সব জিনিস এখনও পড়ে থাকে নাকি? মুন্নীকে পাঠাবার সময় কত কিছু দিতে হল না? যখন বাপের বাড়ি গিয়েছিল তারা দেয়নি কিছু?' মায়ের রাগ বেড়েই চলল, উচ্চকণ্ঠে শুরু হল, 'বউয়ের সঙ্গে তুই কথা বলতে শুরু করে তো দেখছি খুব সুবিধে হল, এখন এই সব তুচ্ছ কথা নিয়ে একেবারে মাথায় চড়ে বসবে। তোর একলারই বউ আছে, আর কারো নেই? সোজাকথা বলনা যে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছে। ওরে, আমি ওর হাড়হদ্দ সব জানি। ও মোটেই সোজা মেয়ে নয়, চাপা বজ্জাত। এতদিন ধরে ইস্কুলে ঐ সব তো শিখেছে — কে আপন, কে পর... এই সব।'

আরও কতক্ষণ মায়ের বক্তৃতা চলত কে জানে। বাবুজী এসে ধমক দিলেন, 'কি হয়েছে কি? এত চিৎকার কিসের? বাইরের ঘরে কেউ এল, গেল কি কেউ বসে আছে সে কথাটা একটু খেয়াল রাখতে পারনা? শুনতে পেলে কি ভাববে? এ বাড়িতে এক মুহূর্ত শান্তি নেই, সবসময় ঐ...।'

মা ওঁর কথায় কান না দিয়ে তেমনি উচ্চকণ্ঠেই বলে ওঠে, 'তোমার আদরের ছেলে বউয়ের হয়ে ওকালতি করতে এসেছেন যে। বিয়ের জিনিসের হিসেব চাইছেন। বিয়েতে যে কাপড় চোপড় এসেছিল সব দিয়ে দাও। এই কাপড়ে বউয়ের লজ্জা করছে! জিজ্ঞেস কর ওকে বিয়েতে কি এত কিংখাবের থান এসেছিল?'

বাবুজী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, তারপর ঘৃণাভরে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'একপয়সা রোজগারের মুরোদ নেই, আবার বউয়ের হয়ে ওকালতি! লজ্জা করেনা? ছিঃ এমন বেহায়াপনার মুখে থুথু দিতে হয়! আর একটা ভাই রয়েছে, সে বেচারা মরে যাচ্ছে খেটে খেটে। এঁকে লেখাপড়া শেখানো হল এবার যতরকম ফ্যাশন করার ব্যবস্থাও করতে হবে! অন্ততঃ নিজেদের খরচটুকু নিজেরা কর, কিছুটা তো বোঝা হালকা হোক। মানুষের নিজেরই তো বিবেচনা করা উচিত...। কথাটা শেষ না করেই বাবুজী বৈঠকখানায় ফিরে গেলেন।

বাবুজীর মেজাজ দেখে, অথবা নিজে যা বলতে চাইছিল তার চেয়ে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ করে বলা হয়ে গেছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মা একেবারে চুপ করে গেল। মার খাওয়া মুখ নিয়ে আমি নিঃশব্দে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। মায়ের কাছে কেন যে গেলাম। ভাবী নিশ্চয় জানত যে এই হবে। ওকে একদিন দেখে নেব আমি। নিজে কিছু বলবার সাহস নেই, একে ওকে লাগিয়ে দেয়।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে প্রভা ঘরে এসে হাজির, এসেই বলল, 'ওখানে গিয়ে এইসব কাণ্ড বাধাতে কে বলেছিল? আমার শাড়ী ধুতি কিছু চাইনা, বাক্সভর্তি রাখা আছে। ভাল দামী শাড়ী পরে ঘরের কাজ করলে শাড়ী খারাপ হয়ে যাবে তাই পরিনা। সাতসকালে ঝগড়া বাধাতে গেলে কেন? তুমি যখন কাজ করবে, সব পরব আমি। ঐ দারুণ শীত এই কাপড়ে কাটিয়ে দিলাম, এখন কি এতে মরে যাব নাকি? তোমার দেখতে যদি এত

কষ্ট হয় তাহলে না হয় এখনই বের করে পরে নিচ্ছি। কোথাও যেতে আসতে দরকার পড়বে বলে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমায় হাত জোড় করে বলছি, পায়ে ধরে বলছি ওখানে গিয়ে ঝামেলা বাধিও না। তুমি তো বলে কয়ে কেটে পড়বে, তারপর আমাকে ওরা ছিঁড়ে খাবে'।

আমি ব্যাকুল ক্ষোভের স্বরে বলে উঠলাম, 'ঠিক আছে প্রভা, এখন যাও তুমি। আমি কিছু উল্টোপাল্টা বলে ফেলব তখন তুমি রাগ করবে।' প্রভার গলা ধরে এল, 'আজ পর্যন্ত কোনদিন আমাকে রাগ করতে দেখেছ?'

এই সময় নিচে থেকে তারস্বরে কেউ চেঁচিয়ে উঠল, 'বলি, গেলে কোন চুলোয়? ডাল ফুটে ফুটে উথলে পড়ছে,...ডালটা নামিয়ে রেখেই না হয় বরের সঙ্গে গল্প করতে যেতে...'

প্রভা কলাপাতার মত থরথরিয়ে কেঁপে উঠে ছুট দিল নিচে। আমি বসে বসে চিন্তায় পুড়তে লাগলাম — রোজগার কর!...কুয়ো খোঁড়, উনুন ধরাও, যাহোক কিছু একটা করে রোজগার করে নিয়ে এস...। আহা হঠাৎ যদি কোথাও একটা ভরাভর্ত্তি কোষাগার পাওয়া যেত, এদের সবাইকার নাক পর্যন্ত টাকায় ঠেসে দিতাম — বলতাম, নাও টাকা চিবিয়ে চিবিয়ে খাও। ছোটবেলার একটা কল্পনা আজ এতদিন পরে মনের মধ্যে আবার চাড়া দিয়ে উঠল...চলতে চলতে হঠাৎ যেন কিসে ঠোকর খেয়েছি, ইঁটপাথর ভেবে প্রথমটা খেয়াল করিনি, হঠাৎ ফিরে দেখি কিসের যেন একটা ঢাকনার কানাটুকু মাটির ওপর দেখা যাচ্ছে। পা দিয়ে মাটি সরাতে সরাতে হঠাৎ দেখি, আরে এতো একটা ভারী পিতলের ঘড়ার ঢাকনা, আর তার মধ্যে একরাশ গিনি, সোনারূপোর গয়না ভরা। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চুপিচুপি ঘড়াটা টেনে তোলার চেষ্টা করছি, অথবা কোথাও লুকিয়ে বসে অধীরভাবে রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করছি, নিজের সেই ছবিটাও চোখের সামনে ভেসে উঠছে, আবার হাসিও পাচ্ছে নিজের এই অসম্ভব কল্পনার কথা ভেবে। যারা রাস্তা তৈরী করে তারা তো কত গভীর করে প্রথমেই খুঁড়ে ফেলে। মাটিতে পোঁতা গুপ্তধন একজায়গায় স্থির থাকে না, চলে ফিরে বেড়ায় এটাও যদি বিশ্বাস করে নিই, তাহলেও পুলিশে আর উটকো লোকে এসব জিনিস কি আর পড়ে থাকতে দেবে, কবেই সে সব সাফ করে ফেলবে।

নিজের বোকা বোকা চিন্তার বহর দেখে নিজের ওপরই চটে যাই — বসে বসে যত ফালতু চিন্তা। প্রশ্নটা হচ্ছে, এখন কি করা যায়। ধর, রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা না করেই কপাল ঠুকে চাকরী খুঁজতে যদি বেরিয়ে পড়ি — কিন্তু যাব কোথায়? কিন্তু যাই হোক, যেমনই হোক আজ ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখতেই হবে। এ ভাবে চলতে পারেনা।

কাগজপত্রের নিচে থেকে ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেটখানা বের করে গোল করে পাকিয়ে পকেটে ফেলে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম। মা যথারীতি কোন একটা ছুতোয় প্রভাকে বকে চলেছে। আর কোন কাজকর্ম তো নেই, পূজো করা আর বকর বকর করা।

আমাকে বেরোতে দেখেই পিছন থেকে বলে উঠল, 'আবার চললেন, খেয়ে গেলেই তো হত, খাবার কতক্ষণ পড়ে থাকবে? কাল এক হাঁড়ি ডাল ফেলা গেল! রুটিগুলো তো রোজ মেথরাণীকে দিয়ে দিতে হয়...'।

এটা কি বাড়ি না হোটেল। সব সময় ঐ এক কথা। এক মুহূর্ত কেউ শান্তিতে থাকতে পারবে না এখানে। নিজেরা তো কোন কিছু ভাবেই না, কিছু বলতে যাও তো তৎক্ষণাৎ ঝগড়া বেধে যাবে। প্রভাব জন্য কাপড় চেয়েছিলাম, এতে এত দোষ ধরার কি আছে? এখন প্রভাও এসে আমাকে বকে গেল, আমার কত খারাপ লাগল। কিন্তু বাবুজীর কথাগুলো তো তীক্ষ্ণ বল্লমের মত সমস্ত হৃদয় এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেছে। আর এই তো মা! রুটি মেথরাণী কে দিতে হয়. ! শান্তিতে বসে কাউকে খেতে দিলে তবে তো...। সেদিন কিরণ যখন নিজের শাশুড়ী সম্বন্ধে অবজ্ঞা দেখিয়েছিল, বেশ খারাপ লেগেছিল আমার। আজ মনে হচ্ছে ঠিকই করেছিল কিরণ। এমন সৎমায়ের মত ব্যবহার করলে মন তো বিষিয়ে যাবেই। মায়ের কাছে কাপড় চোপড় নিশ্চয় আছে, কিন্তু দেবে কেন? সে সব রাখা আছে ওঁর আদরের বউয়ের জন্য। তার স্বামী যে রোজগার করে, তাই সারাটাদিন সংসার বেশ একটা দাসী পেয়েছে যাকে জন্তুর মত খাটানো চলে। তার খাওয়াদাওয়ার দিকেও দেখার দরকার নেই। ইচ্ছে হলেই তাকে ধমকানো চলে, সে বেচারা যে বেকার চাকরীবিহীন স্বামীর স্ত্রী।

পথে বেরিয়ে তো পড়লাম, কিন্তু দাঁড়িয়ে ভাবছি। কেন যে বেরিয়েছি, কোথায় যাবার জন্য তা মনে পড়ছে না। তবে হ্যাঁ, এটুকু খেয়াল আছে কেউ যেন দেখে না ফেলে। কপালে অনেকক্ষণ আঙুল ঠুকে ঠুকে মনে করার চেষ্টা করলাম। কি হল আমার? মাথাটা কি...? দূর থেকেই দেখতে পেলাম এমপ্লয়মেন্ট এক্সজেঞ্জের উঁচু বিল্ডিংটায় প্রায় হাজার দুই লোকের ভীড়, কোলাহল শুনে মনে হচ্ছে মেলা বসেছে। বিল্ডিংএর সমস্ত গ্যালারি আর দরজাগুলো লোকে ভরা। চারপাশের কম্পাউণ্ডেও ঠেসে ভীড় জমে রয়েছে। মেহেদির বেড়া, ঘাসের লন, ফুলের কেয়ারী সব লোকের পায়ে পায়ে পিষ্ট হচ্ছে, বাইরের বাউন্ডারী পাঁচিলের গায়ে ভর দিয়ে আর একটা ডবল পাঁচিল তৈরী হয়ে গেছে। একে অন্যের কাঁধের পাশ দিয়ে ভিতরে উঁকি দেবার চেষ্টা করছে। সবাইকারই দৃষ্টি ঐ বাড়িটার দিকে। দেখেই মনে হচ্ছে কোন বড় গোছের নেতা এসেছেন এবং দিন দিন দেশের অবস্থার কত উন্নতি হচ্ছে সেই বিষয়ে সম্ভবত ভাষণ দিচ্ছেন — কোথায় কটা বাঁধ তৈরী হয়েছে, কতগুলো নতুন ফ্যাক্টরী খোলা হয়েছে, বিশ্বে ভারতের স্থান কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এইসব। আবার মনে হল, এখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? হয়ত আগুন লেগেছে, অথবা কেউ খুন হয়ে গেছে। কিন্তু চৌমাথায় পুলিশটা বেশ নিরুদ্বিগ্ন ভাবেই ট্রাফিককে হাত দেখাচ্ছে। সাইকেলওয়ালারা ভীড়ের মধ্যে ঢুকতে না পেরে সাইকেলে হেলান দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরের খবর জানবার চেষ্টা করছে। ভীড়ের কিনারে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই কে যেন কাঁধে হাত রাখল, 'এই যে স্বয়ংসেবকজী!'

চমকে ফিরে তাকালাম, তারপরেই শুনলাম, 'মাফ করবেন, আমার ভুল হয়েছে।'

মিহি মলমলের কুর্তার তলায় গেঞ্জির আভাস, পরণে পাজামা, রুক্ষচুল পিছনে উল্টে আঁচড়ানো, ফর্সা রং এক ভদ্রলোক। রোগা মতন মুখে ক্ষমাপ্রার্থনার হাসি নিয়ে বললেন, 'আপনাকে দেখে অন্য একজন বলে ভুল করেছিলাম।'

আমি হেসে বললাম, 'তাতে কি হয়েছে।' তারপর এঁকেই প্রশ্ন করলাম, 'এখানে আজ কি হচ্ছে জানেন নাকি?' লোকটির মুখখানা আমাকে জানিনা কেন বেশ আকৃষ্ট করছিল।

পাশেই একটা কালো রং এর টিনের নোটিসবোর্ড দেখতে দেখতে উনি বললেন, 'আজ বোধহয় এখানে মজুরদের ক্লার্কের চাকরির লোক নেওয়া হচ্ছে।' আমিও এবার ঝুঁকে পড়ে দেখলাম। ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত শত শত চাকরির নাম লেখা রয়েছে। প্রায় সবগুলোব পাশেই চক দিয়ে ক্রস চিহ্ন দেওয়া। ছুতোর মিস্ত্রীর পাশে লেখা — দশ ছুতোর, মজুরের পাশে লেখা — পঞ্চাশ মজুর আর ক্লার্কের পাশে লেখা — তিন ক্লার্ক। ব্যাপার দেখে বিস্ময়ে আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল — তেষট্টিটা চাকরির জন্য এখানে জমা হয়েছে তিন হাজার মানুষ! মনের মধ্যে বড়রকম একটা ধাক্কা লাগল।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে মাথাটি নিচু করে ফিরে এলাম বাড়িতে। না এই অগাধ ভীড়ের মধ্যে আমার জায়গা হবে না। দিবাকরের কথা একদম ঠিক, ভাল একটা ডিগ্রী না থাকলে ভাল চাকরীর আশা নেই। এখানে কি করতে পারি আমি? এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে কেউ হয়ত এমপ্লয়মেন্ট অফিসারের ভাগ্নে, কেউ ভাইপো, তাদের নামইতো আগে যাবে, আমার নয়। ঐ ভদ্রলোক কিছুদুর আমার সঙ্গেই হাঁটছিলেন, তিক্তস্বরে বললেন, 'দিনরাত তারস্বরে বক্তৃতা দিচ্ছে এই নেতাগুলো, এদের লজ্জাও নেই। বনমানুষের মত মুখ, গম্ভীরভাবে সব বলে, 'আমরা এখন স্বাধীন। দেশকে নতুন করে গড়তে আমাদের ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়ার চাই, ডাক্তার চাই, মেশিন চালাবার লোক চাই, বৈজ্ঞানিক চাই। বাংলো আর প্রাসাদগুলোর বাগান সবুজ রাখার জন্য মালী আর ওঁদের গাড়ি চালাবার জন্য ড্রাইভার। এই চাই, ওই চাই...চাই তোমাদের মাথা!'

ওঁর রাগ দেখে আমার নিজের দুঃখ খানিকটা যেন কমল। ঠিকই তো, যার অনেকদূর পড়ার ইচ্ছে বড় হবার ইচ্ছে, তার না আছে সঙ্গতি না আছে সুবিধা। তোমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, টেকনিশিয়ান এ সব কি যাদুমন্ত্রে সৃষ্টি হয়ে যাবে?

বড় হব, অনন্যসাধারণ হব, কতরকম মধুর স্বপ্নই না দেখতাম, বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম। কতরাতের ঘুম আর নিজের রক্ত দিয়ে পালন করা সেই সব স্বপ্ন — আমি কি হতে চাই। দয়ানন্দ থেকে শিবাজী, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, জহরলাল পর্যন্ত কে আমার আদর্শ ছিল না? নিজের জীবন তাঁদের আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা কি আমি করিনি? কতশত জীবনকথা পাঠ করে আমার সমস্ত দেহ মনপ্রাণ ভরে রোমাঞ্চের জোয়ার কি উঠত না? বাধাবিঘ্নগুলোকে রবারের বেলুনের মত এদিক ওদিক উড়িয়ে

দেবার উৎসাহে সর্বদা আমি টগবগ করতাম। বিয়ের আগে পর্যন্ত আমার ঐ সব স্বপ্নের দোলনায় দুলে দুলে কি সুন্দর দিনগুলো কেটে যেত। প্রভার সঙ্গে কথা না বলে আমি খুব প্রসন্নতা অনুভব করতাম, মনে হত যেন পথের কাঁটা আপনা থেকে সরে গেছে আর আমার কৃতারম্ভ আমার সামনে মহান হবার পথ খুলে দিয়েছে। মহান হয়ে উঠতে আর বেশী দেরী লাগবে না। কি বোকামি আর মুর্খতাই না করেছি। যত ভিত্তিহীন কল্পনাবিলাস। আর আমি কিনা বাস্তবকে ভুলে গিয়ে ঐ গুলোকেই সত্য বলে ভেবে এসেছি।

'আর মজার কথা এটাই যে, — সিগারেট ধরা হাতখানা একবার ঝেড়ে নিয়ে ভদ্রলোক বলেন, 'জীবন সফল আর মহান হবার রীতিপদ্ধতিগুলো স্কুল কলেজে আমাদের কাঁচা মগজে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে সেইসব শিক্ষা পাওয়া ছেলেরা ধরে নেয় তাদের প্রথম কর্তব্য হল একেবারে জহরলাল নেহরু হয়ে ওঠা, নাওয়া খাওয়া তার পরে। পঞ্চাশ বা একশ টাকা বেতনের মাস্টারগুলো এমন গোবরগণেশ, তাদের এটাও মাথায় আসেনা যে তারা নিজেরাও ঐ কথাগুলো পড়েছে আর ঐ মহান হবার চেষ্টা করতে করতে এসে এই ইস্কুলে হেডমাস্টারের লাথি ঝাঁটা খাচ্ছে। এদের এটা মনে থাকেনা যে তাঁরা সব ছিলেন বড় লোকের ছেলে, খাওয়া পরার চিন্তা তো ছিলনা, আপনা থেকেই 'তো নামকরা মানুষ হয়ে উঠেছেন।' ওঁর অন্যপথে যেতে হবে এবার। 'যদি কিছু ভুল বলে থাকি মাফ করবেন,' বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ওঁর কথাগুলো শুনে বেশ অবাক হচ্ছিলাম, সেই সঙ্গে এটাও মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন দেখেছি এঁকে। ঠিক মনে করতে পারছি না, ওঁর কথার উত্তরে বলে উঠলাম, 'না না ঠিক আছে'। ওঁর কথাগুলো এত খাঁটি যে আমার কোন ভবিষ্যৎও নেই, কোন জায়গাও নেই। রাগের চোটে পকেটের মধ্যে রাখা ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেটখানা খুব কষে মুচড়ে দুমড়ে ফেললাম।

কে জানে কতক্ষণ ধরে নিরর্থক ঘুরে বেড়ালাম আর কেবলই মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল কিছু করতে হবে, আমাকে কিছু একটা করতে হবে...নিজের জন্য না হোক প্রভার জন্য। কিন্তু ঘন্টার পিঠে ঘা পড়লে যেমন ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে তেমনি করেই বাজতে লাগল মনের মধ্যে...নেই, নেই, কোথাও কিছু নেই, আপনার বলতে কেউ নেই ...।

দুপুরের পর বাড়ি ঢুকলাম। দেখি পোস্টম্যানের কাছ থেকে কিছু নিয়ে অমর ভিতরে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম 'কারো চিঠি এলো নাকি রে অমর?'

অমর চমকে উঠে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। তোৎলাতে তোৎলাতে বলল, 'ছোটভাবীর চিঠি'।

'দাও, আমাকে দাও' হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলাম। ডাকের ছাপটা দেখলাম। প্রভার বাড়ির চিঠি নয়, পরিষ্কার বোঝা গেল না, মনে হচ্ছিল যোধপুরের ছাপ। যোধপুর থেকে কে লিখল? অবাক লাগছিল। কিন্তু চিঠি খোলার ইচ্ছে হলনা একবারও। আমি জানি এর আগে প্রভার কত চিঠি খুলে পড়া হয়েছে। অমরের মুখ দেখেও বেশ বুঝলাম আজ

রাতে এ চিঠি দস্তুর মত সেনসর করা হত তারপর যদি উচিত মনে করা হত তাহলেই তাকে দেওয়া হত।

চিঠিখানা নিয়ে ভিতরে এলাম। প্রভা এক কোণায় বসে আটা চালছে। যখনই দেখি তখনই প্রভা রান্নাঘরে আর নয়ত রান্নাসংক্রান্ত কোন কাজে ব্যস্ত এই একই দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রান্না খাওয়া সংক্রান্ত কাজের কি শেষ নেই? এখন আমার ইচ্ছে করছে ওর দুইহাত ধরে ওকে উঠিয়ে নিয়ে আসি, বলি, 'চল তো ঢের হয়েছে, বাকিটা অন্য কেউ এসে করবে।' কিন্তু সেই অন্য কেউটা কে? শুকনো ঠোঁট একটু ভিজিয়ে নিয়ে আস্তে কাছে গিয়ে বললাম, 'প্রভা, এই নাও তোমার চিঠি এসেছে।'

'কোথা থেকে' উল্লসিত হয়ে বলে ওঠে ও। চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে একটা কোণ ধরে ঠিকানাটা পড়ে উৎসাহভরে বলে ওঠে 'যোধপুর থেকে এসেছে, নিশ্চয় রমার চিঠি, কতদিন পরে লিখেছে। আমিও তো ওকে চিঠি লিখে রেখেছি, খাম ছিলনা তাই ডাকে দেওয়া হয়নি।' হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে কথার মধ্যেই থেমে যায়, তারপর প্রশ্ন করে 'তোমার শরীর ভাল আছে তো?'

'কেন, আমার শরীরের আবার কি হল?' আমি যেতে যেতে বলি, 'চিঠিটা পড়ে নাও, আটা না হয় পরে চেলে নিও।' চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ও বলে, 'এই শোনো, চিঠিটা আমার বাক্সে রেখে দাও না, রাত্রে পড়ব। এই নাও চাবী'। কোমরে গুঁজে রাখা আঁচলের প্রান্ত থেকে চাবী খুলতে খুলতে বলে 'এখন রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে, রান্নাও হয়নি এখনও।' এবার হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেছে - 'আচ্ছা, মশাই, আজ আপনি খেতে এলেন না যে বড়? আমিও যে এখনও না খেয়ে বসে আছি।'

আমি খুব নরম সুরে বলে উঠি, 'খিদে নেই প্রভা, আমি খেয়ে নিয়েছি।'

'আহাহা, আমি খেয়ে নিয়েছি!' ও রাগ দেখিয়ে বলে ওঠে. 'কি যে খেয়েছ সে আমার খুব জানা আছে। অন্ততঃ এটুকু তো ভাবা উচিত যে, কথায় কথায় রাগ দেখিয়ে আমি যদি না খেয়ে থাকি তাহলে আর একজনও উপোস করে বসে থাকবে।'

'সত্যি তুমিও খাওনি এখনও?' আশ্চর্য হয়ে বলে উঠি। আমার ব্যর্থতার সমস্ত ক্লান্তি আর অন্তরের সমস্ত ক্ষোভ যেন গলে জল হয়ে যায়, চোখের পাতা ভিজে ওঠে।

'তোমার আর কি? বেশ বাইরে ঘুরে টুরে এসে এতক্ষণে ফুসরৎ হল খোঁজ নেবার,' প্রভা বেশ রাগ দেখিয়ে আটা চালতে শুরু করল। কৌতুহলী মনে হাজার রকম প্রশ্ন উঠছিল — যখন ওর সঙ্গে কথা বলতাম না তখনও কি আমার অপেক্ষায় এইরকম না খেয়ে বসে থাকত? গলা ঝেড়ে কোনমতে বললাম, 'দাও, খাবার দিয়ে দাও'। সকাল বেলা বলা কথাগুলোর জন্য এখন নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল।

'বাসী খাবার খাবে নাকি? ও চটপট হাত চালাতে চালাতে বলল আধঘন্টার মধ্যে টাটকা বানিয়ে দিচ্ছি। আর শোনো, আমার বাক্সটা বেশী ওলটপালট করবে না কিন্তু।'

ওপরে উঠে এলাম। ঘরের এক কোণে রয়েছে ওর তোরঙ্গটা। খুলে চিঠিখানা

তার মধ্যে ফেলে দিলাম। তারপর কথাগুলো মনে পড়তেই তীব্র ইচ্ছা হল দেখিতো কি রেখেছে নিজের বাক্সে — নিজেকে দমন করতে গিয়ে কৌতুহল আরো তীব্র হয়ে উঠল — দেখলাম সুতী ও সিল্ক মিলিয়ে চার পাঁচখানা শাড়ী ব্লাউজ, কাগজ আর ছোটখাট কৌটো-বাটায় কে জানে কি সব রাখা। কাপড়গুলো সত্যি দামী, এ পরে দৈনন্দিন ঘরের কাজ করা যায়না। যে দিকে সবচেয়ে বেশী আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তা হচ্ছে দু তিনখানি বই। 'মায়া'র সেই সংখ্যাটি এখনও রয়েছে। তাছাড়া অন্যবইগুলি কোন আত্মীয়ের দেওয়া। মহিয়সী মহিলাদের জীবন চরিত একখানা, গান্ধীজীর আত্মকথা, একখানি নবযুবতীদের জ্ঞাতব্য তথ্যের বই এবং প্রেমচন্দের 'রঙ্গভূমি'। উপহারের লেখা ছাড়াও প্রতিটি বইয়ের এককোণে ওর নিজের হাতে লেখা — 'প্রভা'। 'রঙ্গভূমির' ভিতর থেকে একখানা কাগজ উঁকি মারছে। টেনে বের করে দেখি একখানা চিঠি। কার লেখা চিঠি দেখবার জন্য নিচেটা আগে দেখলাম, সেখানে দেখি প্রভারই নাম। প্রভার নিজের লেখা চিঠি এখানে কেন? কাগজখানা পুরো খুলে ভালভাবে লক্ষ্য করলাম, অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট কিন্তু চিঠিটা মনে হয় খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে। একবছর পরে আমি আমার স্ত্রীর নিজের হাতে লেখা চিঠি পড়ছি, সেও আবার অন্য কারো উদ্দেশ্যে লেখা। অন্য অনেকের থেকে আমার স্ত্রীর হাতের লেখা যে কত ভাল তা দেখে গর্ব হচ্ছে। চুরি করে চিঠি পড়তে গিয়ে ধরা না পড়ে যাই, তাই তাড়াতাড়ি পড়তে লাগলাম।

আর সেই চিঠির প্রতিটি অক্ষর আমার মনের মধ্যে কতক্ষণ ধরে যে গুঞ্জরিত হতে লাগল, মনে হচ্ছিল আমি চিঠিটা বার বার মনে মনে আবৃত্তি করছি না, আমি স্বয়ং যেন সেই রাতের অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে নিজের অন্তরখানা মেলে ধরছি কারো সামনে। কিছুদিন পরে তো আমার মনে হত যেন সত্যি সত্যি এত কথা আমি পড়িনি, আসলে চিঠিটা ছোটই ছিল আমার নিজের কল্পনায় তাকে আমি টেনে টেনে অনেক বড় করেছি। হ্যাঁ, এটা কিন্তু বেশ মনে আছে যে সমস্ত চিঠিখানা একবারে লেখা হয়নি, মাঝে মাঝেই লেখায় বিরতি পড়েছে, আবার নতুন আর এক কিস্তি লেখা হয়েছে। অনেকদিন পরেও সেই চিঠির যে বিস্তারিত রূপটি আমার মনে ছিল তা অনেকটা এই রকম —

প্রিয় রমা,

তোমার চিঠিটা যখন পেয়েছিলাম তখন আমি মায়ের কাছে ছিলাম। আবার যখন মায়ের কাছে যাব তখনই বোধহয় চিঠির উত্তর দিতে পারব। আমি সময় পাইনা বললে তুমি হয়ত ভাববে বাজে অজুহাত দেখাচ্ছি। কি করে বোঝাই তোমায় যে সত্যিই আজকাল আমি দম ফেলবার ফুরসৎ পাইনা। রোজ সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায় কিন্তু সত্যি বলছি সময় পাইনা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার কাজের তালিকা শুনতে চাও?

আমি জানি তোমার খুব রাগ হয়েছে, খুব খারাপ লাগছে। স্কুলে যখন তুমি রাগ করে পিছনের ডালিমগাছের তলায় গাল ফুলিয়ে বসে থাকতে আর আমি তোমার মান ভাঙাতে যেতাম, আজও হয়ত তেমনি করে চলে আসব এই বোধহয় ভাবছ তুমি। কিন্তু কি করে বোঝাব তোমাকে ভাই, আমি আর যেতে পারব না, কোনদিন যেতে পারবনা, যেতে চাইলেও যেতে পারবনা।

স্কুলের সেই সবচেয়ে দুরন্ত ডাকাত মেয়েটার অবস্থা আজ যদি তুমি এসে দেখতে। তুমি তো আমাকে বলতে সার্কাসে চাকরি নিতে। আমাদের চাওয়াগুলো যে কত অর্থহীন তা আজ আমি বেশ বুঝতে পারি। কত কিই যে চাই আমরা, চাওয়া তো আমাদের সীমাহীন। পৃথিবীর সব কিছু ভাল ভাল জিনিসগুলো চাইতাম যখন, সেই আমাদের স্কুলের দিনগুলোর কল্পনা, কতশত ভাবুকতা ভরা স্বপ্ন...। ভাই রমা তখন কেউ আমাদের কেন সাবধান করে দেয়নি, বলেনি কেন যে ওগুলো সব মিথ্যে? কোন মেয়ের বিয়ে হলে তার বর দেখতে গিয়ে আমি সবসময় ভাবতাম, আমার বর মোটেই এমন হবেনা। আমার স্বামী হবে, হয় প্রফেসার, নয়তো অফিসার আর না হলে কোন কোম্পানীর ম্যানেজার। খালি আমি আর সে থাকব, চারদিকে শাশুড়ী, জা, দেওর, ভাইপো, ভাইঝি এইসব কিলবিল করবে না। খুব বড় হাল-ফ্যাশানের বাড়ি হবে আমাদের। কোথাও কোন সুন্দর ফার্নিচার দেখতে পেলেই সেটা মনে মনে আমার সেই কল্পনার বাড়িটিতে সাজিয়ে ফেলতাম। ঝকঝকে পালিশ, সুন্দর পরদা, চারদিকে সদাবাহার মেহেঁদির বেড়ায় ঘেরা লন, তার মধ্যে টেনিস কোর্ট বা ব্যাডমিন্টন কোর্ট, তিনচারটে চাকরবাকর, ভোরবেলা সে আদর করে আমার ঘুম ভাঙাবে, বেলা পর্যন্ত ঘুমোনর জন্য মিষ্টি বকুনি দেবে, চা খেতে খেতে হাসি গল্পের মধ্যে দিয়ে সকালের খবরের কাগজ পড়তে অনেকটা সময় কেটে যাবে। কিন্তু তার অফিস চলে যাবার পর আমার সময় যেন আর কাটতেই চাইবে না। হয়ত কোন প্রতিবেশিনীর বাড়ি বেড়াতে যাব, নয়ত তাকেই ডেকে আনব বাড়িতে। সন্ধ্যায় রোজ বেড়াতে চলে যাব কোন বন্ধুর বাড়ি নয়ত সিনেমা দেখতে...এই রকম আরো কত কি কল্পনায় ডুবে থাকতাম, সব আর এখন মনেও পড়ে না।

কিন্তু ভাই কল্পনা যদি সত্যি হত তাহলে আর ভাবনা কি ছিল? আমাদের সব হাসি আনন্দের ওপর দাঁত বসায় ভাগ্য। আমরা যত কেঁদে মরি ভাগ্য তত হাসে খিলখিলিয়ে। ভাগ্য বেশ জানে পুতুল নাচের পুতুলের মত আমরা যতই নাচি কুঁদি, আসল দড়িটা টানছে তো এমন একখানা হাত যাব দয়া মায়া কিচ্ছু নেই। কাব্য করে বলতে গেলে বলা যায় কৈশোরের সেই সব স্বপ্নের প্রদীপ আজ বিষাক্ত ধোঁয়াব চাপে নিভে গেছে, এখন শুধু সেই বিষাক্ত ধোঁয়া ভয়ঙ্কর সাপের মত নেচে বেড়াচ্ছে চারদিকে। আগে আগে সাপগুলোকে ভয় পেতাম কিন্তু সত্যি বলছি রমা, এখন আর ভয়ও করেনা। মনে হয় ওরা আমায় কামড়াক। যন্ত্রণার এত নতুন নতুন রূপ নিত্য দেখছি যে আজকাল আর শিউরেও উঠিনা। অন্তরটা যেন জমে পাথর হয়ে গেছে। তা যদি না হত রমা, তাহলে এখনও বেঁচেই থাকতাম না, নির্ঘাৎ বিষ খেতাম অথবা কুয়োতে ঝাঁপ দিতাম।

এই দেখ, কেবল নিজের কথাই লিখে চলেছি, তোমার নিশ্চয় এসব পড়তে ভাল লাগবে না --- সে খেয়ালটুকুও নেই আমার। কিন্তু নিজের কথা কিই বা লিখেছি? আমি তো জানিই, নিজের কথা যদি কিছু লিখি তাহলে সে চিঠি তোমার কাছে পৌঁছবে না। এর চেয়ে বেশী কিছু লিখতে পারলাম না। এব চেয়ে বেশী কিছু জানতেও চেওনা এই অনুরোধ। তোমাকে দেখতে, তোমার কাছে বসে কাঁদতে আর তোমার কোলে শুযে শুয়ে নিজের অন্তর উজাড় করে সব কথা বলতে কি যে ইচ্ছে করছে তা লিখে বোঝাতে পারব না। ঈশ্বর কবে তোমার আমার দেখা হওয়ার সুযোগ ঘটাবেন দেখা যাক।

ইতি,
তোমারই প্রভা।

পড়া শেষ করে কতক্ষণ যে চিঠিটা হাতে ধরেই দাঁড়িয়েছিলাম খেয়াল নেই। হাতের মুঠি আলগা হয়ে চিঠিটা মাটিতে খ'সে পড়তে হুঁশ হল। চমকে উঠে চিঠিটা রেখে দিলাম

যথাস্থানে। বাক্সটা বন্ধ করতে করতে মনে হল একটি জীবন্ত প্রাণকে যেন খুন করে পুঁতে ফেললাম। অশ্রু মুছে ফেলি চোখ থেকে। প্রভা, আমার প্রভা, তুমি জান না আমারও স্বপ্নগুলো ঠিক এইরকমই ছিল, আমিও এমনি করেই ভাবতাম। তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী সম্বন্ধে তোমারও যেমন কল্পনা ছিল ঠিক তেমনি আমারও কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে এই চিন্তায় যে কিভাবে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব। তোমার স্বপ্ন দমবন্ধ হয়ে মরেছে, কিন্তু আমার স্বপ্নও কি আছাড় খেয়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়নি? কিন্তু আমি কার কাছে অভিযোগ করব? তুমি তো রমাকে লিখছ, ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছ, মুখ বুজে মনের কষ্ট সহ্য করে চলেছ। কিন্তু আমিও যদি তাই করতে থাকি তাহলে তো চলবেনা, কিছুতেই চলবে না। কিন্তু কেবলই আমার মনে হতে লাগল একটি হত্যার দায় যেন আমার আত্মার ওপর চাপানো রয়েছে, থাবার মত পাঁচটা আঙুল যেন চেপে ধরেছে। চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ যে দরজায় মাথা ঠুকলাম। সামনের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর পিছনে ধীরে ধীরে সূর্য নামছে পাটে, শহরের কোলাহল বেশ জোর শোনা যাচ্ছে, আকাশে উড়ছে দু চারটে ঘুড়ি, কাকেরা সার বেঁধে উড়ে চলেছে অস্তগামী সূর্যের দিকে।

সেই রাতে প্রভাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা প্রভা, তুমি কি চাও বল তো, ঠিক -ঠাক বলবে কিন্তু, আমাকে যা তা বলে ভোলাবার চেষ্টা কোর না, আমি কি আরো পড়ব না চাকরী করব?' সেই অচেনা ভদ্রলোকের কথাও মনে পড়ল আমার।

প্রভা একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'আমি যা কিছু চাইব তাই কি হওয়া সম্ভব নাকি? নিজেদের অবস্থাও তো বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু যদি মনের কথা জানতে চাও তো বলি, আমার ইচ্ছে তুমি অনেকদূর পড়াশোনা কর। অন্তত এম.এ.টা তো করেই নাও।'

'তারপর?', আমি আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাই। বোধহয় সেই চিঠির ভাষাই আবার শুনি — 'তারপর আবার কি, কোথাও একটা প্রফেসারী পেয়ে যাবে, নয়ত কোন ভাল চাকরি নেবে।'

'কিন্তু ততদিন সংসার চলবে কি করে? এম.এ. পাশ করা পর্যন্ত এই কচকচির মধ্যে কি বাঁচতে পারব?'

'কিন্তু এখন তুমি কি এমন চাকরি পাবে যাতে সংসারের সব কষ্ট দূর করতে পারবে?' বলে উঠল প্রভা, ওর মুখ বিষন্ন হয়ে উঠল, 'আমাকে দোষ দিওনা বাপু, তোমার যা উচিত মনে হয়, কর।'

'দোষ দেওয়ার কথা হচ্ছেনা প্রভা। আমি নিজে কি জানিনা যে ডিগ্রী বিনা কোন ভাল চাকরি পাওয়া কতখানি কঠিন? যেমন করে হোক এম.এ. তো আমাকে করতেই হবে। চাকরির সঙ্গে সঙ্গেই আরো কিছু করতে হবে। আমাদের কিছুটা কষ্ট সহ্য করার জন্য তৈরী হতে হবে।'

'এখন কি এমন নরম গালিচায় শুয়ে সুখ ভোগ করছি যে বলছ কষ্ট করতে হবে?'

ঝাঁঝের সঙ্গে বলল প্রভা, 'না হয় আরো খানিকটা কষ্ট হবে'।

'সত্যি প্রভা, আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত, তুমি শুধু আমাকে সাহস জোগাবে। তাহলেই আমি দুনিয়ার সব কাজ করে ফেলতে পারব। জীবনে বড় একলা আমি, বড় নৈরাশ্যবাদী। কেউ কখনও একটা মিষ্টি কথা বলেনি, একটু উৎসাহ দেয়নি। তুমি যদি আমার জীবনে প্রেরণা আর মানসিক শক্তি যোগাতে পার তাহলে তোমার আর আমার সমস্ত স্বপ্ন আমি সাকার করে তুলবই,' আবেগে চোখে জল এসে গেল আমার।

'আমি তো কখনই ভাবিনি যে আমি তোমার পায়ের বেড়ি হয়ে থাকব। যদি কখনও মনে হয় আমি তোমায় পিছনে টেনে রাখছি তাহলে নির্মমভাবে তুমি আমাকে তোমার পথ থেকে সরিয়ে দিও, নিজেকে আলাদা করে নিও। আমার কান্নাকাটিতে কান দিওনা', বাইরে থেকে আসা চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছিল ওর গালের ওপর চোখের জলের ধারা চিকচিক করছে।

আমি এবার একটু সহজ স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'তাহলে প্রভা, আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত হল এই যে, এই সংসার থেকে আমরা কোন জিনিস নেব না, একটি জিনিসও নয়। কাল থেকে আমি প্রাণপণে চাকরির চেষ্টা করব। কাপড় চেয়েছিলাম বলে আজ মা আর বাবুজীর কাছে কত কথা শুনতে হল।'

'আঃ ছেড়ে দাও না। ও বেচারারা আর কি করবেন?' প্রভা কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করল।

'বাঃ কেন করবেননা শুনি, ভাবীর বেলা তো দিব্যি সব জিনিস বেরোয়', রেগে বললাম, 'ভাবীর বরের রোজগারের ওপরই সারা পরিবার নির্ভর করছে, এইজন্যেই না? কিন্তু সেকথা তো স্পষ্ট করে বলা হয়না? সব ছেলের প্রতি সমভাব দেখানোর কথা বলা হয় কেন? যাক, এখন থেকে আমরা তো আর কিছুই চাইতে যাচ্ছি না।'

'চাইলেই বা পাচ্ছ কোথায়? চাইলে তো কিছুই পাওয়া যাবে না, সেই তো ...'

'সত্যি বলছি প্রভা, আজ এত হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। বাড়িতে তুমি আছ তাই, না হলে আজ হয়ত ফিরে আসতামই না,' আবেগভরে বলে উঠলাম। ওর দেহখানি দুবাহুর বেষ্টনীর মধ্যে বেঁধে নিলাম। মুগ্ধা ময়ুরীর মত মেলে দেওয়া ওর দুটি চোখের আকাশে ঘনিয়ে এল যেন বিভোর আবেশের মেঘ, আমার সমস্ত ক্লান্তি আর হতাশা ভালবাসার স্নিগ্ধ বাদলধারায় স্নান করে উল্লসিত হয়ে উঠল।

চার

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের বাইরে যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর কথা প্রভাকেও বলেছি। তাঁর কথাগুলো সমস্তক্ষণ মনের মধ্যে ঘুরছে, তাঁর কথাবলার ভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস-ভরা ব্যক্তিত্ব, ক্ষোভ সবকিছুই আমার খুব ভাল লেগেছিল, এখন আপশোস হচ্ছে, ওঁর সঙ্গে কেন যে ভাল করে পরিচয় করে নিইনি। ওঁর কথাগুলো আমার মর্মবেদনাকে যেন অনেকখানি সমর্থন করেছিল, তাই বোধহয় এত ভাল লেগেছিল। কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনি যে ওঁর সঙ্গে এত শীঘ্র আবার দ্বিতীয়বার দেখা হয়ে যাবে। আসা যাওয়ার পথে আবার যদি দেখা পাই এজন্য চোখদুটো আমার সর্বদাই সজাগ থাকত অবশ্য।

আমাকে দেখেই দিবাকর বলে উঠল, 'একেই বলে দীর্ঘজীবি শয়তান! অর্থাৎ কিনা, যাকে স্মরণ করা মাত্রই এসে হাজির হয় তাকে ইংরিজিতে বলে শয়তান আর এদেশে আমরা তাকে বলি, অনেকদিন বাঁচবে। তুমি নিজেকে এরমধ্যে কোন দলে ফেলতে চাও বল।'

একটু হেসে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে উঠি 'যেটাকে তোমার ইচ্ছে'। ভিতরে আরাম কেদারায় বসে আছেন এক ভদ্রলোক, আমি তাঁকে দেখে চমকে গেলাম। ওঁর দেহের অর্ধেকটাই একটা খবরের কাগজে ঢাকা, হাতের ইশারায় জিজ্ঞাসা কবলাম — 'ইনি কে?'

'এদিকে দেখুন, খবর কাগজ তো পালিয়ে যাচ্ছে না, এই যে আমাব এই বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।' দিবাকর কথা বলতে বলতে ওঁর হাতের খবরকাগজখানা টেনে নিচ্ছিল। নতুন কেউ ঘরে ঢুকেছে অথচ তখনও একান্ত মনোযোগে কাগজ পড়া — এটা আমার কাছে একটু অসভ্যতা বলে ঠেকছিল।

খবরের কাগজখানা সরে যেতেই তার আড়াল থেকে যে ক্লীন শেভড মুখখানা বেরিয়ে এল সে মুখ দেখে চমকে উঠলাম — 'আরে আপনি?'

ভদ্রলোক বেশ ধীরে সুস্থে কাগজখানি গুছিয়ে ভাঁজ করে একপাশে রাখতে রাখতে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই সেই। দিবাকরের কাছে এত গল্প শুনেছি যে সেদিন আপনাকে দেখেই কেমন যেন মনে হয়েছিল, আপনিই বোধহয় সেই...। কোনদিন ও পরিচয় করিয়ে দেবে এরকম আশা ছিল, তবু ভাবলাম নিজেই পরিচয়টা সেরে নিই। সেদিন ক্যান্টনমেন্টের দিক থেকে ফিরছিলাম, আপনাকে দেখেই মনে হল, বোধহয় ইনিই...'।

'সত্যি, আমার তো পরে খুব আপশোস হচ্ছিল যে কেন পরিচয়টা করে নিইনি। সেদিন আপনার কথাগুলো শুনে আমার এত...' কৃতজ্ঞতার একটা উচ্ছ্বাস উঠে আসছিল ভিতর থেকে, সেটা চেপে গিয়ে কথা ঐ খানেই শেষ করি।

দিবাকর বেজায় হতাশ হয়ে দু হাত উল্টে বলে উঠল, 'আর কি পরিচয় করাব? তোমরা আগেই কোথায় দেখাসাক্ষাৎ সেরে ফেললে ভাই? যাই হোক, সমর, এঁর কথাই তোমাকে বলেছিলাম। ইনিই আমাদের শিরীষ ভাইসাহেব। উনি অবশ্য বলছিলেন যে তোমাকে সম্ভবতঃ কোথাও দেখেছেন বা আলাপ হয়েছে, কিন্তু আমি বলেছিলাম তার তো দু তিন দিন ধরে কোন পাত্তাই নেই, পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

দিবাকরের ইয়ার্কিতে কান না দিয়ে আমি কৃতজ্ঞভাবে বললাম, 'তখন যদি জানতাম শিরীষভাইসাহেব তাহলে তো...।'

আমার কথার মাঝখানেই জোর গলায় হেসে উঠলেন, 'তাহলে কি ধরে মারপিট করতে নাকি? যাক, ওসব কথা ছাড়, এবার জমিয়ে বোস দেখি। দুতিন দিন হল এসেছি, এসে পর্যন্ত তোমারই পথ চেয়ে ছিলাম।'

ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলি, 'এমন একটা জরুরী কাজে ফেঁসে গিয়েছিলাম না,... তা আপনি এখানে কি কিছু কাজে এসেছেন, না... ?'

'হ্যাঁ, তা একরকম কাজই বলতে পার। বোনকে নিয়ে এলাম,' উনি দিবাকরের দিকে তাকালেন। সে খাটো লুঙ্গি আর গেঞ্জি গায়ে কাঁধে তোয়ালে ফেলে, বোধহয় স্নান করতে যাচ্ছিল।

'মায়ের সঙ্গে দেখা করাতে এনেছেন বুঝি?' আসার কারণ জানতে চাইলাম আমি।

'না দেখা করাতে ঠিক নয়', এবার একটু গম্ভীর আর আনমনা হয়ে গেলেন — 'তা দেখাকরাও বলা যায়...দিবাকর একে কিছু বলনি বুঝি? ভাই সমরবাবু, কথাটা হচ্ছে আমার বোনের প্রথম দিকে প্রায়ই হিস্টিরিয়ার আক্রমণ হত, পরে হঠাৎ একেবারে পাগলের মত আচরণ আরম্ভ করল — আর ক্রমশ এই অসুখের প্রকোপ বেড়েই চলল। ডাক্তার বললেন অবিলম্বে কোন মেন্টাল হসপিট্যালে ভর্তি না করলে কেসটা একেবারে বিগড়ে যাবে। পরশুদিন তাকে ভর্তি করে এসেছি।'

'তুমি এখানে থাকলে তোমাকেও ভর্তি করে দেওয়া যেত' দিবাকর ফোড়ন কাটে।

দিবাকরের ওপর রাগ হয়ে যায় আমার, এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়েও ইয়ার্কি মারছে। ওঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করি। 'হঠাৎ হিস্টিরিয়ার আক্রমণ শুরু হল কেন, সে সম্বন্ধে ডাক্তার কিছু বলেনি?'

শিরীষ বললেন, 'সে কথা আর ডাক্তার কি বলবে? মানসিক কষ্ট, দুশ্চিন্তা, নার্ভের ওপর অত্যধিক চাপ এইসব কারণেই ওটা হয়ে থাকে। ডাক্তারের কাছে গেলে সে নিশ্চয় একটা কিছু বলবে, কিন্তু আসল কারণটা তো আমরা জানি।' কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তিত মুখে বসে বসে উনি দু হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলেন তারপর যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'অবশ্য ভেবে দেখতে গেলে, ব্যাপার তো আসলে তেমন বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু ও কিছুতেই বুঝতে চায়না, কি করা যাবে। দোষটা তো আসলে আমাদের বাড়ির লোকেদেরই। খুব অল্প বয়সে ওর

বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল, বড়জোর এগারো কি বারো বছর বয়স তখন। ওর স্বামীদেবতাটি তখন পড়ছিলেন। পড়াশোনা শেষ হবার পর হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে পত্নী একেবারে অশিক্ষিতা, একে নিয়ে ঘরকরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সেই থেকে সে একে একরকম ত্যাগই করেছে বলা যায়। আমার কাছে রেখে, দিনরাত পিছনে লেগে থেকে আমি ম্যাট্রিকটা পাশ করিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বোকা মেয়েটা এত বেশী চিন্তা করে যে কিছু বলার নয়। এই অসুখটা না বাধালে এ বছর ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে যেত। আমি ওকে লক্ষবার বুঝিয়েছি যে, তোর এত চিন্তা কিসের? তা সে কারো কথা কানেই তোলেনা মোটে। রাতে ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠে।' বলতে বলতে বোনের কষ্টের কথা ভেবে ওঁর গলার স্বর ধরা ধরা হয়ে এল, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খবরের কাগজের পাতাগুলো গোছাতে লাগলেন।

'হুঁ...' আমি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ি। মনে হচ্ছে যেন উনি আমাদের মুন্নীর জীবনের কথাই বলছেন। একটুপরে প্রশ্ন করি, 'তবে তো আপনাকে প্রায়ই এখানে আসতে হবে?'

'হ্যাঁ ভাই, মাসে দু তিনবার তো আসতেই হবে। খুবই মুশকিলে পড়েছি।' বেশ ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'আমি তো এই আশায় ছিলাম যে হিন্দু কোড বিল পাশ হয়ে যাবে, আর নয়তো নেতারা এমন দু একটা আইন করবেন যার সাহায্যে ডাইভোর্স করিয়ে নিয়ে আমি মেয়েটার অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দেব। বিয়ে যদি নাও হয় তাহলেও একটা নিরর্থক ঝামেলা মিটে যাবে। কিন্তু নেতাদের তো নিজেদের ভোটের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই নেই। বাড়ির লোকেরা সবাই আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু এভাবে মেয়েটা মরে যাচ্ছে এ আমি চোখে দেখতে পারছি না...।'

বোনকে মরতে দিতে তো কেউই চায়না, কিন্তু তার প্রতিকার যে বিবাহবিচ্ছেদ এটা আমার ঠিক বোধগম্য হলনা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বিবাহবিচ্ছেদ, বা পিতার সম্পত্তিতে কন্যার সমান অধিকার, এগুলির স্বপক্ষে?' উনি একেবারে স্থিরবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'সম্পূর্ণভাবে'।

আমি চিন্তিতভাবে বললাম, 'কিন্তু এতে যে আমাদের সমাজের কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়বে?'

'কোন সমাজের কথা বলছ, বুঝলাম না' — উনি একটু আশ্চর্যের ভঙ্গিতে বললেন।

আমি সাহস করে বলে ফেলি, 'হিন্দু সমাজের কথা — সবদিকে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে। বিবাহের মত পবিত্র ব্যাপারকে লোকে নিজেদের মনোরঞ্জনের উপায় বলে মনে করবে। বিয়ে করেই দু চারদিনের মধ্যে তালাক নিয়ে নেবে। সব একেবারে পুতুলখেলার মত ব্যাপার হয়ে পড়বে। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে শালা-ভগ্নীপতিতে আর নয়তো ভাইবোনে কলহ বেধে যাবে। ভাইবোনের মধ্যে যে ভালবাসার সম্পর্ক তার কি দশা হবে তখন?' আমি দিবাকরের দিকে তাকালাম এই আশায় যে ও আমাকে

সমর্থন করবে। পার্কে বসে এই সব বিষয় নিয়ে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা তর্ক চালিয়েছি।

'কি রকম ভালবাসা?' ওঁর প্রশ্ন করার ভঙ্গিতেই আমি এবার বুঝে গেলাম যে উনি সব বুঝেও না বোঝার ভান করছেন। আমার কথা বুঝে তার উত্তর দেবার জন্যই এভাবে প্রশ্ন করছেন।

'সেই রকম ভালবাসা যার জন্য আপনি আপনার বোনের চিকিৎসা করাতে এত কষ্ট স্বীকার করছেন, প্রতি আট দশ দিন অন্তর এখানে আসবেন,' বেশ জোর দিয়েই বললাম, 'কারণ তার জন্য আপনার মনে দয়া আছে, ভালবাসা আছে। এসব তো আইন বা শাস্ত্রের বন্ধন নয়, এ আপনার মন থেকে উৎসারিত ইচ্ছা আর চাওয়া। কিন্তু এই বোন যদি ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে সমান সমান সম্পত্তির ভাগ দাবী করে তখন এই দয়া আর ভালবাসা কি বজায় থাকবে? তখন আপনি না চাইলেও আপনার মনে তার প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে উঠবে।'

'দেখ মশায়', এতক্ষণ আমার কথা শোনার পর এবার উনি একটু কড়া সুরেই বলে ওঠেন, 'এই সব ব্যাপার তুমি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ আমি জানিনা, কিন্তু আমার মতে ভবিষ্যতে যদি সেরকম যুগ আসে তবে তা অন্তত এখনকার চেয়ে অনেক ভাল হবে। এখন তোমার মনে বোনের জন্য দয়া ভালবাসা আছে। সেখানে কোন আইনের বন্ধনও নেই বাইরে থেকে সমাজের চাপও নেই। যদি দয়া না করে, একটু নির্লজ্জ ব্যবহার করতে শুরু কর তাহলেও সে বেচারী কিছুই করতে পারবে না। কান্নাকাটি করবে, হয়তো দুচারজনের কাছে নালিশ করবে আর দোষ দেবে নিজের ভাগ্যকে। কিন্তু তখন তাকে তোমার ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে বাঁচতে হবেনা। বিদ্বেষ বা ভালবাসা শুধু তোমার মর্জির ওপর নির্ভর করবে না। তোমার ছুঁড়ে দেওয়া কৃপার খুদ কুঁড়োটুকুমাত্র নিয়ে আধমরা হয়ে বাঁচা থেকে তো রক্ষা পাবে। দুই ভাইয়ের মধ্যে তো সম্পত্তির সমান সমান ভাগ হবার কথা, সেখানে কি কলহ হয়না? তারা নিজের নিজের অংশ আলাদা করে নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত জীবনযাপন করে। অন্যভাইকে অংশ দেবার বিষয়টা যদি আইনসঙ্গত না হয়ে শুধুমাত্র তোমার ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করত, তাহলে তুমি ইচ্ছা হলে তাকে অংশ দিতে, আর ইচ্ছা না হলে তাকে পথের ভিখারী করে ছাড়তে।'

এই যুক্তি শুনে আমি বেশ থতমত খেয়ে গেলাম। ব্যাপারটা এই দিক থেকে তো কখনও ভেবে দেখিনি। তবু সাহস করে বলে ফেলি, 'কিন্তু সে যাই হোক এটা তো মানতেই হবে যে এই নিয়ম কানুন হলে বড়ই বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। সমাজকে সচল রাখার জন্য প্রাচীনকালের মানুষেরা বহু চিন্তাভাবনা করে যে সব নীতিনিয়ম সৃষ্টি করেছিলেন যে সব তো একেবারে ওলটপালট হয়ে যাবে।'

'অতএব?' খুব শান্তস্বরে বলেন উনি, 'কি কি হয়ে যাবে বল শুনি?'

অতি নিরুদ্বিগ্ন স্বরের ওঁর এই সব ছোট্ট ছোট্ট প্রশ্নগুলোকে আমি ভয় পেতে শুরু করেছি। আবার যাতে উল্টোপালটা কিছু বলে না বসি এজন্য বেশ সাবধান হয়ে জবাব

দিলাম, 'ঐ সব ব্যবস্থা হলে আমাদের দেশের আদর্শ সতীনারীদের উজ্জ্বল ধারাটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। স্বার্থবোধ আর কামনা বাসনাই বিবাহের একমাত্র ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে...।'

'মাফ কর ভাই সমর,' সেই একই সুরে উনি বলেন, 'দিবাকর বলেছিল তুমি নাকি অনেক কিছু চিন্তা কর, কিন্তু এখন দেখছি চিন্তাও দুই ধরণের হয়। এক — প্রতিটি বিষয় যুক্তি আর বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করা আর দুই — আবেগের বন্যায় হাবুডুব খাওয়া। কিছু মনে কোরনা ভাই, আমার মনে হচ্ছে, তুমি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব।' দু আঙুলে ধরে খবরের কাগজখানা তুলে বললেন, 'সামাজিক বিশৃঙ্খলার কথা বলছ — একটু চোখ মেলে দেখার চেষ্টা কর তো, কি সুব্যবস্থা, কোন সৌন্দর্য চোখে পড়ছে এই সমাজের? এই তো আজকের কাগজ, শুধু লক্ষ্ণৌ জেলাতেই ভদ্রঘরের পাঁচ হাজার মহিলা বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন পত্র দিয়েছেন। এঁদের সবাইকারই কি একসঙ্গে মাথায় শখ চেপেছে তালাক নেবার, না এঁরা সব কামনা বাসনায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন? দুটি স্ত্রীলোক পুড়ে মরেছে, চারজন কুয়োয় পড়ে মরেছে, আটজন পালিয়ে গেছে আর টি.বি হয়ে মরেছে। কিন্তু এসব ব্যাপার আমাদের কাছে এখন এতই স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে আমরা এসব নিয়ে চিন্তাও করিনা। এগুলো আমাদের মনকে আর স্পর্শও করেনা। কি রকম সুব্যবস্থার কথা বলছ আমাকে বুঝিয়ে দাও তো। তোমার বাড়ির কথা আমি জানিনা, কিন্তু এমন একটা পরিবার আমাকে দেখাতে পার যেখানে মেয়েরা দুর্গতির অন্ধকূপে দমবন্ধ হয়ে মরছে না? শিক্ষিতা সাহসী মহিলাদের কথা আমি ধরছি না, তাঁদেরও সমস্যা আছে কিন্তু সে অন্যধবণের সমস্যা।'

উনি বলে চলেছেন আর আমার চোখের সামনে কখনও মুন্নী আবার কখনও প্রভার ছবি ভেসে উঠছে। মনে হচ্ছে ওদের দুজনের কথা মনে ভেবেই যেন এই সব বলা হচ্ছে এবং কেবল মাত্র আমাকে শোনাবার জন্যই বলা হচ্ছে।

'দুর্গতিতে ডুবে আর দম আটকে মরাটাকে 'ভারতীয় নারীর সহনশীলতা' নাম দিয়ে পূজো করতে বসে যেওনা। কোটি কোটি মানুষের হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে থেকে ছেঁকে তোলা হয়েছে দুটো নাম, সীতা আর সাবিত্রী! সীতার নাম উচ্চারণ করতে আমাদের কি লজ্জায় মাথা নত হয়ে যাওয়া উচিত নয়? এক নির্দোষ নারীকে কত বড় কলঙ্ক আর কি অমানুষিক যন্ত্রনা দিয়ে তারপর আমরা ঘটা করে তার পূজো করে থাকি!'

এইসব কথা শুনতে শুনতে আমার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করছিল, মনে হচ্ছিল যেন ইনি আমাকে হাটের মাঝে গালাগাল দিচ্ছেন, 'আমাদের ঋষিমুনিরা যেসব ধর্মীয় নিয়ম তৈরী করেছেন সেগুলি সবই তাহলে আপনার মতে অর্থহীন?'

'যদি মিউজিয়ামে বা সংগ্রহশালায় সাজিয়ে রাখার কথা উঠে তাহলে ওগুলোর জন্য সুদৃশ্য কাঁচের আলমারী নিশ্চয় দরকার, কিন্তু আজকের দিনে সমাজের ঘাড়ে ঐ

সব নিয়ম চাপানোর চেষ্টা করলে আমি বলব, ওগুলো দিয়ে উনুন ধরিয়ে চা তৈরী করা যেতে পারে, আর তারপর এতদিন তোমার কাঁধে চেপে বসে যে ভাল্লুকটা তোমার ঘাড়ে দাঁত বসিয়েছিল সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছ, এই আনন্দে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠতে পার।' আমার উত্তেজিত ভাবখানা যেন বেশ উপভোগ করতে করতে উনি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে দিয়াশলাই খুঁজতে লাগলেন।

আমাকেও সিগারেট অফার করেছিলেন, আমি তা প্রত্যাখ্যান করে মন দিয়ে দেখতে থাকলাম ওঁর মুখখানা — ওঁর বোনের মত ওঁর নিজের মাথাটাও বিগড়ে যায়নি তো? একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে উনি জ্বলন্ত কাঠিটা নেভাচ্ছেন, আর আমি ভাবছি ওঁর মাথাটা ধরে যদি আচ্ছা কষে ঐ সামনের দেওয়ালে ঠুকে দেওয়া যায় তাহলে কিরকম ধোঁয়া বেরোবে? অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে প্রশ্ন করি, 'আমাদের হিন্দু ধর্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম একথাও কি আপনি মানেন না?'

আবার ঠোঁট বাঁকা করে হাসলেন, 'প্রগতিশীল এই দুনিয়া থেকে বহুদূরে পড়ে আছ দেখছি। দেখ শ্রীমান সমর, তোমাদের এই সংঘের প্রচলিত ভাষা আরব সাগরের ওপারে কেউ জানে না। পৃথিবী এখন অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমা বানাচ্ছে, আর তোমরা এখানে এই 'গোবর সংস্কৃতি' নিয়ে কান্নাকাটি করছ। নিজেদের নিয়ে এই ধরণের দম্ভভরা কথাবার্তা বলার আগে অন্যসব সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপটা কি রকম তা কখনও জানবার চেষ্টা করেছ কি? প্রাচীন যুগের পুরাকীর্তি এবং প্রাচীন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি রোম আর মিশর দেশেও কিছু কম নেই। চীন দেশের সভ্যতা সারা পৃথিবীকে যা দান করেছে আর কোন দেশ তার অর্ধেকও দিতে পারেনি। খৃষ্টানদের তোমরা যত গালাগালই দাওনা কেন যে, ওদের ধর্ম কথায় কথায় পরিবর্তন হয়, কিন্তু এটাও তো ঠিক যে এরাই অজানা জায়গায় অচেনা মানুষদের মধ্যে গিয়ে হাজার রকম বিপদ মাথায় নিয়ে স্কুল খোলে, হাসপাতাল গড়ে, ধর্মের নামে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেয়। আর এদেশে বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা যদি কারো করার বাসনা হয় তো সে উৎসাহভরে হিমালয়ে চলে যায় তপস্যা করতে। যার হাতে একটু পয়সা হয় সে সাধুসন্তদের প্রতিপালন করার জন্য মন্দিরে সম্পত্তি দান করে আর গরীব হলে মাথা মুড়িয়ে দুধ মালাই খেতে বসে যায়।'

'আপনি শুধু একটা দিকই দেখছেন শিরীষ ভাই' আমি বলে উঠি।

'একটা দুটো জানিনা ভাই, আমি তো শুধু সেই দিকটাই দেখছি যেটা রয়েছে আমার চোখের সামনে, আর আমরা সবাই যার শিকার হয়ে পড়েছি। কোনো কালে তোমাদের এই দেশে দুধের নদী বইত আর সোনা ঝরত, কিন্তু আজ আমরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মুর্খ জাতি। আমাদের ধর্ম সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক ধর্ম। মানুষের বুদ্ধির বিকাশের চেষ্টা ভুলে গিয়ে যে ধর্ম যত অবাস্তব বিষয়কে জীবনের লক্ষ্য বলে নির্দেশ করে, বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা কেবলমাত্র বেদের মধ্যেই খুঁজতে থাকে সে ধর্ম সত্যিই

কৃপার যোগ্য। ঐ সব কথা শুনলে আমার লক্ষ্ণৌএর সেই নবাবের কথা মনে পড়ে যাকে একা চালাতে হত,' বলতে বলতে নিজেই হেসে ওঠেন উনি।

আমি অনেক কষ্টে বললাম, 'এই সব বাইরের জিনিসে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা কোনদিনই আমাদের লক্ষ্য ছিল না। সেজন্যই আমরা কখনও অন্য দেশ আক্রমণও করিনি বা সারা পৃথিবীতে ধর্মপ্রচার করার জন্য 'জেহাদ' ঘোষণাও করিনি। আধ্যাত্মিক উন্নতি আর শান্তিই আমাদের চিরকালের লক্ষ্য'।

এবার তো সিগারেট টানতে গিয়ে মাঝপথেই উনি একেবারে হো-হো করে হেসে উঠলেন। 'নিজেদের দুর্দশা লুকোবার জন্য কি চমৎকার শব্দজাল বিছানো হয়ে থাকে! একেই তো বলা হয় দারিদ্র্যের সাধনা। অন্যদেশ আক্রমণ না করবার পিছনে কোন দার্শনিক কারণ নেই, আসল কথা আমাদের শক্তিই ছিলনা। নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে এবং একে অন্যের রাজ্য গ্রাস করে নিতে আমরা তো কখনও পিছপা হইনি? অশোক এবং কনিষ্ক শক্তিমান ছিলেন, তারা যে বাইরের দেশের প্রতি কৃপা দেখিয়েছেন তাও তো নয়।' এ প্রসঙ্গ বন্ধ করে আবার বললেন, 'আমি প্রাচীন ইতিহাসের কথাও বলতে চাইনা, কাল্পনিক কথাও ভাবতে চাইনা, সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করছি — আজকের দিনে আমাদের দেশের যে কোন একটা লোককে ধরে জিজ্ঞাসা কর তার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক শান্তি কতখানি আছে? আধ্যাত্মিক শান্তি ভোগ করে কেবল তারাই যারা দান, ট্রাস্টি আর চাঁদার টাকায় বসে বসে দুধমালাই ওড়াচ্ছে।'

আমার মন একেবারে চিড়বিড়িয়ে উঠছে, এমন একটা কিছু প্রশ্ন তুলতে হবে যাতে এই লোকটার ক্যাঁটক্যাঁটে কথা একেবারে থামিয়ে দেওয়া যায়। হঠাৎ আমি প্রশ্ন করে বসি, 'পৃথিবীর উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছিল?'

আবার উচ্চকণ্ঠে হাসি, 'আরে তুমি তো দেখছি পুরাকালের ঋষিদের মত শাস্ত্রবাক্য বলতে লেগেছ। বিশ্বসৃষ্টি তো খুব সহজেই হয়ে গিয়েছিল — ব্রহ্মা ভাবলেন, আমি একা আর থাকতে পারছিনা, তাই এক থেকে অনেক হয়ে যাব। ব্যাস তিনি তার সমস্ত গুণগুলো প্রসারিত করে দিলেন, সৃষ্টি হয়ে গেল প্রকৃতি। অথবা খোদা বললেন 'কুন' আর দুনিয়া তৈরী হয়ে গেল। এতে আর মুশকিলটা কি?' নাক দিয়ে কিছুটা ধোঁয়া ছেড়ে এবার সিগারেটের শেষটুকু খোলা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন বাইরে, তারপরে একটু মুচকি হেসে বললেন, 'সমরজী, আজকের বিজ্ঞান বিশ্বের উৎপত্তি অর্থাৎ সৃষ্টির আরম্ভ কি ভাবে হয়েছিল, তখন তার কি রূপ ছিল এ সম্বন্ধে যা বলে সেইটেই অন্তিম সত্য বলে মেনে নিতে হবে এমন কথা আমি বলছি না, কিন্তু ঐ সমস্ত আষাঢ়ে গল্পের চেয়ে এই কথাগুলো কি বেশী সত্যি বলে মনে হয়না? তাছাড়া জ্ঞানের তো অন্ত নেই ভাই। যতই জানবার চেষ্টা করবে, জ্ঞান ততই বাড়বে।' এবার উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলেন, 'সত্যি, আমরাও আচ্ছা লোক, দেখা হতে না হতেই পৃথিবীর ভূত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে বসে গেছি। সেদিনকার আর আজকের এই নমুনা দেখে তুমি নিশ্চয় ভাবছ, আমি লোকটা অতি বাচাল।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না, না আপনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু জানবার ও চিন্তা করার মালমশলা পেলাম।'

'তাহলে তো তুমি কাঁচাহিন্দু হে। খাঁটি হিন্দুরা তো কিছু জানতে চায়না, ভাবতেও চায়না। তারা কেবল জানে সবকিছু গ্রহণ করতে — তা সে আধ্যাত্মিক জ্ঞানই হোক বা ঘুষের কালো টাকাই হোক। যাক, আমার কথা যদি খারাপ লেগে থাকে তো মাফ করে দিও। তর্ক করতে শুরু করলে আমার আর হুঁশ থাকে না। যা উচিত মনে করি সেটা বলে ফেলি।'

'তাই তো হওয়া উচিত,' আমি বললাম, 'অনেক বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই...।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' শিরীষ বলে উঠলেন, 'এখন তো প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হবে। আমিও কিছু শিখব, তুমিও কিছু কিছু বিষয়ে নতুন ভাববে।'

'আমার কাছে আবার আপনি কি শিখবেন?' লজ্জায় সংকুচিতভাবে চোখ নামিয়ে বলি, 'সব কথাই তো আমার কাছে নতুন ঠেকছে। অনেক কথা আজ জানলাম।'

'না, — না, আমি কিন্তু ভাই কোন জিনিসকেই একেবারে সম্পূর্ণ বলে মনে করিনা। প্রত্যেকটি জিনিসই একটু একটু করে বিকশিত হয়, তাই পূর্ণজ্ঞানী কাউকেই বলা যায় না। যার মধ্যে জানবার ইচ্ছা আছে তাকেই জ্ঞানী বলব আমি। যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে ঐ ইচ্ছাটা আছে ততক্ষণই সে জ্ঞানী, ওটা না থাকলে লাইব্রেরীর বই আর তার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তোমার আর দিবাকরের পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে, এর পর কি করবে ভাবছ?' বড়দাদাসুলভ আত্মীয়তার সুরে প্রশ্ন করেন শিরীষভাই।

'এরপর কি যে করব সেইটাই তো সমস্যা...কিছুই বুঝতে পারছি না।' নতুন কারো সামনে নিজরে দুঃখের কাঁদুনি গাওয়া আমার কোনকালেই ভাল লাগেনা।

'যদি সম্ভব হয় তো আরো অনেকদূর পড় তুমি উন্নতি করবে' বলেন উনি।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি কি করছেন আজকাল?'

দিবাকরের দিকে একবার দেখে উনি বলেন, 'আমি তো ভাই ভারত সরকারের এক দেড়শো টাকা মাইনের কেরাণী। অনেক কষ্টে ছুটি পাই, শনিবারে এসে রবিবারে ফিরে যাব, এই ভাবছি। আমাকে উঠতে দেখে আবার বলেন, 'এর পরের বার এসে নিশ্চয় তোমার সঙ্গে দেখা করব। আজ সন্ধ্যায় তো ফিরে যাচ্ছি।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ করে সত্যি বড় ভাল লাগল'। আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন এবং এত আত্মীয়তার সুরে কথা বললেন, এমন মানুষ আমার জীবনে এই প্রথম। আমি বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছি। আমার কথা শুনে ওর মুখে স্নেহের আভাস দেখা দিল। ওঁর সঙ্গে করমর্দন করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দিবাকর এতক্ষণ চুপচাপ একবার আমাকে দেখছিল, একবার ওঁকে। যেন আখড়ায় দুই পালোয়ানকে দেখছে। ওর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন বলতে চাইছে, দেখছ তো আমার ভাইসাহেব কেমন মানুষ! আমি ওকে বললাম, 'একটু বাইরে আসবে? দরকারী কথা আছে।'

ও পথে নেমে এল। রাস্তায় এসে ভারী গলায় ওকে বললাম, 'বড় মুশকিলে পড়ে গেছি ভাই, যা হোক চাকরী একটা জোগাড় করে দাওনা? না হলে লেখাপড়ার দফা একেবারে খতম, সারাটাজীবন কেরাণীগিরি করেই কাটাতে হবে। আরো কিছুদিন অন্তত তোমাদের সঙ্গে কাটাতে চাই।'

আমার অনুনয়ভরা স্বর শুনেই বোধহয় ও একটুও দ্বিধা না করে বলে উঠল, 'আরে এতদিন বলনি কেন? আজকেই আমি বাবুজীকে বলব। আরও দু এক জায়গায় চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ ভাই, এমন ধরণের কাজ যাতে লেখাপড়ারও একটু সময় পাওয়া যাবে, সেইসঙ্গে কাজটাও চালিয়ে যেতে পারব। খুব সিরিয়াসলি চেষ্টা করতে হবে কিন্তু,' আমার গলাটা করুণ হয়ে এল।

'ঠিক আছে, তুমি একদম চিন্তা কোরনা'।

ওর কাছে বিদায় দিয়ে যখন চলে এলাম তখন আমার মাথার মধ্যেটা যেন তোলপাড় করছে। শিরীষের কথাবার্তাও আমাকে এতটা অস্থির করতে পারেনি। দিবাকর কত সহজে কথাটা বলে দিল, যেন প্রত্যেকটা কথার উত্তর ওর নাগালের মধ্যেই রয়েছে। সত্যি, অনেক নতুন কথা জানা গেল আজ।

পাঁচ

দুই কানে আঙুল দিয়ে বাইরে চলে এলাম যাতে পিছন থেকে ভেসে আসা একটা শব্দও আর কানে না ঢোকে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে — সারা পথের রিকশা, টাঙ্গা সব কিছু একপাশে সরে এসেছে কারণ ধূলো উড়িয়ে গোবর ছড়িয়ে গরু মহিষের দল ঘরে ফিরছে। মন্দির বা সংঘে যাবার আজকাল আর ইচ্ছেও হয়না, ওসবের থেকে যেন বহুদূরে সরে এসেছি। ওসব ব্যাপারের সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল সে যেন কোন অন্য মানুষ। সে আমি নই। ওসব এখন আমার অর্থহীন মনে হয়, শুধু সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু হয়না। আজকের দিনে মানুষ এত সময় কি করে নষ্ট করতে পারে, তাই ভাবি এখন।

সেই পার্কে চুপচাপ এসে পড়ে রইলাম। বিয়ের আগে তো এইখানেই এসে শুয়ে থাকতাম। দিন শেষ হতে এখনও কিছুটা দেরী আছে। সরু সরু পায়ে চলা পথগুলোতে লোকে এদিক ওদিক পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। এদের বেড়ানো আর হাসি গল্প দেখে

মনে হচ্ছে এদের যেন কোনরকম চিন্তাভাবনা নেই জীবনে। হাসিখুশি শিশুদের গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে ঘোরাচ্ছে তাদের আয়ারা। মাঝে মাঝে যুবক যুবতীরা হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। পাশের লনে শুয়ে শুয়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাদের দেখছি আর আপন মনে দাঁতে দাঁত ঘষছি, 'শালা, দিব্যি হাওয়া খাচ্ছেন, খাওয়া পরার কোন চিন্তাই নেই বোধহয়। বাপ নিশ্চয় বহুটাকা রেখে গেছে বাড়িতে নিশ্চয় দুবেলা খিটিমিটি বাধে, কিন্তু এমন কায়দা করে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন যেন সিনেমা দেখতে এসেছেন। যত বোকাপাঁঠা, কোন কাজকর্ম তো নেই, আর এদিকে..., নিজের বোকামিতে নিজেই রেগে উঠি আবার হাসিও পায়। কি যে হয়েছে আমার! অন্যের হাসি খুশিও সহ্য করতে পারিনা? কিন্তু অফিসের নেশাগ্রস্ত মানুষের মত আমি নিস্পন্দ আর নিশ্চেষ্টভাবে শুয়ে শুয়ে শুধু চেয়ে থাকি, মনে হয় যেন অসুখ করেছে, তাই অসহায়ভাবে পড়ে আছি, ওঠবার শক্তি নেই। আধখোলা চোখে চেয়ে দেখি ওদিকে ক্রিকেট খেলছে ছেলেরা। দুটো ছেলে সাইকেলে আসছে... একটি লোক মন দিয়ে বই পড়ছে...ঐ যে চারটে মেয়ে বেনী দুলিয়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। একটা ছেলে কুকুরছানার পিছনে ছুটছে, ঐ নাও আবার এক যুগলমূর্তি এসে হাজির...মনে হচ্ছে আমি নয়, অন্য কেউ যেন এই সব দেখছে আর শুনছে। এখনও পর্যন্ত আমার কানে শুধু এসে পৌঁছুচ্ছে বাড়ির সেই চিৎকার চেঁচামেচি...উঃ ওটা কি একটা বাড়ি? নরক! নরকের মধ্যে কিলবিল করছে কতকগুলো কীট।

প্রভা খাবার সাজিয়ে থালাখানা অমরের সামনে নামিয়ে রাখতেই চেঁচিয়ে উঠল অমর, 'রুটিতে আজ ঘি মাখাওনি কেন ভাবী?'

প্রভা নরমসুরে জবাব দিল, 'ঠাকুরপো ঘি যে ফুরিয়ে গেছে।' বেশ রেগেই উঠল অমর, 'এই তো কাল না পরশু এক সের ঘি আনা হল, এর মধ্যে সব শেষ?'

'কতটুকুই বা ছিল?' প্রভা হাতের কাজ সারতে ব্যস্ত, অত খেয়াল না করেই জবাব দিল, 'দেখছই তো ফুরিয়ে গেছে, বাড়িতেই তো কাজে লেগেছে।'

অমরের সম্ভবত মনে হল প্রভা তাকে তাচ্ছিল্য করছে, সে উদ্ধতসুরে বলে উঠল, 'আসল কথাটা বলনা যে সবটা নিজের বরকেই খাইয়েছ, বাড়ির কথা বলছ কেন? আমাদের কি চোখ নেই? বাড়ির আর কারো না জুটলেও সমরভাইয়ার ডালে খুব ঘি ঢালা হয, রুটিও ঘি জবজবে। এদিকে আমাদের বেলা. .।'

'কি হচ্ছে কি অমর?' আমি ধমকে উঠি। আমি যে সিঁড়িতে বসে জুতো পালিশ করছিলাম সেটা অমরের নজরে পড়েনি। আমি চোখ পাকিয়ে ওর দিকে দেখতে দেখতে জুতো আর বুরুশ হাতে একেবারে রান্নাঘরে এসে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে ও থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। ছোট ছোট রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরতে শুরু করল।

ও বসে ছিল। আমি ওর পিঠে একটা লাথি কষিয়ে দিয়ে বলে উঠি, 'নির্লজ্জ কোথাকার, কথা বলতেও শেখনি? মুখের কোন লাগাম নেই? যা মুখে আসে তাই বলে যাচ্ছ, তুমি না ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়?'

পিছন ফিরে একবার আমার দিকে দেখেই ও থালা ঠেলে ফেলে দিয়ে রেগে হনহন করে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে গলা ফাটিয়ে জুড়ে দিল কান্না।

প্রভা রুটি গড়া বন্ধ করে এক ঝটকায় ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে বলে উঠল, 'তুমি আবার কোথায় বসে জুতো পালিশ করছিলে? জুতো হাতে একেবারে রান্নাঘরে ...।'

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'চুপ কর। ধাড়ি ছেলে এখনও কথা বলতে শেখেনি।'

এইসময় খাটে বসে বসে মা একেবারে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে চিৎকার করে উঠল, 'এই সমর, এদিকে আয় একবার। ও কেবল তোরই বউ, আর কারো কেউ নয়?' জুতোটা সিঁড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হুড়মুড় করে এসে দাঁড়ালাম মায়ের সামনে। ওপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সমর।

'খাবার সময় ওকে মারলি কেন শুনি?' জপের মালাটা কপালে ঠেকিয়ে মা বলে ওঠে,'আজকাল কথায় কথায় তোর হাত ওঠে। মনে মনে কি ভাবছিস, স্পষ্ট করে বলে ফেল দেখি?'

'হাত তোলার কথা হচ্ছে না', আমি বেশ চেঁচিয়েই বলি, 'বড়দের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে পারেনা?'

'কি এমন অভদ্র কথা বলেছে তাই শুনি?' তেড়ে উঠল অমর, 'পরশু একসের ঘি এসেছিল, এরমধ্যে ফুরিয়ে গেল কি করে? এইটুকু কথা তো শুধু জিজ্ঞেস করেছি।'

'একেবারে সরাসরি মিথ্যে কথা! মায়ের ধামাধরা হয়ে থেকনা অমর, আমি এখনও এখানেই রয়েছি', বুরুশ হাতে করেই আমি ওর দিকে তেড়ে গেলাম।

মা গর্জে উঠল, 'খবরদার যদি আমার ছেলের গায়ে হাত তুলিস। আমি বেঁচে থাকতে কেউ ওর পেছনে লাগুক দেখি! এখন তো আমরা সবাই তোর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি। এমনটা যে ঘটবে তা তো লক্ষণ দেখেই বুঝেছিলাম। দেখ, তোমরা সবাই দেখ, ঐ পোড়াকপালীর জন্য নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত তুলছে। বলি হ্যাঁরে, তোর নিজের লজ্জাশরম নেই? তুই আবার ওকে লজ্জাশরমের শিক্ষা দিচ্ছিস? কোন মুখে তুই এতসব বলছিস শুনি? যবে থেকে তোর ঐ আহ্লাদী বউয়ের সঙ্গে কথা বলা আরম্ভ করেছিস তবে থেকেই দেখছি একেবারে মাথায় চড়ে বসেছিস। রোজ একটা না একটা উপদ্রব, রোজ একটা না একটা হৈ-হল্লা! কথা যখন বলতিস না তখন এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল।'

'কথা বলতাম না বলেই তো এরা সবাই এমন আস্কারা পেয়ে গেছে, কেউ কারোকে কেয়ারই করেনা। ভদ্রতা সভ্যতা কাকে বলে তা যেন জানেই না,' আমি উত্তর দিলাম।

'তাই বটে, আমরা আর ভদ্রতা সভ্যতা জানব কোথা থেকে? ঐ পোড়ারমুখী এসে তোকে তো দুদিনে সব শিখিয়ে ফেলেছে কিনা, শেখাবার গুরু পেয়েছিস যে এতদিনে। সেদিনের ছেলে, উনি এসেছেন আমাদের সভ্যতা শেখাতে। কাল পর্যন্ত তো হাঁটতে জানতিনা, আজ ভদ্রতা শেখানেওয়ালী এসে গেছেন কিনা তাই এখন আকাশে উড়তে

শুরু করেছে। মাটিতে পা রেখে চল বুঝলি, মাটিতে পা রেখে! নির্লজ্জ ও, না তুই নিজে? যখন তখন বউয়ের হয়ে ঝগড়া করতে আসে। মা, বাপের মান রাখতে জানে না। লঘু গুরু জ্ঞান একেবারে খুইয়ে বসেছিস। আমরা তো...' এবার কান্না শুরু হয়ে গেল মায়ের।

'তুমি নিজে তো কিছু দেখইনা, আবার অন্য কেউ যদি বলতে যায় তাহলেও সেটা হয়ে যাবে বউয়ের হয়ে কথা বলা। এতগুলো মাস কেটে গেল, কোনদিন কি কেউ একবার খোঁজ নিয়েছে যে ও কখন খায় আর কখন ঘুমোয়? একটা পরণের কাপড় চাওয়াতে তো কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। ভাবী কি আজকাল একটা কাজও করতে পারেনা? তা কেন করবে? সে যে বড়বউ, একেবারে শাশুড়ির মত তাঁর দাপট। তিনি যেন রাণী আর বাকিরা সব দাসী।'

'দাসী ও কেন হতে যাবে, দাসী তো আমি। সারাটা জীবন কষ্ট করে খাইয়ে চলেছি, আরও খাওয়াতে হবে। আগে একজনকে খাওয়াতে হত এখন দুজনকে খাওয়াতে হচ্ছে।' বাচ্চার কান্নায় কান না দিয়ে তাকে খাটের ওপর ধপাস করে ফেলে দিয়ে এবার ভাবীও নেমে পড়ল রণক্ষেত্রে। গজরাতে গজরাতে সোজা রান্নাঘরে ঢুকে প্রভাকে এক হ্যাঁচকাটানে পিঁড়ি থেকে তুলে বলে উঠল, 'ওঠ গো বউরাণী, কত কষ্ট হচ্ছে তোমার, আমি রান্না করছি।'

'আমি তো করছিই, তোমাকে আমি তো কিছু বলিনি, আমার ওপর রাগ করছ কেন?' প্রভা কাঁদ কাঁদ স্বরে অনুনয় করতে থাকে, কিন্তু ভাবীর হাতে তখন বেজায় জোর এসে গেছে। সে প্রভার শীর্ণদেহখানা তুলে একপাশে ফেলে দিয়ে পিঁড়ির ওপর দুম করে বসে পড়ল এবং ফস ফস করে রুটি বেলতে শুরু করে দিল। প্রভার চোখভরা জল, বেচারা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল একটুক্ষণ তারপর চাটুর ওপরে আধসেঁকা রুটিগুলোকে সামনে বিছানো জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর চিমটে দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফোলাতে লাগল।

'রোজগার করার কথা তুললেই বলবে এখন আরো পড়ব, আরো পড়ব ...' মা গজগজ করেই চলেছে। ভাবী প্রভার হাত থেকে চিমটেখানা একটান মেরে কেড়ে নিল। তারপর হাঁড়ি মুখ করে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে ফোলানো রুটিগুলো গায়ের জোরে চাকির ওপর আছড়াতে লাগল। দু চার মিনিট প্রভা ভেবেই পেলনা সে এখন কি করবে। অপরাধিনীর মত ধীরে ধীরে উঠে বাচ্চাটার কান্না থামাতে গেল। ভাবী রাগের চোটে তাকে বিছানায় আছড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে, সে একেবারে তারস্বরে কাঁদছে এখনও। প্রভা ওকে কোলে তুলে দুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

রুটি বেলতে বেলতে ভাবী কেমন করে যেন টের পেয়ে গেছে ব্যাপারটা। সব ফেলে রেখে দুমদুম করে এসে প্রভার কাছ থেকে বাচ্চাটাকে হিঁচড়ে টেনে নিতে নিতে বলে উঠল, 'থাক, থাক বউরাণী, ওকে নিতে হবেনা তোমার। কাঁদুক, একটু কাঁদলে মরে যাবেনা। ওর কপালে যদি কান্না থাকে তো কাঁদতেই হবে ওকে। না হয় হতভাগী মরেই

যাবে, তার বেশী তো কিছু নয়, তবু তোমার প্রাণটা তো সন্তুষ্ট হবে। তখন থেকে তো দৃষ্টি দিয়ে জ্যান্ত পুঁতে ফেলছিলে একেবারে...।'

প্রভার মনে হল সমস্ত ব্যাপারটার জন্য ওকেই দায়ী করা হচ্ছে। এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে কান্নাভরা সুরে ও বলে উঠল, 'দিদি, আমি তো কিছু বলিনি, আমাকে তুমি এতসব শোনাচ্ছ কেন?' ও বাচ্চাটাকে কোল থেকে দিতে চাইছিল না, দুজনের টানাটানির মাঝে পড়ে বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করল আরও জোরে।

সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এখন আমার ভূমিকা কেবলমাত্র দর্শকের। আমি বকে উঠলাম, 'প্রভা তুমি ওকে দিয়ে দিচ্ছ না কেন?' তারপর কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার ভঙ্গিতে বাইরে আসতে আসতে বললাম, 'কিছু বলা চলবে না, একটা কিছু বলেছ কি সবাই মিলে চেঁচাতে শুরু করবে...'। প্রভার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ভাবী বাচ্চাটাকে আবার খাটের ওপব ফেলে দিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে। এই পর্যন্ত ঘটনা দেখে চলে এসেছি। এরপর আবো কি কি হয়েছে তা তো বুঝতেই পারছি। আমার মাথার ভিতরটা যেন একেবারে ফাঁকা, শূন্য মনে হচ্ছে।

বাড়ির পরিস্থিতির কথা ভাবতে ভাবতে এই পার্কে শুয়ে শুযেও আমার মাথাব মধ্যে শিরাগুলো যেন দপ দপ করছে।

হঠাৎ খুব কাছেই একটা বন্দুক ছোঁড়ার মত গগনভেদী আওয়াজে চমকে একেবারে লাফিয়ে উঠলাম, মনে হল কেউ বুঝি আমাকেই তাক করে বন্দুক চালিয়েছে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে পেলাম পার্কে এক কোণে কিছু লোক কিসের চারদিকে যেন ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সবকিছু ভুলে ছুটে গেলাম সেদিকে। জন দশ পনের লোকের ভিড়ের মাঝখানে এক বিশালকায় ঘোড়া চার পা ছড়িয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে, জিভ বেরিয়ে পড়েছে মুখ দিয়ে ফেণা বেরোচ্ছে, গাঢ় রক্তেব ধারা ঘাসেব ওপর গড়িয়ে এসে শুকিয়ে উঠেছে। ঘোড়াটার সামনের দুই পায়ের ওপরেব অংশে একটা বড় ছিদ্র, সেখান থেকে রক্ত এবং সাদা সাদা মত তবল পদার্থ বেরিয়ে আসছে। খাঁকি প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরা এক ভদ্রলোক পাশে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিলেন। মাটিতে দাঁড় করানো বন্দুকটা একহাতে ধরা, কাঁদছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একজনকে প্রশ্ন করলাম, 'কি হয়েছে ভাই?' তিনি খুব দুঃখিত স্বরে বললেন, 'দারোগাজীর ঘোড়া, উনি বড় ভালবাসতেন একে। বহুদিন ধরে অসুখে কষ্ট পাচ্ছিল, কিছুতেই অসুখ সারছিল না, তাই মেরে ফেললেন'।

'হু, কি রকম ভালবাসতেন! অসুখ করেছে তাই মেরে ফেললেন? একদিন এমনি করে কি বুড়ো বাপকেও মেরে ফেলবেন?' ঘৃণা এবং রাগে মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠি। আরো অনেক কিছু হয়ত বলে বসতাম, কিন্তু তার আগেই লোকটি তিরস্কার ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'বাকি জীবনটা যন্ত্রনায় ছটফট করত সেটাই কি

ভাল হত? এখন একমিনিট কষ্ট পেল, কিন্তু সারাজীবনের যন্ত্রনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল তো?...কেউ কষ্ট চোখে দেখতে পারে, কেউ পারেনা...।'

আমি বিরক্তভাবে সরে এলাম ওখান থেকে। দূরে এসে নিজের জমাট বাঁধা মগজে দু তিনবার হাত বুলোলাম, — কি যে হয়েছে আমার, সামান্য কথাও মাথায় ঢোকেনা। ঠিক কথাই তো। দারোগাজী ভুলটা কি করেছেন? সেদিন শিরীষের কথাও এইরকমই আমাব বুঝতে বেশী দেরী হচ্ছিল। সে যা যা বলছিল সবই ঠিক কথা, আমার মগজটাই গেছে ভোঁতা হয়ে।

বাত দশটায় বাড়ি ফিরলাম। এখনও কিছুই যেন বুঝতে পারছি না। আমার মাথায় হয় গোবর পোরা আর নয়ত একেবারে কিচ্ছুই নেই। কেবল অসহ্য যন্ত্রণা আছে মাথাভরা। বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ, সবাই শুয়ে পড়েছে। দবজা ভেজানো, বাবুজী অথবা ভাইসাহেব এখনও ফেরেননি। আমি চুপচাপ ছাদে চলে এলাম। এপ্রিল শেষ হয়ে গেছে। আজকাল সবাই ছাদে শোয। নিজের ঘরে এসে জামাকাপড় না বদলেই বিছানায় শুয়ে পডলাম। ভিতরটা যেমন গবম, তেমনি প্যাচপ্যাচে। চোখে ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই, ছাদের দিকে চেয়ে আছি শূন্যদৃষ্টিতে। প্রভা এসে বসল পাশে। ভয়ে ভয়ে আমার বাহুতে হাত বেখে বলল, 'খাবেনা?'

ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিনা। মনে মনে এই মুহূর্তটির জন্যই ছিল আশঙ্কিত প্রতীক্ষা। একটুও বিচলিত ভাব না দেখিয়ে বললাম, 'না, তুমি খেয়ে নিয়েছ তো?'

'না', আমার কপালে হাত রেখে বলল ও।

হঠাৎ প্রভার কোলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম, 'প্রভা...প্রভা বলে দাও আমাকে . কি কবব, কোথায় যাব আমরা?'

ছয়

একটা সুখবর পেয়ে তোমার মনে খুশির ঢেউ উঠছে, তুমি যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ি গিয়ে খবরটা শোনাতে চাইছ, আর সেইরকম সময়ে কেউ বকর বকর করে তোমাকে আটকে বেখেছে, তর্কের এক একটা নতুন নতুন সূত্র খুঁজে বের করছে — এই অবস্থায় পড়লে কি রাগ যে হয়। তখন সব সভ্যতা শিষ্টতা তাকে তুলে রেখে উঠে পড়ে বলতে ইচ্ছে করে...'বকবক বন্ধ কর দেখি, আমাকে এখনি গিয়ে এই সুখবরটি জানাতে হবে আমার স্ত্রীকে।' দিবাকরের বৈঠকখানায় বসে আমার অবস্থাটা হল ঠিক এইরকম।

দিবাকর জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘চাকরি করবে?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ কোথায়? পেয়েছ নাকি কিছু?’ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি আমি।

‘পেয়েছি তো, কিন্তু বহু দূরে,’ দিবাকর বলে, ‘সে ধর, একেবারে শহরের অন্য প্রান্তে।’

‘আরে ভাই, আগে বল কোথায়। শহর কি বলছ, আমি পৃথিবীর অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত যেতে রাজি আছি,’ ওর কাঁধে হাত রেখে বলে উঠি।

‘কিন্তু এই শর্তে যে থার্ডইয়ার জয়েন করবে।’

‘হ্যাঁরে বাবা, করব, করব। আগে বল তো,’ রাগতে গিয়ে হেসে ফেলি।

‘তাহলে শোন, কাজটা হচ্ছে একটা প্রেসে, প্রুফ রিডিংএর কাজ। ভোর পাঁচটা থেকে এগারটা পর্যন্ত সময় ঠিক করেছি, যাতে ওখান থেকেই সোজা কলেজে যেতে পার।’

‘এরা কারা? জায়গাটা কোথায়? দিবাকর সব খুলে বল দেখি! দেবে কত?

‘এত অস্থির হচ্ছ কেন? পিতাজীর এক বন্ধুর প্রেস, এখন তেমন বেশী কিছু দিতে পারবে না, তবে দু এক মাস পরে একটু বলাকওয়া করলে বাড়াতে পারে।’

‘আরে এখন কত দেবে সেটা তো বল...।’

‘পঁচাত্তর, দু একমাস পরে একশ’ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এত ছটফট করছিস কেন বল তো?’ আমার ছেলেমানুষের মত অধীরতা দেখে হেসে ফেলে ও।

‘অনেক দিবাকর, অনেক’ কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বলে উঠি, ‘এটাতেই হয়তো আমি উদ্ধার পেয়ে যাব দিবাকর। আমার যে কি কষ্ট তুই জানিসনা, বাড়িতে এক মুহূর্ত শান্তি নেই...’ মনের মধ্যে যেন জোয়ার এসেছে, ‘কবে যাবি? চল, এখনি যাওয়া যাক’।

দিবাকর একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখল তারপর বলল, ‘বেশ, চল...।’

সব কথাবার্তা হয়ে যাবার পরও আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না যে সত্যি সত্যি একটা পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকরী আমি পেয়ে গেছি। আমার কেমন একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে এই দু চারপয়সার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানোই বোধহয় আমার ভাগ্যলিপি। প্রতি মাসে হাতে একসঙ্গে পঁচাত্তরটা টাকা আসবে এ যেন স্বপ্ন, এ কি সত্যি বিশ্বাস করা যায়? বেচারা ভাইসাব তো এরচেয়ে সামান্যই বেশী পান। সারাদিন খাটতে হয়। ফেরার পথে ইচ্ছে করছিল উড়ে চলে যাই, প্রভাকে গিয়ে বলি, ‘প্রভা দেখ, পেয়ে গেলাম চাকরি...।’ দিবাকরের জন্য এসব সম্ভব হল, না হলে দম আটকে মরতে হত। ওর সঙ্গেই বাড়ি পর্যন্ত এলাম। সকাল পাঁচটা থেকে এগারোটা কাজ করব ওখানে, তারপর সোজা কলেজ চলে যাব, এই স্থির হয়েছে। প্রথম পিরিয়ডে থার্ড ইয়ারের ক্লাস নাও থাকতে পারে। ভাগ্য যখন এতটাই সহায় হয়েছে তখন কলেজেও হয়ত সে সুবিধা হয়ে যাবে। নয়তো উপস্থিতি পুরো করবার জন্য প্রফেসারকে একটু খোশামোদ করতে হবে আর কি। সে ক্লাসটা না হয় ছেড়েই দেব। দিবাকরের পায়ে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

'দিবাকর, তুই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিস ভাই, নাহলে সত্যি বলছি পাগল হয়ে যেতাম। আমার বাড়ির অবস্থা তো তুই জানিস না।' কি করে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, চোখ ভরে জল আসছিল কেবলই।

'আরে যেতে দাও ভাই, আমি আর কি করেছি। দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার নামই তো বীরত্ব আমাকে তো এত উপদেশ দেওয়া হয়, এদিকে নিজে এত দুর্বল'। আমার সঙ্কুচিত ভাবটা কাটাবার জন্য দিবাকর চটকরে প্রসঙ্গটা বদলে ফেলে বলে, 'কিন্তু ভাই, বড্ড দূর হয়ে গেল, সেইটেই ভাবছি। যাওয়া আসা আর খাওয়াদাওয়ার বেশ কষ্ট হবে।'

'এমন কিছুই দূর নয়, বড়জোর মাইল দুই হবে। তার বেশী হলেই বা কি ক্ষতি? ভোরবেলা খানিকটা বেড়ানো হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, খাওয়া নিয়ে একটু সমস্যা হতে পারে।' একটু ভেবে বলি, 'যাক গে, সেও এমন কিছু সমস্যা নয়, প্রভা করে দেবে এখন। একটু ভোরে উঠতে হবে এই যা। রাত্রেও করে রাখতে পারে। দিবাকর, ওর ভারী ইচ্ছে আমি এম.এ.টা পাশ করে নিই। আজ এই খবরটা শুনে কি খুশী যে হবে।'

'আচ্ছা, ভাল কথা, সেদিন যে কিরণকে বললি...'

মিনতির সুরে বলে উঠি ওর দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে, 'ঠিক আছে ভাই, আর কটা দিন যেতে দে, একদিন বসে খুলে বলব সব কথা।'

'যা তোর ইচ্ছে। কিন্তু অত ভোরে তোর জন্য খাবার তৈরী করতে ওর কষ্ট হবেনা?' একটু চিন্তিতভাবে বলে দিবাকর, 'ওখানে পাঁচটায় পৌঁছতে হলে বাড়ি থেকে চারটে বা সাড়ে চারটের মধ্যে রওনা হতে হবে, তার মানে সাড়ে তিনটে বা পৌনে চারটেয় ঘুম থেকে উঠতে হবে, বেশ কষ্ট হবে'।

'সব ঠিক হয়ে যাবে দিবাকর, সব হয়ে যাবে। ওকে তো জানিস না, কত কষ্ট যে ও সহ্য করেছে তা কেউ জানে না। আমার জন্য ও সব করতে পারে, সব সইতে পারে।' আমার মত হতভাগার জন্য প্রভার ত্যাগ ও কষ্টের কথা ভেবে চোখে জল এসে গেল আমার। আবেগে নিচের ঠোটটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কান্না চাপতে চেষ্টা করি। প্রভার সামনেও যদি কেঁদে ফেলি ভারি খারাপ দেখাবে। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ হাঁটতে থাকি, তারপর অনেক দ্বিধা করে বলে ফেলি, 'দিবাকর কিছু ধার দিতে পারিস?'

'কত?'

'কুড়ি টাকা হলেই চলবে। মাইনে পেলেই দিয়ে দেব', আজ খালিহাতে বাড়ি যেতে মন চাইছে না। প্রভার জন্য যা হোক কিছু নিয়ে গেলে কত খুশি হবে ও। একখানা শাড়ী ওর খুবই দরকার।

'আমার কাছে তো এখন নেই। কিরণের কাছে থাকলে দিয়ে দেব। আর হ্যাঁ, শিরীষ ভাইসাহেব এসেছেন, তোর কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। আজ শনিবার তো, তাই দুপুরের গাড়িতে এসেছেন। বোনকে দেখতে গিয়েছিলেন, এতক্ষণে ফিরেছেন নিশ্চয়।'

এখন আর কোথাও যেতে বা কারো সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করছেনা, এখন

প্রভার কাছে গিয়ে আগে খবরটা তাকে জানাতে চাই। কিন্তু দিবাকরের বাড়ি থেকে টাকাটা নিতে হবে। তাছাড়া এখন আমি ওর কাছে এতই কৃতজ্ঞ যে ও যদি জাহান্নামে যেতে বলে তাও যেতে পারি। চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, রবিবারে ছুটি পাব তো?'

'নিশ্চয়। যদি কাজ করায় তাহলে ওভারটাইম দেবে।' তারপর আমাকে বোঝানোর সুরে ও বলে, 'আসলে, প্রুফ রিডিং কি ভাবে করতে হয় তুমি তো জাননা, কাজটা শিখতেও তো লাগবে অন্তত পাঁচ সাত দিন।'

'আরে ভাই, সব হয়ে যাবে, আমাকে কি তোর মত হাঁদারাম ভেবেছিস?' বলতে বলতে খিলখিলিয়ে হেসে উঠি অকারণেই।

কম্পিতহাতে টাকাগুলো পকেটে ভরছি এমন সময় শিরীষ ভাই এসে ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন, 'এই যে, আমি যেই এলাম ওমনি কেটে পড়ছ যে?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতেই তো এলাম'। মনে মনে তখন ভাবছি এই টাকায় দুখানা শাড়ী তো হয়েই যাবে। জিজ্ঞাসা করলাম 'কেমন আছে আপনার বোন?'

ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'ঠিকই আছে। একটু সময় তো লাগবেই। দিবাকর ভাই কিছু মনে কোর না, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব বলেছিলাম কিন্তু মনটা এত অস্থির হয়েছিল যে আগেই চলে গেলাম। তারপর, তোমাদের কি খবর?'

'ভালই...'

'আরে, এটা তো নতুন ব্যাপার, এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি', আমার কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন, 'তোমার টিকি কোথায় গেল?'

দিবাকরও বলে উঠল, 'ঠিক তো, আমিও দেখিনি এতক্ষণ — কি ব্যাপার?'

আমার মুখ একেবারে লাল। গতকাল চুল কাটাতে গিয়ে টিকিটা বিসর্জন দিয়েছি। শিরীষ ভাইয়ের উপহাসের ভয়, না টিকির প্রয়োজনহীনতা সম্বন্ধে সচেতনতা কোনটা যে এর কারণ তা নিজেও জানিনা। কিন্তু তারপরে এত লজ্জা করছিল, সঙ্কোচে বাইরে বেরোতে যেন সাহস হচ্ছিল না।

হাতখানা কেবলই মাথায় চলে যাচ্ছে, যেন এলোমেলো চুলগুলো সামলাচ্ছি এমন একখানা ভাব, কিন্তু আসল ব্যাপারটা সবার দৃষ্টি থেকে লুকোতে চাইছিলাম। বাড়ির লোকে চেঁচামেচি তো করবেই, বাইরেও যেই লোকের নজরে পড়বে ওমনি জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে অবশ্য ইদানিং আমি টিকিটা চুলের মধ্যে লুকিয়েই চুল আঁচড়াতাম, কাজেই চট করে কারো নজরে পড়ার কথা হয়। কিন্তু কদিন আর বাড়িতে লুকিয়ে রাখা সম্ভব? শুনতে হবে, 'জেন্টলম্যান সাজার সখ হয়েছে। ফ্যাশান করার ঝোঁকে একেবারে পাগল, ধর্ম কর্ম আর রইল না কিছু!' প্রথমে ভেবেছিলাম টুপি পরব। কিন্তু তাহলে তো সবাই আরো লক্ষ্য করবে, টুপি তো কখনও পরিনি...কেমন দেখাবে কে জানে! বাইরে রাস্তায়, বাড়িতে সদাই মনে হচ্ছে সবাই টের পেয়ে গেছে যে টিকিটা কেটে ফেলেছি।

চাকরি পাবার আনন্দে এতক্ষণ এসব কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন শিরীষভাইয়ের কথা শুনে নতুন করে লজ্জা পেয়ে গেলাম।

'ব্যস, একবার মাত্র তর্কে নেমেই মালা-কণ্ঠি সব ভুলে বসেছে,' দিবাকর পিছনে লাগার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, এতক্ষণ একসঙ্গে ঘুরলাম, লক্ষ্যই করিনি আমি।'

এবার শিরীষভাই আমার পক্ষ নিয়ে বলেন, 'যা ঠিক বুঝেছে তাই করেছে। সবাই কি আর তোর মত একগুঁয়ে?'

'ভাল হয়েছে, এখন অন্তত মানুষের মত দেখাচ্ছে, এতদিন তো কার্টুন ছবির মত চেহারা করে ঘুরত?' দিবাকর অকারণে খানিকটা হাসল। এখন আমার মনের অবস্থা এমন যে কারো কোন কথাই খারাপ লাগছে না। চটপট এই সব শিষ্টাচারের পালা শেষ করে কতক্ষণে যে প্রভার কাছে পৌঁছব — কি যে খুশি হবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে শিরীষভাই এবার অন্য প্রসঙ্গে চলে এলেন। 'তা, ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটি কি তা তো বললে না তুমি?'

বিষয়টা পালটে যাওয়ায় আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সেদিন থেকেই আমি ওঁর ঐ কথাটা নিয়ে চিন্তা করছি। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার আমার কাছে ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না। যেটুকু জানি সেটুকুও সঠিক ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারব কিনা সে বিষয়েও মনে সন্দেহ ছিল। উত্তর দিলাম, 'আমার মনে হয় আত্মজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক চিন্তনই...' কথার মাঝখানেই উনি বলে উঠলেন, 'ওগুলো সব বেজায় শক্ত শক্ত কথা ভাই, আমি ওর মানেই বুঝতে পারি না। তুমি হয়ত চেষ্টাচরিত্র করে অর্থটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু তাহলেও ওগুলোর উপযোগিতা এবং প্রয়োজন কি তা আমার বোধগম্য নয়। তাই একটু যদি...'

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। তারপর কোনমতে বললাম, 'সোজা করে বলতে গেলে, নিজের এবং বিশ্বসংসার সম্বন্ধে জ্ঞান বলা যেতে পাবে।'

আমার কথা থামিয়ে দিয়ে চটপট জবাব দিলেন, 'সংসার মিথ্যা, মায়া এবং ব্রহ্মার অংশ, তোমার বাপ মা, ভাই বোন, পত্নী পুত্র সবই মায়া, তুমিও তাদের কাছে মায়া ছাড়া কিছুই নও। সুতরাও এই সমস্ত মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে ফেল তবেই হবে আত্মজ্ঞান। বিবাগী হয়ে চলে যাও হিমালয়ের গুহায় তাহলে সবরকম বন্ধন আপনিই কেটে যাবে। বাঃ ভাই, বাঃ চমৎকার' হো হো করে হেসে উঠলেন শিরীষভাই।

আমি যেন আচমকা একেবারে নিভে গেলাম, বেশ কিছুক্ষণ কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না। এবার উনি নিজেই আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'শোন ভাই, এই পলায়ন আর পরাজয়মুখী দর্শনই আমাদের আজ এই অবস্থায় এনে ফেলেছে। ছেলে বাপকে মায়া ভাবছে আর বাপ সন্তানকে মায়া মনে করছে এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে? একে অন্যকে এর চেয়ে বড় অপমান আর কি করতে পারে? যে নারী তোমাকে জন্ম দিয়েছেন তাঁকে তুমি বলছ 'নরকের দ্বার' আর যে স্ত্রীকে তুমি তোমার

সন্তানের জননী করতে চাও তাকে বলছ 'কুম্ভীপাক' এটাকি একেবারে চূড়ান্ত অকৃতজ্ঞতা নয়?'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই তো থাকে না,' বললাম আমি।

'সেইজন্য' কি মানুষকে আত্মহত্যা করতে হবে? বাঃ ভাই, কি চমৎকার দর্শন তোমাদের!' এবার সত্যিই একটু আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন শিরীষভাই, 'আত্মহত্যাকে কি সুন্দর সব নাম দেওয়া হয়েছে — আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া, মায়া মোহের বন্ধন থেকে মুক্তি, স্থিতপ্রজ্ঞতা! ওহে, কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছিল এ সংসারে আসবার জন্য, এসে সবাইকে কৃতার্থ করার জন্য? বাজীকর হাত নেড়ে একটা বল বার করে ফেলেলেন, তোমার হাতে ধরিয়ে দিলেন ব্রহ্মা, দু নম্বর বল বেরোল, এসে গেল মায়া, তিন নম্বরে জন্ম নিল যাবতীয় গুণ — নাও এবার, বাতাসে কি চমৎকার দার্শনিক তত্ত্বের প্রাসাদ গড়া হয়ে গেল। তুমি এখন ঘর সংসারের সব দায়িত্ব ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে ব্রহ্মজ্ঞানের খোঁজে বেরিয়ে পড়...।'

আমি বললাম, 'এতে অনেক বাজে ঝঞ্ঝাট আর চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।'

'ঠিক বলেছ, বাড়িতে কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে হয়ত, এদিকে তোমার তো ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, সুতরাং তুমি বসে গেছ ধ্যানের আসনে। এখন দুর্ঘটনার দিকটা কে সামাল দেবে শুনি? ব্রহ্মজ্ঞান যেন মদের বোতল, পান কর আর পড়ে থাক বুঁদ হয়ে। ঘর সংসার চুলোয় যাক, পরিবার কুয়োয় ডুবে মরুক।' হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে এমনভাবে বলে ওঠেন, 'আচ্ছা ধর, তোমার বাপ মা তোমায় লেখাপড়া শেখাননি, ভালকরে খেতে পরতে দেননি, পালন পোষণ করেননি ঠিকমত — তখন বড় হয়ে বাপ মাকে কথা শোনাও কেন? এটা কেন মেনে নাও না যে তাঁদের সম্ভবত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল এবং সন্তানদের তাঁরা 'মায়া' বলে ভেবেছিলেন? মায়ার জন্য আবার ঝামেলা পোয়ানোর দরকারটা কি? সেইজন্যই তারা সন্তানদের কথা ভাবেন নি।'

এবার আমি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। ব্রহ্মজ্ঞানের এই রূপ তো কখনও মাথায় আসেনি। এই ভাবে দেখতে গেলে তো সত্যিই এটাকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং কৃতঘ্নতা বলে স্বীকার করতেই হবে। আমি আবার আলোচনার ধারাটা অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করি, 'এত ওপর ওপর স্থূলভাবে বিচার করলে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঠিকমত বোঝা যায়না। এমন অনেক ব্যাপার ঘটে যার অলৌকিকত্ব বা ঐশ্বরীয়...'

'তোমার এই দৈব আর অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ শুনে একটা কথা মনে পড়ে গেল,' শিরীষভাই মুচকি হেসে বলেন, 'কতদূর সত্যি জানিনা তবে শুনেছি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে নাকি এটা ঘটেছিল। শোনা যায়, একবার কোথাও যেতে যেতে পথে একটি নদী পার হবার দরকার হল। স্বামীজী অপেক্ষা করছেন, ওপার থেকে খেয়া নৌকা ফিরে এলে উনি পার হবেন। এইসময় এলেন এক মহাপুরুষ। পরিচয় হল।

মহাপুরুষ যখন শুনলেন স্বামীজী নৌকার জন্য প্রতীক্ষা করছেন তখন তিনি ভৎর্সনা করে বললেন এই রকম সব তুচ্ছ বাধার মুখোমুখি এসেই যদি থেমে পড় তাহলে সংসারে চলবে কি করে? তুমি হলে স্বামী বিবেকানন্দ, কত বড় একজন আধ্যাত্মিক গুরু এবং দার্শনিক বলে লোকে তোমাকে জানে। এই সামান্য নদী তুমি পার হতে পার না? দেখ কি করে নদী পার হতে হয়। মহাপুরুষ খড়মপরা পায়ে খটখট শব্দ তুলে নদীর জলের ওপর চলতে শুরু করলেন, বেশ কিছুটা ঘুরে এসে চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন, 'আমেরিকা ঘুরে এলে আর ভাষণ দিলেই স্বামীজী হওয়া যায়না। তারজন্য তপস্যা এবং সাধনা করতে হয়।' মহাপুরুষের শক্তি দেখে স্বামীজী সত্যি অবাক হয়েছিলেন, তিনি প্রশ্ন করেলেন, 'মহারাজ,' আপনি কোথায় আর কিভাবে এই সিদ্ধিলাভ করেছেন?' নিজের শক্তি এবং স্বামীজির মূঢ়তা দেখে গর্বিত মহাপুরুষ মুচকি হেসে বলেন, 'এ সিদ্ধি সহজে মেলেনি। এরজন্য হিমালয়ের গুহায় বসে তিরিশবছর তপস্যা করতে হয়েছে আমাকে। এবার স্বামীজী হেসে ওঠেন মহাপুরুষের কথা শুনে।' শিরীষভাই এইখানেই থামলেন সম্ভবত আমাকে প্রশ্ন করার অবসর দিতে।

সত্যি গল্পটা ভারি চিত্তাকর্ষক আর শিরীষভাই এমন জায়গায় এসে থেমে গেলেন যে আপনা থেকেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'কেন? এতে হাসির কি আছে?'

'সেই তো', স্বামীজী বললেন, 'হে মহাত্মন, আপনার এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে সত্যি আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। কিন্তু ভগবান, মাত্র দু পয়সা খরচ করলেই তো নদী পার হওয়া যায়, তারই জন্য আপনি জীবনের তিরিশটি বছর নষ্ট করলেন? মাত্র দুপয়সার জন্য তিরিশটি এমন বৎসর যা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। তিরিশটা বছর আপনার কেটে গেল এই সাধনায় আর বাকি জীবনটা কাটবে এই সিদ্ধি দেখিয়ে। সারা জীবন আপনি নদী পার হবেন আর জনতার শ্রদ্ধা কুড়োবেন। এই তিরিশটি বছর কি আপনি মানুষের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে পারতেন না? ধরুন, এমন কোন একটা ওষুধ যদি খুঁজে বের করতেন যা কোন রোগনিরাময়ের উপায় হত! গল্পটা শেষ করে শিরীষভাই বললেন, 'এটা সত্যি কাহিনী না বানানো তা অবশ্য আমি জানিনা কিন্তু এই সত্যকে তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পার না যে মানুষ যখন রোগব্যাধি আর অনাহারে ছটফট করছে আর মরে যাচ্ছে সেইসময়ও আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি মানবমুক্তির জয়গান গাইছে। শূদ্র এবং স্ত্রীজাতিকে কাবাবের মত ভাজা ভাজা করে খাচ্ছে আর সেই মুখেই সর্বজীবে সমভাবের জয়ধ্বনি ঘোষণা করছে। পিঁপড়ে থেকে হাতি পর্যন্ত সর্বজীবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব দেখছি আমরা, অথচ শম্বুক আর সীতাও যে জীবিত প্রাণী সেটা বোঝারও শক্তি নেই আমাদের। তাদের ওপর কোন অত্যাচারটা করতে বাকি রেখেছি আমরা?'

হঠাৎ মনে হল শিরীষভাইয়ের কথা আর শুনতে পাচ্ছিনা। আমি যেন অপরাধীর মত প্রভার সামনে দাঁড়িয়ে আছি নত মস্তকে। এই অপরাধবোধ মর্যাদা-পুরুষোত্তম

রাজা-রামকেও কি কখনও মুহূর্তকালের জন্যও ভিতর থেকে মাথা নত করিয়ে দেয়নি? সীতার সামনে কোনদিন কি তাঁকে নিরুত্তর হয়ে দাঁড়াতে হয়নি? হঠাৎ যেন আমার দমবন্ধ হয়ে এল। মনে হল এখন এই মুহূর্তে আমার থাকা উচিত প্রভার কাছে, আর আমি কিনা এখানে বসে বসে তর্ক করছি। এই তর্ক শেষ করি কি করে? পালাতেই হবে। কিন্তু এঁর কথাগুলোর একটা আকর্ষক শক্তি আছে উঠে যেতে ইচ্ছাও করেনা।

উনি বলে চলেছেন, 'সবচেয়ে বড় অসুবিধা এইটেই যে আমাদের ইতিহাস নেই। অন্য সব জাতির সত্য ইতিহাস কিনা জানিনা কিন্তু এটা নিশ্চিত বলা যায় যে আমাদের যা আছে তা ইতিহাস নয়, তা পুরাণ, পুরাণে ইতিহাস আর কাব্য মিলিয়ে মিশিয়ে এমন এক বস্তু তৈরী হয় যার মধ্যে থেকে সত্য আবিষ্কার করা অতি কঠিন কাজ। যখনই ঐতিহাসিক সত্য এবং তথ্যকে কাব্যরূপ দেওয়া হয় তখনই একটি বিশেষ অভিপ্রায় নিয়ে বাস্তবে যা ঘটেছিল তার অনেক অদল বদল করা হয় ফলে অর্থও পরিবর্তিত হয়ে যায়। তারওপর প্রতি যুগেই পুরাণগুলিকে এতবার করে নতুন নতুন কাব্যরূপ দেওয়া হয়েছে যে তার সত্যরূপটি কেমন ছিল তা আর জানাই যায় না। একথা তো কারো কাছেই অজানা নয় যে প্রত্যেক যুগই, নিজের নিজের পরিস্থিতি আর সমস্যাগুলোর আলোকে পুরাণকে দেখতে বুঝতে চায় সেই হিসেবমতই পুরাণকে ভেঙে গড়ে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, শুধু তাই নয় পুরাণের প্রাচীন পোশাকের মধ্যে নতুন যুগের আত্মাকেও ভরে দেওয়া হয়। তারপর শত শত বৎসর ধরে শ্রুতির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসতে আসতে সত্যের কতটুকু আর বাকি থাকে নিজেই ভেবে দেখ। একটা সামান্য ঘটনা মাত্র পাঁচমিনিটের মধ্যে এক কান থেকে আর এক কানে পৌঁছতে পৌঁছতে কতখানি বদলে যায় এ তো নিজেরাই দেখেছ। কবিতার মধ্যে তো যেটুকু ইতিহাস থাকে তা রূপক, প্রতীক, উৎপ্রেক্ষা আর ব্যঞ্জনায় একেবারে ঠাসা।

ওর কথাগুলো কিছুটা কানে যাচ্ছিল, কিছুটা যাচ্ছিল না। উনি বোধহয় সেটা বুঝতে পেরে বললেন, 'আমার কথা শুনতে কি তোমার ভাল লাগছে না?'

'না না, তা কেন? একথা কেন বলছেন?'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি বোধহয় কোন কারণে চিন্তিত।'

'না, না, ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি তো-তো করতে করতে বলে ফেলি, 'আজ আমার একটু তাড়া আছে। বাড়িতে একটু কাজ আছে। আপনার কথাগুলো শুনতে এত ভাল লাগছে যে ছেড়ে যেতেও মন চাইছে না। খুব নতুন নতুন সব কথা, চমক লেগে যাচ্ছে।'

'আরে আগে বলবে তো যে আজ তাড়া আছে তোমার। আচ্ছা ছেলে যাহোক।' উনি উঠে দাঁড়ালেন, 'আমার তো বকবক করা রোগ, আমি লোকটি বেশ বাচাল। তুমি তোমার কাজ থাকলে আগেই বলে দিও।' নিজের দুর্বলতার কথা হাসতে হাসতে বলে ফেললেন উনি, তারপর আবার বললেন, 'তোমাদের রেজাল্ট বেরোবার তো সময় হয়ে এল, তাই না? চারদিকে আজকাল ঐ কথাই শুনছি কেবল।'

'সেই চিন্তাতেই তো শুকিয়ে যাচ্ছি, কে জানে কি হবে!' সত্যি সত্যিই বেশ ভয় করছে। ফ্যাকাশে হাসি হেসে বলি, 'আমার ছোটভাই এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে। তার তো সবসময় ঐ এক চিন্তা, রাত্রে ঘুমোয়না বোধহয়। আজ মন্দিরে গিয়ে দীপ জ্বেলে আসছে, কাল কোথায় জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে হাজির হচ্ছে, কোনদিন হনুমানজীর চোলা, কোনদিন মহাদেবের প্রসাদ...' এবার দিবাকর বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, ওর সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলব ভাবছিলাম। প্রায়ই ওকে দেখি এদিকে ওদিকে। বয়সটা তো বড় কাঁচা কিনা, ওর ওপর একটু নজর রাখা দরকার, না হলে বিগড়ে যেতে পারে। যে সব ছেলেদের সঙ্গে ওকে দেখি তারা তেমন সুবিধের নয়।'

'আমিও সবই দেখছি দিবাকর, কিন্তু কিছু করতে পারছি না, কি আর বলব তোমায়!' দুঃখে মাথা নিচু হয়ে গেল, প্রভার সঙ্গে কি অসভ্য ব্যবহার করেছে সে কথা আবার মনে পড়ে গেল। শিরীষভাইকে নমস্কার জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

দিবাকর আমার সঙ্গে বাইরে এসেছিল। বলল, 'যখন তোমরা সভ্যতা আর সংস্কৃতির ছাল ছাড়াচ্ছিলে সেই সময়ে আমি তোমার সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বের করেছি।'

'কি শুনি?' আজ দিবাকর দেখছি দেবদূতের মত আমার সব সমস্যাই সমাধান করে ফেলছে। সত্যিই তো কতবড় সমস্যা আজ ও সহজ করে দিয়েছে।

'সাড়ে চারটে পৌনে পাঁচটায় এখান থেকে একটা গাড়ি আছে, যেটা পাঁচ দশ মিনিটে রাজামণ্ডী পৌঁছে যায়, ব্যস, ওখান থেকে চটপট হেঁটে চলে যাবি।'

'আরে ঠিক তো, আমার এটা খেয়ালই হয়নি,' খুব খুশি হয়ে বলি, 'যাক এ সমস্যাটাতো বেশ সহজেই মিটে গেল।'

'কিন্তু যেতে আসতে রোজ দু আনা খরচ হবে,' দিবাকর আবার চিন্তিত হয়ে পড়ে।

আমি ওর হাতে হাত মিলিয়ে চলতে চলতে বলি, 'আরে ছাড় তো, ওসব কোন ঝামেলাই নয়, কে টিকিট কিনতে যাচ্ছে? এমন কায়দা করব যে টি.টি.র বাবা এলেও ধরতে পারবেনা,' অকারণেই হো হো করে হেসে উঠে চলে এলাম। কিন্তু একখানা শাড়ীর দাম বারো টাকা শুনে মনটা দমে গেল।

ভেবেছিলাম অন্তত দুখানা কাপড় নিয়ে যাব। যাক গে একটাই হোক এখন। এই বা কি কম? শাড়ীর প্যাকেটটা একবার এ হাতে একবার ওহাতে লোফালুফি করতে করতে চলেছি, মাঝে মাঝে এ বগল থেকে ও বগলেও চলে যাচ্ছে। পা যেন মাটিতে সোজা পড়ছেই না। পথটা যদি বরফের পাহাড়ের মত ঢালু আর পিছল হত কেমন হু হু করে পৌঁছে যেতাম বাড়িতে। শাড়ীটা প্রভার হাতে দিলেই খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠত। মনে হচ্ছে যেন সোজা আকাশ থেকে নেমে আসছি। চলতে চলতে আপনমনে হাসছি, নিজের মনে বিড় বিড় করে কথাও বলছি, মাঝে মাঝে আঙুলের কড় গুনে হিসেব করছি আবার মাথা ঝাঁকিয়ে ঠোঁট টিপে বন্ধ করে ফেলছি। নিজের পাগলামীতে নিজেই হেসে ফেলছি পরমুহূর্তে। এখন ঈশ্বরের কৃপায় রেজাল্টটা যদি ভাল হয় তাহলে কি আনন্দই যে হবে। সব দুঃখের অবসান ঘটবে। তারপর এম.এ.টা করতে আর কতই বা দেরী লাগবে।

ঈশ্বর করুন...শিরীষ থাকলে হয়ত এখনি ঈশ্বরেরও ছাল ছাড়িয়ে নিত। মূর্খ একেবারে। কিন্তু কথাগুলো ঠিকই বলে। তবে, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম সব ছাড়লে কি চলে? বলে কিনা, এখন আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি সেখানে মানবতাবোধ ছাড়া আর কোন ধর্মের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের ধর্ম তো অনাদি। এইটুকু কথা নিয়েই তর্ক চলল দুটি ঘন্টা। আমি কতক্ষণে প্রভার কাছে পৌঁছব তারজন্য ব্যস্ত, ওদিকে সে তর্ক করেই চলেছে। আহা, ও বেচারী যে কত কষ্ট সহ্য করেছে! এই প্রথম কিছু একটা ওর জন্য হাতে করে নিয়ে চলেছি।

কিন্তু একটু পরেই আনন্দের জায়গায় শুরু হল দুশ্চিন্তা। এইদিকটা তো আমি ভাবিই নি। প্রভাকে এটা দেব কি করে? সত্যি এ যে ভীষণ সমস্যায় পড়া গেল। সবার সামনে দিলে ভাল দেখাবে না। মা আর ভাবীর যে ভাল লাগবে না সে তো জানা কথা। আচ্ছা, যদি শাড়ীটা নিয়ে গিয়ে আগেই মায়ের হাতে দিই; বলি তোমার জন্যই এনেছি। বুঝতে নিশ্চয় পারবে, এই তো সদ্য সদ্য শাড়ী নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেল। মা নিজেই ওকে দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, এই ঠিক হবে। অনেক ঝামেলার হাত এড়ানো যাবে। কত তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে আমাদের বাড়িতে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। তা ওরাই বা কি করবে, বাড়ির অবস্থা যে সত্যিই শোচনীয়। ভাইসাব সারাটাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর যা পান সেটা কি একটা মাইনে হল? ভাগ্যে বাড়িটা নিজেদের তাই রক্ষা। এর ওপর যদি বাড়িভাড়া দিতে হত টের পাইয়ে দিত। অন্তত তিরিশ টাকা ভাড়া তো লাগতই। রীতি অনুযায়ী প্রথম রোজগারের টাকায় কেনা কাপড় তো মাকেই দেওয়া উচিত। যদি তাই দিই তো সত্যিই খুব খুশি হবে কিন্তু...

বাড়ির দরজা দেখা দিতেই এ সব চিন্তা কর্পূরের মত উবে গেল। ঢুকতে না ঢুকতে কুঁয়ার প্রশ্ন করল 'ভাইয়া ওটা কি এনেছ?' সহজ স্বরেই বলে ফেললাম, 'কিছু নয়, তোর ভাবীর জন্য একটা শাড়ী, ওর কাপড় নেই কিনা'। আর কিছু প্রশ্ন না করে ও যেখানে যাচ্ছিল চলে গেল। প্যাকেটটা নিয়ে গিয়ে সোজা মায়ের কোলের ওপর ফেলে দিলাম। মা জিজ্ঞাসা করল, 'কি এটা'। তখন সত্যিই আমার মনে হচ্ছিল মা যদি এটা নিজেই রেখে দেয় তো আমি কিছু বলব না। কি আর হবে, প্রভার জন্য আর একখানা কিনে আনব। এই সময় দেখতে পেলাম প্রভা এককোণে বসে চাটনী পিষছে। তখনি মনে হল, না মায়ের চেয়ে প্রভার দরকার বেশী। প্রথম বেতন পেলেই প্রভার জন্য কাপড় আনতেই হবে, এটা মা যদি নেয় তো নিক।

মা বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমার জন্য না আরো কিছু।' মুচকি হেসে বলল, 'নিজের বউয়ের জন্য এনেছিস সেটা বলছিস না কেন?' মা বাণ্ডিলটা খুলতে শুরু করল, বাচ্চা কোলে নিয়ে ভাবীও এসে দাঁড়াল শাড়ী দেখতে।

মা এবং ভাবী দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'এ তো খুব সুন্দর শাড়ী'। এই সময় কুঁয়ার এসে দাঁড়াল সেখানে এবং বলে উঠল, 'ভাবীর জন্য এনেছে'।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কি আর আমি বুঝিনি নাকি?' মা এমনভাবে বলে উঠল কথাটা যেন গতজন্ম থেকেই তার এটা জানা ছিল।

'না, না, এখনি তো আমাকে বলেছে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতেই,' কুঁয়ার কতখানি সত্যিকথা জানে সেটা দেখাবার জন্যই জোব দিয়ে বলে উঠল।

মায়ের মনের খুশিটুকু একেবারে নিঃশেষে উড়ে গেল। আমি কটমট করে তাকালাম কুঁয়ারের দিকে, কিন্তু অন্ধকারে সে সম্ভবত দেখতেই পেল না, অথবা আমার বিরুদ্ধে মাকে উসকে দেবারই ইচ্ছা ছিল ওর। নিয়মরক্ষা করার মত মা শাড়ীখানা উল্টে পাল্টে দেখে তারপর পাট করে এগিয়ে দিল আমার দিকে, 'নে...' 'তুমিই রেখে দাও মা আমি কি করব?' আমার নিজের আর কুঁয়ারের দুজনকার ওপরই রাগ ধরছিল। একবার মুখে এসে গিয়েছিল, 'তুমি দিয়ে দিও।' কিন্তু চুপ করেই রইলাম।

'যার জন্য আনা তাকে নিজেই তো দিতে পারিস, এরমধ্যে আবার আমাকে টানা কেন?' এমন কটুতার সঙ্গে কথাগুলো মা উচ্চারণ করল যে কাপড়খানা আমাকে তুলে নিতেই হল। চুপচাপ ওপরে গিয়ে খাটের ওপর রেখে দিলাম। এত আনন্দ আর উৎসাহ সব যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। সেইদিনই খেতে বসে আমি বলে ফেললাম, 'ভাইসাব, আমি ভাবছি থার্ডইয়ারে এডমিশন নিয়ে নিই।' ভয় করছিল এই শুনেই এখনই আবার একটা কাণ্ড না বেধে যায়।

ভাইসাবের মুখের গ্রাস চিবোন বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন আমাকে চিনতে পারছেন না। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবুজীকে বলেছ?'

'আপনি বললে বাবুজী রাজী হয়ে যাবেন।' উনি চটে গেলেন না দেখে আমার একটু সাহস হল, নিজের বক্তব্য একটু খুলে বলতে চেষ্টা করলাম, 'ভাইসাহেব কথা হচ্ছে, একটা ডিগ্রী না থাকলে ভাল চাকরি পাওয়া যাবেনা। বড় বড় বি.এ., এম.এ. কতই তো বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ক্লিষ্ট স্বরে বলেন ভাইসাব, 'সে তো ঠিক কথা, কিন্তু ডিগ্রীর খরচ আছে তো? বি.এ পড়ার খরছ অনেক। অমরটা তো পাশ করবে বলে মনে হয়না...'

এবার একটু দৃঢ়স্বরে জানাই, 'বি.এ.পড়ার খরচ আমি নিজেই চালিয়ে নেব, তারজন্য আপনাদের ভাবতে হবেনা।' চাকরির কথাটা মুখে এলেও বলতে পারলাম না।

'কিন্তু ভাই, তুমি তো একলা নও, অন্যজনও তো আছে', স্পষ্টই প্রভার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

'সে সব আমি সামলে নেব ভাই সাব, আপনি শুধু বাবুজীর মতটা করিয়ে দিন,' খোশামোদ আর জিদের সুরে অনুনয় করি আমি।

'তোমার যা উচিত মনে হয় কর। কিন্তু বাবুজীকে আমি বলতে পারবনা, এমনিতেই ওঁর চিন্তায় মাথার ঠিক নেই।' ভাই সাহেব ক্ষুব্ধভাবে চুপ করলেন। বাবুজীর ক্রোধের মুখোমুখি আমাকেই দাঁড়াতে হবে। তার জন্য বেশী অপেক্ষাও করতে হল না।

শাড়ী পেয়ে প্রভা রাগও দেখাল কিন্তু খুশিও হল। গম্ভীর হয়ে বলল, 'শাড়ী এনে তো খুব করলে, মাকে দিলে তো চটিয়ে!'

'তুমিই বল কি করতে পারি? সত্যি যদি কিছু দোষ করে থাকি তো বল, আমি তো ভেবেইছিলাম মা যদি এটা নিয়ে নেয়, তোমার জন্য আর একটা নিয়ে আসব' আমি আন্তরিকভাবেই সত্যি কথাটা বলে ফেলি।

'উঃ, খুব যে বড়লোকি দেখানো হচ্ছে! ব্যাপার কি বল তো, টাকা কুড়িয়ে পেয়েছ নাকি কোথাও?' প্রভা চোখ নাচিয়ে মিষ্টি সুরে প্রশ্ন করে।

আমি চেষ্টাকৃত একটা অবহেলার ভাব দেখিয়ে বলে ফেলি, 'একটা চাকরি পেয়ে গেলাম কিনা' যেন ব্যাপারটার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নেই।

'অ্যাঁ? সত্যি বলছ?' উছলে ওঠে প্রভা ওর অবাক দৃষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ে খুশি আর কৌতূহল। 'আচ্ছা লোক তো তুমি! চুপচাপ বসে আছ, এতক্ষণ কিচ্ছুটি বলনি? কেমন সহজে বলে ফেলা হল, যেন কিছুই হয়নি।'

ওর উৎসুক অস্থির আনন্দ ভারি ভাল লাগল। তবু সেই কৃত্রিম সহজভাবটা বজায় রেখে বলি, 'আহা, কি এমন ব্যাপার? বলতামই তো একসময়।'

প্রভার সারাদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে আনন্দে। ফোটা ফুলে ভরা একটি তরুশাখার মত ও খুশিতে ঝলমল করছে, ওকে দেখে বুঝতে পারছি ঘটনাটার তাৎপর্য কত বিরাট। দুই বাহুর আলিঙ্গনে বেঁধে চুমোয় চুমোয় ভরে দিলাম ওর মুখখানি, 'প্রভা তোমায় একটু খ্যাপাচ্ছিলাম আরকি। এটা না হলে আর পড়াও হবেনা সেইটেই ছিল আমার দুশ্চিন্তা।'

প্রভা যখন একটু সহজ হয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারল তখন প্রশ্ন করল, 'কত দেবে?'

'সেটা আর জানতে চেয়োনা। এইটুকু ধরে নাও যে পড়ার খরচাটা উঠে যাবে। এ চাকরি যদি টিকে থাকে তো এম. এ. পর্যন্ত করে নিতে পাবব।' আমি যেন সেই সুদূর ভবিষ্যতের ছবিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

প্রভা অস্থিরভাবে আমার দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠে, 'তবু, কত মাইনে সেটা বলবে তো?'

ওর অধৈর্য ভাব দেখে আমার মনের মধ্যে যেন মজার সুড়সুড়ি লাগছে। বেশ আরাম করে শুয়ে পড়ি প্রভার কোলে ওর বিনুনিটা নিয়ে খেলতে শুরু করি, যেন ওর প্রশ্নটা কানেই যায়নি। নিজের মনেই বলে যেতে থাকি, 'প্রথমেই গিয়ে কলেজে নামটা লিখিয়ে ফেলতে হবে। তারপর ফিসটা মকুব করিয়ে নেব। যেমন করে হোক তোমার জন্য অনেক অনেক জামাকাপড় আনব। দুখানা শাড়ী, ব্লাউজ, শীতের জন্য কোট।

বেশ রাগ দেখিয়ে প্রভা বলে, 'যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দেবেনা, কেবল রাজ্যের বাজে কথা বলে যাচ্ছ। আমার হাতখানা ছিল ওর হাতের মধ্যে, আমার আঙুলগুলোতে দাঁতের চাপ দিতে দিতে বলে, 'এবার তো বলবে?' ক্রমশঃই বাড়ছে দাঁতের চাপ।

'আর বুঝলে, বাড়ি থেকে একটি পয়সার জিনিসও নেবার দরকার নেই। যা চাই সব নিজেরাই কিনে নেব।' আমি বলেই চলেছি কথা।

'বল, শীগগির বল,' আরো জোরে আঙুলে দাঁত বসে গেল।

'উঃ ছাড়, ছাড় আঙুলটা কেটে নেবে নাকি?' এবার ব্যথা পেয়ে বলে উঠি।

'তাহলে বলছ না কেন?' ও নিজের দুষ্টুমিতে নিজেই অপরাধবোধ করে রেগে উঠে আমার দিকে চেয়ে থাকে। আঙুলের ওপর দাঁতের দাগ দেখে আমি দুম করে ওর পিঠে এক কিল বসিয়ে দিই, 'বোকা মেয়ে, এক্ষুনি আমার আঙুলটাই কেটে নিতে।' পরক্ষণেই মনে হয়, ওকে কষ্ট দিলাম না তো? যেন বাচ্চাদের মত ঝগড়া করছি, আমার হাসি পেয়ে যায়। হাসি চেপে সমস্ত ব্যাপারটা যে ঠাট্টা তাই বোঝাতে বলে উঠি, 'তিনটে বাচ্চার মা হবার বয়স হয়ে গেল এখনও নিজেই খুকী রয়ে গেলে। বাবাঃ দাঁতে যেন ইঁদুরের মত ধার।'

প্রভা রাগ করে আমার মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'এই আড়াইমন বোঝা আমার কোলের ওপর দিয়ে তারপর আবার মারপিট।' মুচকি মুচকি হাসছে ও, আমার ভয় হচ্ছিল কিলটা বেশী জোর হয়ে যায়নি তো?

এবার চটপট মিটমাট করে ফেলি, 'আচ্ছা বাবা, বলছি, বলছি। কিন্তু আগে আমায় মাথাটা রাখতে দাও।' আবার আরাম করে মাথাটি ওর কোলে রেখে এবার সব কথা খুলে বলি।

সে রাতে বহুক্ষণ ধরে গল্প করলাম আমরা। আমার কল্পনার যেন ডানা গজিয়েছে। বারে বারে, একটু পর পরই আমি নিজের স্বপ্নগুলো বর্ণনা করে চলেছি। এটা তো স্থির হয়েই গেছে যে এম. এ তে ডিভিসন যদি ভাল থাকে তো কোথাও না কোথাও একটা প্রফেসরশিপ পেয়েই যাব। ওকে খ্যাপাবার জন্য বলি, 'তোমারই তো মজা। এই তো বিদ্যের বহর, ওদিকে নাম হয়ে যাবে প্রফেসরনী। কি রকম প্রফেসরনী সেটা লোকে দেখুক এসে!'

প্রভা রাগ করে বলে, 'বেশ, বেশ খুব উচ্চশিক্ষিত দেখে তখন একটি নিয়ে এসো না হয়। ছাত্রীদেরও তো পড়াতে হবে, তাদের থেকেই না হয় বেছে নিও।'

আমি ওকে খুশী করার জন্য বলি, 'আমাদেরটিকেই না হয় শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া যাবে।'

রাগটাগ ভুলে গিয়ে প্রভা বলে ওঠে, 'এখন থেকেই বলে রাখছি কিন্তু, পরে আবার কোন ওজর আপত্তি তুলতে পারবে না, আমি কলেজে ভর্তি হব।'

'যা তোমার প্রাণ চায় তাই তুমি করবে প্রভা! তুমি তো তখন নিজের সংসারে রাণী, কে তোমায় বাধা দেবে?' আমি আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি, 'শোন, আমাদের একটা ভাল লাইব্রেরী থাকবে, নতুন নতুন বই কিনব। দু তিনখানা পত্রিকাও আনাতে হবে।'

'রেডিও না থাকলে কিন্তু বাড়িটা বড় ফাঁকা লাগবে।' প্রভা বলে। আমি এবার দুষ্টুমি করে বলি, 'না-না, ফাঁকা লাগবে কেন? তার ব্যবস্থা তো আগেই করতে হবে। জলজ্যান্ত রেডিও তো তখন সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াবে'।

এবার লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে প্রভা। কোন কিছুই আর তখন অসম্ভব বলে মনে হয়না। প্রভার কোমল বাহুতে মাথা ঠেকিয়ে পৃথিবীর কঠিনতম সমস্যাও তখন আমার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয়। দুনিয়ার সমস্ত বাধাকে জয় করবার শক্তি আমার আছে। আমি একটা করে পরিকল্পনা পেশ করছি আর প্রভা তাতে ইচ্ছেমত সংশোধন করছে, আর প্রভা যা বলছে আমি তাতে কিছু না কিছু খুঁত বের করছি। সেদিন রাতে আমরা, বাগানে কি কি ফুল লাগানো হবে তার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাংলোর ফটকে নামের প্লেটখানা কেমন হবে সেটা পর্যন্ত সবকিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ফেললাম। মাঝে মাঝে অবশ্য খেয়াল হচ্ছিল যে এসব কথা এখন কতখানি নিরর্থক, তখন নিজেরাই আবার বলাবলি করছিলাম, একেই বলে 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল', কোথায় কি তার ঠিক নেই এদিকে সব ব্যবস্থা করে ফেলছি! একটুক্ষণ হয়ত চুপ করে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আবার নতুন উৎসাহে কথা শুরু হয়ে যাচ্ছিল। আর সব আলোচনার শেষে সেই একটা কথাই উচ্চারিত হচ্ছিল, 'বাস, এই মাঝে কিছুদিন কষ্ট ভোগ করতে হবে তারপরই তো মুক্তি। আর একটু সাহস করে সহ্য করে নাও প্রভা, তারপর তোমায় রাণী বানিয়ে দেব — রাণী!' পরিবর্তে প্রভাও আমাকে আশ্বাস দিচ্ছিল যে সংসারের সব কষ্ট ও মুখবুজে সহ্য করে নেবে, বিশ্বাস আর কৃতজ্ঞতায় আমার সমস্ত অন্তর তখন গদগদ হয়ে উঠছিল। যখন মনে পড়ল যে এইসব পরিকল্পনায় বাড়ির অন্য লোকেদের কথা তো ভাবাই হয়নি, তখন আমি বললাম, 'একটি ভাইকে আমার কাছে রেখে পড়াব। অমরকে নয়, ওটা ভারি বেয়াড়া, আমি কুঁয়ারকে কাছে রাখব, ও সরল সোজা ভাল ছেলে। মা বাবুজীতো বাড়ি ছেড়ে আমাদের কাছে গিয়ে থাকবেন না, মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করবেন নিশ্চয়। ভাইসাহেবেরও বোঝা একটু হাল্কা হবে।' প্রভা কোন কথা বলল না।

সে রাত্রে হৃদয়ের সমস্ত কল্পনার দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল, স্বপ্নগুলো সব গানের মত বেরিয়ে এসেছিল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। আমাদের দুজনকার মন প্রাণ একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল আর সাতরঙা রামধনুর সেতু বেয়ে যেন বর্তমান থেকে পৌঁছে গিয়েছিল ভবিষ্যতের সোনার সংসারে। যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে চলেছি সেতু বেয়ে আর মাথার ওপর সারাটা আকাশ ভরে ফুটে রয়েছে জ্বলজ্বলে আলোর ফুল।

আগামীকাল রবিবার, স্থির করলাম কালকে গিয়ে আগে কাজটা বুঝে নেব, তারপর বাড়ির সবাইকে জানালেই হবে। কিন্তু একথাও স্পষ্ট করে বলে দেব যে দিবাকর এই শর্তেই চাকরিটা জোগাড় করে দিয়েছে যে আমি পড়া চালিয়ে যাব। শেষ পর্যন্ত যখন শুয়ে পড়লাম তখন খেয়াল হল যে চাকরিটা পাইয়ে দিল তার সম্বন্ধে প্রভাকে কিছু বলা হয়নি, তাছাড়া শিরীষভাইয়ের কথাও তো বলা হয়নি এখনও।

সকালে উঠেই প্রভাকে বললাম, 'একদিন দিবাকরের বাড়ি তোমাকে নিয়ে যেতেই হবে। ও অনেকবার যেতে বলেছে।' তারপর আমি ওকে বললাম সিনেমায় যাবার দিন

আমি কিভাবে ‘প্রভা বাপের বাড়ি গেছে’ বলে কাটিয়ে দিয়েছি। কিরণের সম্বন্ধেও ওকে বললাম।

কিরণের সঙ্গে দেখা করার কল্পনায় প্রভা একটু যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। ‘আমি কি করে যাই বল তো? বাড়ির ব্যাপার তো তুমি সবই জান।’

‘তুমি যাবে আমার সঙ্গে। বাড়ির এই ব্যাপার তো বরাবর চলতেই থাকবে। যাক গে, এই নিয়ে এখন থেকে চিন্তা করার দরকার নেই। তবে শিগগিরই একদিন যেতে হবে। তাছাড়া শিরীষভাইয়ের বোনকেও দেখতে যেতে হবে।’

‘তিনি কে...?’ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে প্রভা। আমি এবার বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওকে শিরীষভাইয়ের কথা বলি। সেই এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে দেখা হওয়া থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত কথা। শেষে মন্তব্য করি, ‘সত্যি প্রভা, মানুষটার এই একটা দিক আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়েছে। প্রতিটি বিষয় দেখবার ওর একটা সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিকোণ আছে। কোন কিছুই ও নির্বিবাদে মেনে নেয়না, যা কিছু দেখে তা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করবেই! বলে, আমাদের নাকি ইতিহাসই নেই। যা আছে তা হচ্ছে পুরাণ — যেখানে ধর্ম, অন্ধবিশ্বাস আর কবিকল্পনার জগাখিচুড়ি , যার মধ্যে থেকে সত্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। রাজা রাজড়াদের ভাড়া করা কবিদের লেখা প্রশস্তিমূলক কাব্য আছে যেখানে পাঁচখানা গাঁয়ের রাজাকেই পৃথিবীপতির মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। আবার বলে, শাস্ত্র আর স্মৃতির নাম দিয়ে এমন সব বস্তু আমরা বানিয়েছি যেখানে বলা হয় নীতি নিয়মকানুন সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে আর মনুষ্যসমাজের সৃষ্টি তার পরে। বোঝ একবার, যখন মানুষই ছিলনা তখন নিয়ম কানুন বানালই বা কে? এবং কার জন্যই বা বানাল? আজকের যুগে নাকি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এসব কোন ধর্মেরই প্রয়োজন নেই, এখন চাই শুধু একটি ধর্ম — তা হচ্ছে মানবধর্ম...’

কথা আমার আচমকা থেমে গেল। দরজায় এত জোর ধাক্কা পড়ল যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে লাথি মেরেছে কেউ। হঠাৎ যেন বজ্রপাত হল ঘরে। হুড়মুড় করে উঠে বসতে না বসতে বাইরে চিৎকার শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ কি ঘটেছে সেটা প্রথমে বুঝতেই পারিনি, তারপর বাবুজীর উচ্চকণ্ঠ পরিষ্কার শোনা গেল। পাড়া প্রতিবেশীও শুনতে পাচ্ছে সে খেয়াল না রেখেই তিনি চেঁচাচ্ছেন। প্রভা দ্রুতহাতে নিজের কাপড় চোপড় ঠিক করছিল, আমি কোনমতে উঠে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেলাম। বাবুজী ওপাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে চলেছেন, ‘আমাদেরও বয়সকাল ছিল, কিন্তু দিন, রাত্তিরের হুঁশ খুইয়ে বসিনি। যখনই দেখ, বউকে নিয়ে পড়ে রয়েছে। বাড়িতে ছেলে পিলে রয়েছে, গুরুজনেরা রয়েছেন, এতটুকু লজ্জা নেই? বেলা দশটা বাজতে চলল, বাবুর এখনও সকালই হয়নি। এমন বেহায়াপনা কেউ কোনকালে দেখেছে? রাতভোর হা-হা, হি-হি চলছে, কোন হুঁশ নেই, যৌবনের নেশায় একেবারে চুর হয়ে রয়েছে। কোনদিকে নজর নেই, চক্ষু লজ্জারও বালাই নেই। লজ্জাশরমের মাথা একেবারে খেয়ে বসে আছে। যখন

কথা বলত না তখন তো মনে হত মেয়েমানুষ যেন একেবারে বাঘিনীর মত, এত ভয় তাকে। এখন কথা বলতে শুরু করে আবার সমস্তক্ষণই তার গায়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। সারাবাড়ির লোকের নাওয়া ধোওয়া কাজকর্ম সব হয়ে গেল আর এখানে এখনও হাসি মস্করা চলেছে।'

আমরা দুজনে পরস্পরের দিকে এমনভাবে চেয়ে আছি যেন দুজনের মাঝখানে একটা বোমা ফেটেছে। কি হবে এখন? আবার উঁকি দিলাম, বাবুজীর বক্তৃতা এখন চলছে, 'এই তো অবস্থা, পাঁঠাটার আবার সাহস দেখ — উনি নাকি আরো পড়বেন! লাটসাহেব এসে বাড়িতে ভাঁড়ার ভরে দিয়ে গেছে কিনা! শালা নবাবজাদা কোথাকার।'

বোঝা গেল শাড়ীর খবর, আরো পড়ার খবর, সব বাবুজীর কানে পৌঁছে গেছে। অনেকক্ষণ চেঁচিয়ে বাবুজী চলে যাবার পর প্রভা খুব ভয়ে ভয়ে দরজা ফাঁক করে দেখে নিয়ে চুপচাপ চোরের মত নেমে গেল নিচে। আমি সকলের সামনে যাবার মত সাহস সঞ্চয় করতে থাকলাম মনে মনে। মনে হচ্ছিল আমরা যেন কোন ঘোর দুর্নীতিমূলক অনুচিত অপরাধ করে একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়েছি।

সাত

দিন দুয়েকের মধ্যে বাড়ির জগতটা আমার জন্য যেন বেশ বদলে গেল। প্রত্যেকের ব্যবহারই একটু নতুনরকম ঠেকতে লাগল। আমি নিজে যদিও একটু একটু বুঝতে পারছিলাম কিন্তু প্রভাই সবপ্রথম ব্যাপারটা জানাল আমাকে।

সেদিন ফিরতে আমার একটু দেরী হয়েছিল। ভয়ে ভয়ে বাড়ি ঢুকছিলাম, সামনেই দেখি বাবুজী স্বয়ং। মুটের মাথায় কাঠের বোঝা চাপিয়ে নিয়ে আসছিলেন। হাতের থলিতে কিছু শাকসবজীও দেখা যাচ্ছে। এটা ওঁর অভ্যাস। কাঠ বা গম কিনতে যখনই যাবেন, সঙ্গে একটা থলি থাকবেই। কোন সবজীওয়ালার ডালার তলানি যা পড়ে আছে তাই খুব সস্তায় নিয়ে আসেন। ওঁর সারাদিন কোন কাজ নেই, তাই কাঠ, গম বা সংসারের অন্য দরকারী জিনিসপত্র উনিই আনেন। সংসারের বাজার করা নিয়েও প্রায়ই আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বেধে যায়। সবারই মনে হয় তার পড়াশোনার সময় নষ্ট হবে, তাছাড়া পথে যদি ক্লাসের কোন ছেলে, বা শিক্ষকেরা কেউ দেখে ফেলেন কি ভাববেন? বাবুজীকে দেখেই তো আমার প্রাণ উড়ে গেছে। আগে তো আমার অভ্যাসই ছিল পা টিপে টিপে বাড়িতে ঢুকে চুপি চুপি ওপরে নিজের ঘরে চলে যাওয়া,

একলাই থাকতাম বেশী। কাজেই বাড়ি থেকে বেরোবার বা ঢোকার সময় অথবা স্নান খাওয়া সারতে নিচে নামার পথেই বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা হত। ভাবলাম বাবুজী হয়ত সেদিনকার রাগটা এখন আবার ঝাড়তে শুরু করবেন।

কিন্তু আমাকে দেখে বাবুজী বলে উঠলেন, 'এত দেরী করে বাড়ি ফিরিস সমর, বউমা না খেয়ে বসে থাকে। খেয়ে দেয়ে বেড়াতে গেলেই পারিস, রোজ ঠাণ্ডা খাবার খেলে শরীরও ভাল থাকে।'

এমন স্নেহের সুরে কথা বাবুজীর মুখে কে জানে কতকাল আগে শুনেছি, মনেও পড়ে না। সারা শরীরে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি তো বকুনি খাবার জন্যই তৈরী ছিলাম। এমন আদরের সুর শুনে ঘাবড়ে গেলাম, ঈশ্বর জানেন এরপর কি হবে! কিন্তু প্রভা আমার ভয় ভেঙে দিল। ও জানাল, 'আজকাল তো বাড়ির সবাই ক্রমশই আমাদের প্রতি উদার হয়ে উঠছে।'

আমি চমকে উঠলাম, দুপুরবেলার কথাটা মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন শুনি? কি এমন বিশেষ কারণ ঘটেছে?'

'না, বিশেষ কারণ আর কি, তবে এটা লক্ষ্য করছি যে আগে যে সব ব্যাপারে তুমুল ঝগড়া বেধে যেত আজকাল সেই সব ব্যাপারেও তোমার মা আর ভাবী দুজনেই জেনে শুনেও চুপ করে থাকেন। মা তো আজকাল কথায় কথায় বলেন, ও যদি একটু সাহায্য করে তাহলে অনেকটা সুরাহা হয়ে যাবে। কাল জিজ্ঞাসা করছিলেন আমার কাছে কাপড় চোপড় আছে কিনা? ভাবী মেয়ের জন্য আইসক্রীম কিনেছিল, তখন আমাকেও খাবার জন্য সাধছিল।

'হুঁ'— আমি চুপ করেই রইলাম। এই পরিবর্তন আমিও অনুভব করেছি, এবং বাড়ির লোকের এই নরম ব্যবহার আমার মনে বেশ ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ কিছু বলছিনা দেখে প্রভা একটু বকে ওঠে, 'কি হল আবার? এত ভাবছ কি শুনি?'

একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বলি, 'নাঃ, কিছু নয়। প্রভা তুমিই বল এই বাড়িশুদ্ধ লোককে আমি এখন কি করে বোঝাব যে বাড়িতে এখন আমি কোন সাহায্য করতে পারব না! এরা সব আমার ওপর অনেক আশা করে বসে আছে। শুধু তোমার আর আমার খরচটা যদি চালিয়ে নিতে পারি তাহলেই আমি যথেষ্ট মনে করব। আমরা অন্ততঃ আর এ বাড়ির বোঝা হয়ে থাকব না। নিজেদের আলাদা করে নেব। তারপর আবার বি.এ. পাশের পড়া, ছেলেখেলা তো নয়! ওদিকে দিবাকর বলেছে বি.এ. পড়া এবং কাজ দুটোই চালিয়ে যেতে হবে। আমার ওপর ভরসা করে ও কাজ যোগাড় করে দিয়েছে সেটা ভালভাবে যদি না করতে পারি তাহলে ওরও খারাপ লাগবে।'

'তা এতে খারাপ লাগার কি আছে', প্রভা আমার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করে।

'আরে, আমি তো ঠিক চাকরি করব বলে কাজটা নিইনি। আমি পড়া চালিয়ে নেবার জন্য কাজ নিয়েছি। এখন এক একখানা বইয়ের দামই লাগবে পনের টাকা

করে। বই না হয় দিবাকরের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়ব। একসঙ্গে পড়লে আর আলাদা করে কিনতে হবেনা। কিন্তু তবুও পঁচাত্তর টাকায় কিই বা হয় ভেবে দেখ। কুড়ি টাকা তো দিবাকরকেই ফেরত দিতে হবে। কলেজ খুললেই ভরতি হতে প্রায় সবমিলিয়ে ছাব্বিশ টাকার মত লাগবে। তারপর এই কাপড় চোপড় — এ পরে কি কলেজ যাওয়া যায় তুমিই বল? ছিঁড়ে সুতো বেরিয়ে আসছে। অন্তত একটা শার্ট একটা প্যান্ট তো চাই। তারপর জুতো নেই, কলম নেই, ভাইসাবের কামাবার রেজরটা ব্যবহার করি, সেও এক বিপদ। এই মাসেই এত সব খরচ সামাল দিতে হবে। কাগজ, খাতা, এটা ওটায় আরো পঁচিশ তিরিশ তো বেরিয়েই যাবে। তারপর তোমারও আর দু একখানা শাড়ী ব্লাউজ চাই...'

'আবার আমার কথা টেনে আনছ কেন? বলেছি তো অনেক আছে আমার কাছে। যখন দরকার হবে নিজেই বলব, বুঝলে। আমার জন্য কিছু কিনবেনা এখন। সামনের মাসে, বা তারপরে দেখা যাবে।' শুধু আমাকে সান্ত্বনা দিতে নয়, নিজেও বেশ চিন্তিত হয়ে বলে ওঠে প্রভা। 'যাই হোক, হিসেব তোমার সামনেই হল, তুমিই বল ঐ পঁচাত্তর টাকা থেকে কি বাঁচবে? ওর থেকে কোন জিনিসটা বাদ দেব? বাড়িতেই বা কি সাহায্য করব? বড় জোর এইটুকু করতে পারি যে দিবাকরের টাকাটা না হয় এমাসে দিলাম না।' হঠাৎ মনে পড়ে গেল কলেজ তো খুলছে এই আট তারিখে, এদিকে আমি পনের তারিখের আগে বেতন পাব না। এইসব জিনিসপত্র তো কলেজখোলার সঙ্গে সঙ্গেই দরকার হবে, সুতরাং আরো ধার করতে হবে আমাকে।

তারপর অনেক রাত পর্যন্ত আমরা দুজনে পরস্পরের দুঃখ কষ্ট নিয়ে অনেক কথা আলোচনা করলাম। নিজের চিন্তায় দিশাহারা আমি বললাম, এটা তো স্পষ্ট বুঝছি যে মা, বাবুজী ভাইসাব সবাই আমার ওপর অনেক আশা নিয়ে বসে আছেন — সমর এবার রোজগার শুরু করেছে। কিন্তু এই সব সমস্যা ওঁদের বলি কি করে? আর বললেও ওরা এসব বুঝবে না। সবাই জানে যে পাব মোটে পঁচাত্তরটি টাকা, অথচ ভাবছে আমি যেন রাজত্ব পেয়ে গেছি। এদের কি বলব বলতো? আবার নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠি, 'তার ওপর এই শালা রেজাল্ট নিয়ে আর এক দুশ্চিন্তা, কি যে হবে কে জানে। কলেজ জয়েন করতে পারব কিনা তাই জানিনা, হয়ত সব আশা মনের মধ্যেই থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত'। চোখের সামনে যেন অন্ধকারের সাগরে ঢেউ খেলে যাচ্ছে, কোনদিকে কুলকিনারা নেই। এদিকে মা, ভাইসাহেব সবাই আশা করে রয়েছে যে সমর এবার রোজগার করতে লেগেছে।

আজকাল আকাশে বাতাসে খালি যেন গুঞ্জন উঠছে — রেজাল্ট আর রেজাল্ট। যেদিকে তাকাও সেদিকেই দেখবে দুতিনটে ছেলে একত্র হয়ে কেবল ঐ আলোচনা — কার কোন পেপারটা কেমন হয়েছে, কত নম্বর আশা আছে — কেবল এই কথা। উমানাথ নাকি নম্বর বাড়াবার জন্য চেষ্টা করতে গিয়েছিল, পরীক্ষক তাকে ধাক্কা মেরে

তাড়িয়ে দিয়েছেন। আবার সেই পরীক্ষকই নাকি কোন গোলমাল না করে বালেশ্বরের নম্বর বাড়িয়ে দিয়েছেন...কোন দাদা এসে বোধহয় ঘাড় ধরে করিয়ে নিয়েছে!

এইসব শুনি আর কানে হাতচাপা দিয়ে চলে আসি। মনের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে — যা হবে তখন দেখা যাবে। ছেলেগুলোর ছটফটানি দেখে আমার আজকাল করুণা হয়। কে জানে ওদের কার বাড়ির অবস্থা কেমন!

আমি নিয়মিত কাজে যেতে শুরু করেছি। এখনও তো স্কুল কলেজ খোলেনি, প্রভাকে যতটা কম কষ্ট দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করছি। এরপর কষ্ট তো দিতেই হবে। এখন তো সকালে না খেয়েও চলে যেতে পারি, কারণ এগারোটা বা বারোটার মধ্যে বাড়ি ফেরা যায়। যখন ওদিক থেকেই সোজা কলেজ যেতে হবে তখন তো ও বেচারীকে রাত সাড়ে তিনটের সময় উঠতেই হবে। এমনিতেই তো বেচারা চব্বিশঘন্টাই সংসারের ঘানিতে গরুর মত ঘুরে মরছে। ভোর থেকে রাত এগারোটা, বারোটা পর্যন্ত কখনও ওর হাত খালি দেখলাম না। ভোরে ওঠার সময় অনেক চেষ্টা করি যাতে ওর ঘুম না ভাঙে, কিন্তু কি করে যে ঠিক টের পেয়ে যায় আর উঠে বসে। আমি অনেক করে বলায় আরো একটুক্ষণ কোনমতে শুয়ে থাকে বটে, কিন্তু আমি জানি বেরিয়ে গেলেই ও উঠে পড়বে আর কাজে লেগে যাবে। ভারি কষ্ট হয় আমার। আজকাল আমার জন্যই ওকে আরো ভোরে উঠতে হয়, আগে অন্তত সকাল ছ'টা পর্যন্ত শুতে পেত।

কাজের জায়গায় পৌঁছনর গল্পটাও বেশ মজার। আমাদের এই শহরে দুটি রেল স্টেশন আছে। তার একটা আমাদের বাড়ির খুব কাছে, অন্যটা আমার চাকরিস্থলের কাছে। ভোরবেলা একটা ট্রেন আছে, মাঝে আর কোথাও থামেনা, তাই পাঁচমিনিটও লাগেনা পৌঁছতে। গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ে আমি লাইনের পাশের তারের বেড়া টপকে বেরিয়ে পড়ি তারপর এমন ভাবে হাঁটতে থাকি যেন কতক্ষণ ধরে এই পথেই হেঁটে চলেছি।প্রথম দু একদিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। প্রভার কাছে গল্প করেছি 'আমার এমন বুক ঢিপ ঢিপ করছিল যে কি বলব, কানের মধ্যে যেন ভোঁ ভোঁ করছে, ট্রেনে বসে মনে হচ্ছিল মাথা ঘুরছে, ঘেমে নেয়ে উঠছিলাম, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি টি.টি. এসে হাজির হল, এই বুঝি কালো কোট পরা চেকার এসে আমার ঘাড়ে হাত দিল।' কিন্তু সে প্রথম দুদিন মাত্র। তারপর এখন সাহস খুব বেড়ে গেছে, নিজেকে বাঁচাবার অনেক রকম কায়দা এখন আমি শিখে গেছি। ট্রেন ছাড়বার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এমন নির্লিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াই যেন আমি অন্য কোন ট্রেনের প্রতীক্ষা করছি, অথবা অন্য কিছু কাজে স্টেশনে এসেছি। টি.টি. কোনদিকে রয়েছে আমার নজর থাকে সেইদিকে, ট্রেন চলতে শুরু করলেই টি.টি.র থেকে সবচেয়ে দূরের কামরাটায় উঠে পড়ি। গাড়ি থামলেই সবার আগে নেমে পড়ে এমনভাবে হাঁটতে শুরু করি যেন কতক্ষণ ধরে হাঁটছি, ঐ ট্রেনটার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই।

এইভাবে ফাঁকি দিয়ে ট্রেনে চড়াটা বেশ উপভোগ করি আর অনেক পরিশ্রমের

হাত থেকেও বেঁচে যাই। এই ভোরে এতখানি পথ হেঁটে আসতে হলে আমার যে কি অবস্থা হত ভাবতেও ভয় করে। গ্রীষ্মের সময়টা তো যাহোক করে বেড়াতে বেড়াতে চলে আসা যায়, কিন্তু শীতকালে আমার এই জীর্ণ পোষাকে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে আসতে খুবই কষ্ট হত। সে অবস্থাটা কল্পনা করেই আমার ভিতর থেকে কাঁপুনি ধরে যায়।

কাজটা প্রথম প্রথম ভালই লাগছিল, কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই বড় একঘেয়ে লাগছে। ভোর পাঁচটা থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত প্রুফের ভিজে ভিজে কালি ধ্যাবড়ানো কাগজে নানা রকম নিশানা লাগাতে লাগাতে মাথা ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। আমার ভয় হচ্ছে এ কাজটা এত ক্লান্তিকর এবং কষ্টদায়ক যে এরপর যখন কলেজ শুরু হবে তখন এখানকার কাজ সেরে কলেজে গিয়ে পড়ায় মন দিতে পারব তো? ঠিক বুঝতে পারছি না। প্রথম কয়েকদিন উৎসাহের চোটে আমি এত পাতা প্রুফ একসঙ্গে দেখে শেষ করলাম যে প্রেসের লোকেরা অবাক হয়ে গেল। তখন মনে হচ্ছিল এতো অতি সামান্য কাজ, এতে আর মুশকিলটা কি? কেবল পড়ে যাওয়াই তো কাজ, যেখানে ভুল আছে সেখানে চিহ্ন দিয়ে যাওয়া। কিন্তু ম্যানেজার পরে সব পাতা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন, কারণ তখনও অনেক ভুল ছিল। আমি তো বেশ মন দিয়েই দেখেছিলাম, তবু এত ভুল কি করে ছেড়ে গেলাম বুঝতেই পারছিলাম না। একটু একটু করে উৎসাহে ভাঁটা পড়ে এল। কপির সঙ্গে প্রতিটি অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে দেখতে মাথার ভিতরটা এত ভারী হয়ে উঠত যেন একতাল ভিজেমাটি মাথায় ঠাসা রয়েছে। প্রেসের মেশিনগুলোর ঘটর ঘটর আওয়াজ তো চলছেই, তারওপর চিৎকার করে উচ্চকণ্ঠে নানা রকম হুকুমজারী হচ্ছে, 'নোট টাইপ' ভালো উঠছে না কেন? 'কালি বেশী এসে যাচ্ছে' 'আরে হাঁ করে তাকিয়ে না থেকে কাগজ লাগা' ইত্যাদি। ম্যানেজার তার কালিমাখা প্যান্টেব দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে যখন কাজ দেখে তখন আমার এত ভয় করে, ঠিক যেন পরীক্ষার হলে ইনভিজিলেটর পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে। চলে যেতে যেতে বলে, 'বড় ধীরে ধীরে প্রুফ দেখছ মিস্টার, ওদিকে মেশিন খালি পড়ে রয়েছে। আবার কারেকশন করতেও টাইম যাবে। একটু মন দিয়ে বার বার করে দেখ। প্রুফ দেখা তো ঝাড়ু দেবার মত কাজ, যতবার ঝাড়ু দেবে কোথাও না কোথাও থেকে একটু ময়লা বেরিয়ে আসবেই।' এছাড়া যেদিকেই তাকাও কালচে কালির ছোপ, একদিকে বসে সুমেরা জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে কি যেন পিষছে, অন্যদিকে মেশিনম্যান দু তিনটে ইঁট দিয়ে উনুন বানিয়ে কালি ফোটাচ্ছে। আঠার দুর্গন্ধে বমি আসে, মেশিনগুলো থেকে তেলতেলে কাদার মত কালি টপটপ করে পড়ে, জামাকাপড়ে দাগ লেগে যায়। সিন্ধি হোটেলের ছেলেটা প্রায় দশমিনিট পরে পরেই ওর তারের খাঁচাটার মধ্যে চা-এর গ্লাস সাজিয়ে নিয়ে এসে হাজির হয়, একে ওকে চা দেয়। ম্যানেজারের কাছে যখন ছাপার কাজ দিতে কোন মক্কেল আসে তখন তাকে খাতির করতে সুমেরা হাঁক দেয় চা ওয়ালাকে।

কিন্তু এখানে যারা কাজ করে তারা সবাই বেশ লোক, তাই খুব একটা খারাপ লাগেনা। প্রথমে সবাই তো অচেনা ছিল, কিন্তু অল্পদিনেই আমার বেশ ভাল লাগতে লাগল ওদের সবাইকে। টাইপগুলো কেসের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করতে করতে অথবা কম্পোজ করতে করতে ওরা নানা রকম সরস গল্প চালিয়ে যায়— কোনো মেয়ের প্রেমকাহিনী, প্রতিবেশীর বাড়ির ব্যভিচারের কেচ্ছা নয়ত সিনেমা আর কল্পনায় মিলিয়ে মিশিয়ে আজগুবি সব গল্প। তবে সিনেমারই হোক বা নিজেদের জীবনকাহিনীই হোক সব গল্পের বিষয়বস্তু কিন্তু এক যৌনতা-বিষয়ক অভিজ্ঞতার বর্ণনা। ওদের মধ্যে একটি ছেলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সে বেশীরভাগ চুপ করেই থাকে, চেহারা আর কথাবার্তায় মনে হয় বেশ বড় ঘরের ছেলে। অন্যদের স্তরে নিজেকে সে মেলাতে পারে না বলেই সম্ভবত চুপচাপ থাকে। বুড়ো মেশিনম্যান তো বোধহয় একটা সিনেমাও বাদ দেয় না। রোজ প্রভাকে আমি বাড়ি গিয়ে এদের সব গল্প শোনাই।

দুপুর বারোটায় চড়চড়ে রোদে ঘেমে নেয়ে যখন বাড়ি পৌঁছই তখন খিদেয় যেন মাথা ঘুরতে থাকে। কিন্তু গরমের জন্য আগেই দু গেলাস ভরতি জল খেয়ে নিই, তারপর খিদেটা আর তত বেশী লাগেনা। খাবারটা আনিয়ে নিই ওপরে। প্রভাও এতক্ষণ আমার জন্য না খেয়ে বসে থাকে এতে ভারি কষ্ট হয় আমার। প্রথমদিনই বলেছিলাম 'প্রভা এবকম বোকামি কেন কর বল তো? এত লেখাপড়া শিখেও সেই মুখ্যুই থেকে গেলে। বেলা একটা পর্যন্ত আমার জন্য বসে থাকার দরকারটা কি? সারাদিন খাটাখাটনী কর, খাওয়া দাওয়াটা সময়মত করবে তো?'

'আমি তো নিজের সময়মতই খাই। তুমি ভাবছ তোমার জন্য এতক্ষণ বসে আছি? বাড়ির কাজকর্মই তো এই এতক্ষণে শেষ হল।' প্রভা এবার ঠাট্টায় ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে উঠল, 'আহা কি আমার সুপুরুষ একেবারে, যে তোমার জন্য বসে থাকব, আমি কারো পথটথ চেয়ে বসে থাকিনা।'

'তা যদি থাকনা তো খেয়ে নাওনা কেন আগে?' ওর ঠাট্টাটা বেশ লাগল আমার, আমিও ইয়ার্কি মেরে বলে উঠি, 'আহা হা, নিজে তো খুব রূপসী কিনা! একটু মিলিয়ে দেখ দেখি, তোমাদের বাড়ির লোকেদের থেকে আমি দেখতে ঢের ভাল। ওখানকার সব তো এক একটি বনমানুষ!'

'এই, আমার বাড়ির লোকেদের নিন্দে করলে ভাল হবেনা কিন্তু বলে দিচ্ছি। কিছু বলিনা বলে একেবারে মাথায় চড়ে গেছ না?' খুব চোখ পাকিয়ে বকুনি দিল প্রভা।

আমি ওকে আরো খেপিয়ে দিই, 'কি করবে আমার করো তো দেখি'।

'আমি চলে যাচ্ছি, তুমি একলা বসে বকর বকর কর,' ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়াল প্রভা, 'এখানে তোমার কাছে এসে একটু বসি বলে দিদির কাছে কত কথাই না শুনতে হয়। তারওপর আবার এখানেও কথা শুনতে হবে। সবাইকার ক্যাটকেটে কথা শোনবার জন্য আমিই তো একটা ফালতু মেয়ে আছি কিনা! অভিমানে ভারী হয়ে এল ওর গলা।

কিন্তু তখনি ঢোঁক গিলে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার ঠাট্টার সুরে বলে উঠল, 'যখন বাবুজী হল্লা বাধিয়ে দেন তখনই তুমি ঠিক থাক।'

ওকে খুশি করার জন্য হাতখানা ধরে ফেলি, 'তা আমার আর কি হয়েছিল? তুমিই তো লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলে, মনে হচ্ছিল যেন সিঁদুরে স্নান করে উঠেছ।'

'আহা হা, নিজে যে ভয়ে কাঁপছিলে সেটা বলা হচ্ছে না। গলা দিয়ে তো তখন আওয়াজ বেরোচ্ছিল না, এখন ভারি ডাঁট দেখান হচ্ছে', সেদিনের অবস্থাটা কল্পনা করে হেসে উঠল ও।

'যাক গে যাক, কি বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করা। এসো আমরা একসঙ্গে খাব,' আমি ওর হাতখানা থালার ওপর টেনে আনি রুটি ছেঁড়ার জন্য।

'ওরে বাবা, তুমি কি আমাকে বাঁচতে দেবে না? কেউ দেখতে পেলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে যে? একসঙ্গে বসে বসে খাওয়া হচ্ছে! হুঁ' ভয়ে শিউরে উঠে ও বাইরের দিকে তাকায়।

'বক বক করবে না তো, চুপচাপ খেয়ে নাও,' আমি বকুনি দিই এবার। একে তো বেচারা এতক্ষণ না খেয়ে বসে থাকে, তারপরেও একসঙ্গে বসে খাওয়ার আনন্দটুকুও ওর ভাগ্যে জোটেনা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভবিষ্যতের সেই ছবিটা যখন ও আর আমি এক টেবিলে একসঙ্গে খেতে বসব। ও খোলা জানলায় প্রতীক্ষা করে থাকবে কখন কলেজের ক্লাসের ফাঁকে আমি খেতে আসব।

ওর মুখেও ফুটে উঠেছে একটুকরো আনমনা হাসি। আমার মতই ওর মনেও নিশ্চয় ঐ রকম একটা ছবি জেগেছে। প্রভা উঠে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

'দাঁড়াও আগে দরজা বন্ধ করি'...ছোট্ট মেয়ের মত ঘাড় বাঁকিয়ে সলজ্জ সুরে বলল, 'আমার কিন্তু দারুণ লজ্জা করবে একসঙ্গে খেতে।'

'অত লজ্জা দেখালে এবার পিটুনী খাবে কিন্তু', ও উঠবার চেষ্টা করতেই আমি জোর করে টেনে বসিয়ে দিই।

সারা বাড়ি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। রেজাল্ট জানা গেছে, আমি কোনমতে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেছি কিন্তু অমরের নাম কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাড়ির সেই দৃশ্য যেন এখনও চোখের সামনে দেখতে পাই। অমর এককোণে বসে কাঁদছে। সারাবাড়িতে মৃত্যুর মত নৈঃশব্দ। আঘাতটা এত গভীর যে এর সামনে আমার পাশ করার আনন্দ কেউ যেন অনুভবও করতে পারছে না। এখন ওকে আবার একটা বছর পড়াতে হবে সেই চিন্তা বিভীষিকার মত সবাইকার চোখের সামনে যেন নেচে বেড়াচ্ছে। বাবুজী পালোয়ানী ভঙ্গিতে বুকের ওপর দুই হাত রেখে অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন আর গজরাচ্ছেন, 'একেবারে বোকা পাঁঠা একটা — কতবার বলেছি পড়, পড় তা শালাদের ফুসরৎ হলে তবে তো — একটা তো বিয়ের পর একেবারে হাতের বাইরে চলে গেছে। বড় যে বুক ফুলিয়ে বলা হত , 'বাবুজী কোন ভাবনা নেই, যাই করি

না কেন ফার্স্ট ডিভিশন যদি না পাই তখন বলতে এস। এখন নে সেকেন্ড ডিভিশন নিয়ে চাট বসে বসে। আর বাবা অমর, তুমি আমার স্পষ্ট কথা শুনে রাখ, তোমার পেছনে জলের মত টাকা ঢালবার ক্ষমতা আমার নেই। মাস্তানগিরি করে বেড়ানোর পর যদি ফুরসৎ বাঁচে তবে তো পড়বে? কষ্ট করে পড়তে পার তো পড় আর না হলে ভিক্ষে করে খাও গে যাও।'

প্রভা জানাল অমর ঠাকুরপো ফেল করেছে বলে ভাবী তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছে, দুঃখ প্রকাশ করেছে কিন্তু ভাইসাবের কাছে বলেছে 'এ বাড়িতে সবই অন্ধকার। এইসব গুণ্ডার মত ছেলেগুলোকে খাওয়াও পরাও, পড়াও খরচা করে, এদিকে নিজের বাচ্চাদেরও যে মানুষ করতে হবে সেদিকে তো কারো খেয়ালই নেই।' ভাইসাহেব নাকি তার উত্তরে বলেছেন, 'চুপ করে থাক। আমাদের ভাগ্যই এই, জীবনপাত করে রোজগার করা আর এই সংসারের গর্তে ঢালা...' বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছেন ভাইসাব।

ভাইসাবের কষ্ট আমি বুঝলাম, আমার মনের গভীরে একটা আলোড়ন উঠল যেন কথাটা শুনে।

বাড়িশুদ্ধ লোকের বিরোধ আর আপত্তি সত্ত্বেও আমি দিবাকরের সঙ্গে গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে এলাম। ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রদের সেকি ঠেলাঠেলি ভীড়, কতজনের কত সুপারিশ জোগাড় করা, কতরকম চালাকি — এসব দেখলে মনে হয় পরীক্ষা পাশ করাটা ভর্তি হওয়ার চেয়ে সোজা ব্যাপার। সে সময় মনে হচ্ছিল কোনরকমে এই এডমিশন বৈতরণী পার হতে পারলেই যেন জীবন সার্থক হয়ে যাবে।

ভাল ভাল ফার্স্টক্লাস পাওয়া ছেলেরা একবার প্রিন্সিপ্যালের ঘরে আবার ভাইস প্রিন্সিপ্যালের ঘরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, কেউ কিছুই বলতে পারছে না। কেউ কোন এম.পি.র কাছ থেকে সুপারিশের চিঠি এনেছে, কারো সঙ্গে আবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজের লোক পাঠিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে এক একটা ক্লাসে ষাটজন করে ছেলে নেওয়া হবে এবং এইরকম অন্তত চারটে করে সেকশন এক এক ক্লাসে থাকবে। এ যেন সেই শয়তানের নাড়িভূঁড়ির মত ক্রমেই লম্বা হয়ে চলেছে। সায়েন্স আর আর্টসের বিষয় অনুসারে ক্লাস ভাগ করা হবে, তারপর আবার এ.বি. সি. ডি. চারটে সেকশন। পুরো তিনটে দিন সময় লাগল আমার কলেজে ভর্তি হতে। আমি এই কলেজেরই ছাত্র ছিলাম তাই হয়েও গেল শেষ পর্যন্ত। যারা ফার্স্টইয়ারের ছাত্র তাদের ঝামেলা আরো অনেক বেশী।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এডমিশনের আগে বাড়িতে যে বিরোধের ঘূর্ণিঝড় উঠেছিল তা এই দুদিনে একেবারে শান্ত। অমরের ভর্তি হওয়া নিয়ে প্রচুর ঝামেলা হল।

এইবারে শুরু হল প্রভার কষ্টের পালা। প্রেস থেকে এগারোটায় বেরিয়ে আমাকে কলেজে ছুটতে হয়, কলেজ থেকে ছুটি পাই বেলা তিনটেয়। আমার শেষ পিরিয়ডটা তিনটের সময় শেষ হয়। তাও তো এখনও কলেজে এম. টি. (মিলিটারী ট্রেনিং) শুরু

হয়নি, সেটা আরম্ভ হলে তো সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত রগড়াতে হবে। না করলে আট আনা ফাইন। তখন তো ভোর সাড়ে চারটেয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বা আটটার সময় বাড়ি ফিরব। খাওয়াদাওয়ার সমস্যাটা কি ভাবে সমাধান করা যাবে জানিনা। প্রভা অবশ্য বলছে, 'কেন তুমি ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ? আমি তো বলেছি রাত তিনটেয় উঠে তোমার জন্য খাবার করে দেব।'

'একেই সারাদিন তোমার কাজের শেষ নেই, তারওপর আবার এই! সাড়ে এগারোটায় শুয়ে আবার রাত আড়াইটে তিনটেয় উঠে পড়বে? তোমার ইচ্ছেটা কি শুনি?' আমি কপট রাগ দেখিয়ে বলি, 'সোজাসুজি বলেই ফেল না যে আমি তোমায় খুন করে ফেলি?'

'আহা একটু কাজ করলে যেন মরে যাব আমি। আর কাজ কি শুধু শুধু করছি নাকি? এখন থেকেই বলে রাখছি সব সুদে আসলে শোধ দিতে হবে'।

ওর কথার ভঙ্গি দেখে মনটা গলে গেল আমার। গদগদ স্বরে বললাম, 'যদি বেঁচে থাকি তো প্রতিটি পাইপয়সা শোধ করব দেখে নিও। তোমাকে আরামে রাখতে পারব বলেই তো করছি এসব, নাহলে এই ভোর চারটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খেটে মরবার কি দায় পড়েছিল আমার?' একটু সামলে নিয়ে বলে উঠি, 'না, রাত তিনটের সময় তোমার ওঠা চলবে না কিছুতেই। আচ্ছা এক কাজ করলে হয়না? যদি রাত্রেই খাবার তৈরী করে রেখে দাও?'

'কিন্তু সকাল পর্যন্ত বাসী হয়ে যাবে যে...'

'কিছু বাসী হবেনা। বেলা দশটার মধ্যেই তো প্রেসে বসে খেয়ে নেব, ঐটুকু সময়ের মধ্যে কি এমন বাসী হবে?'

মনে মনে প্রভা প্রায় রাজী হয়েছে। বলল, 'সারাদিন কি বাসন সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে নাকি?'

'আরে সঙ্গে নিয়ে ঘুরব কেন? প্রেসেই রেখে দেব, ফেরার পথে তুলে আনব। কলেজের কাছেই তো।'

হঠাৎ প্রভা সব নাকচ করে দিয়ে বলে উঠল, 'না-না ওসব হবেনা, আমি সকালেই তৈরী করে দেব। গরম গরম খেয়ে গেলে দেখবে কত 'স্মার্ট' লাগে। কথায় বলে না, বাসী খাবার খেলে বুদ্ধি খোলে না? সারা দিন জড়তা কাটতেই চায়না।' হঠাৎ কি যেন ওর মনে পড়ে যায়, উৎসাহ ভরে বলে ওঠে, 'জান মা কি বলেছেন?...মা বলেছেন, যদি সঙ্গে খাবার নিয়ে যায় তো ভাল করে যেন চারখানা পরোটা সেঁকে দিই। কোন বন্ধুর সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসলে, শুধু শুকনো রুটি খাচ্ছে দেখতে খুব খারাপ লাগবে।'

'তাই নাকি? এটা তো জানতাম না।' আমি একটু চিন্তিভাবেই বলি, 'প্রভা, আমার বাড়ির লোকেদের আমি চিনি। এ সব এইজন্যই বলা হচ্ছে যে আমি বেশ কটা টাকা বেতন পাব। না হলে এই যে কলেজে যাবার জন্য দু একটা জামাকাপড় বা দু একখানা

বই খাতা, ফিস এসব কখনো কি সহজে পেয়েছি? এর প্রতিটি জিনিসের জন্য আমাকে প্রাণপণে লড়তে হয়েছে, প্রায় খুন হয়ে যেতে হয়েছে। তুমিই বল এদের হাতে আমি এখন কি দিতে পারি? একটা কাজ করতে পারবে?...এ মাসে আমাকে কত কিছুর জন্য খরচ করতে হবে তার একটা হিসেব কথাপ্রসঙ্গে ভাবীকে জানিয়ে দিতে পারবে?'

'হ্যাঁ, তারপরে সে আমার মাথাটা গুঁড়িয়ে দিক, তুমি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। তুমি একলাই কেবল চালাক তাই না?...মা তখন দাঁত কিড়মিড় করে বলবে... 'নিজের বরের রোজগারের হিসেব দেওয়া হচ্ছে...'

'তাহলে কি করে এদের বোঝান যায় সেটা তুমিই বল? খাওয়ার খরচা ছাড়া বাড়ীতে এখন আর অন্য খরচ বিশেষ কিছু লাগবে না এটা তো জানি? কিন্তু এরপর কেমন চলে দেখা যাক', এমন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ভিতর থেকে যে মনে হল যেন সমস্ত আবহাওয়া আদ্র হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল নিঃশব্দে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলাম, 'প্রভা, মাঝে মাঝে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে চুলোয় যাক সব, এত অসুবিধা, এত কষ্ট, কি এক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফেঁসে গেলাম? দিনের শান্তি, রাতের বিশ্রাম কিছুই থাকবে না, দিবারাত্রি ছুটোছুটি করে মরা, ভোর চারটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত পাগলের মত একবার এদিক একবার ওদিক দৌড়তে হবে। তারচেয়ে কোথাও একটা কেরানীগিরি জুটিয়ে ষাট সত্তর টাকা বেতনে শান্তিতে থেকে আরাম করি। সকাল দশটায় যাব আর বিকেল পাঁচটায় ফিরব, বড় জোর বাড়িতে কিছু ফাইল বয়ে আনতে হবে ...'

প্রভা সহানুভূতি মাখা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার আমার মুখের দিকে, 'শুধু টাকার কষ্ট তো নয়। এই টাকা তো তুমি এখনই পাচ্ছ। আসল সমস্যা তো এইটেই যে আমাদের স্বপ্নগুলো অনেক বড়, অনেক উঁচু। আমাদের ভবিষ্যত জীবনের পরিকল্পনা একেবারে অন্যরকমের।'

'সব সমস্যার মূল তো ঐটেই।' আমি ক্লিষ্টকণ্ঠে বলি, 'কিন্তু স্বপ্ন তো শুধু আমার একার নয়? তাছাড়া স্বপ্নগুলোকে কি করে তাড়ানো যায় বল তো? মন থাকলেই স্বপ্নও থাকবে।'

প্রভা এবার আদরের বকুনি দেয়, 'কি যে সব আজেবাজে কথা বলতে শুরু করেছ আজ। সমস্যা আছে তো কি হয়েছে, সমাধানও হয়ে যাবে। স্বপ্নগুলো সত্যি হলে তার সুখটাও তো আমরাই ভোগ করব। তারজন্য না হয় একটু কষ্ট করতেই হল, তাতে ক্ষতি কি? আর, তোমার সঙ্গে আর কেউ থাক বা না থাক, আমি তো আছিই', আমার কাঁধের ওপর হাতখানা তুলে দেয় প্রভা।

আমার মনটা আবার ভিজে উঠছে, ইচ্ছে করছে ওর কোলে মাথা রেখে একটু কাঁদি। ও যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা শাপভ্রষ্টা এক দেবী, আমার কাছে এসে পড়েছে। ও যদি আমাকে উৎসাহ না যোগাত তাহলে এত দুঃখ পার হয়ে আসার সাধ্য কি ছিল

আমার? কখনও না, কবেই আমি ভেঙে পড়তাম। ধরা গলায় আমি প্রশ্ন করি, 'আচ্ছা প্রভা, একটা কথা বলবে? এই যে এত কষ্ট, এত সমস্যা আর হতাশা এ সব দেখে তুমি একটুও ঘাবড়ে যাওনা? যখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতাম না, যখন তোমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি তখনও একটুক্ষণের জন্যও কি তোমার মনে হেরে যাওয়ার, ভেঙে পড়ার অবস্থা আসেনি?'

অকৃত্রিম আত্মবিশ্বাসভরা কণ্ঠে ও বলে, 'আমি? তুমি আমাকে চেন না। আমার প্রাণ খুব কড়া, এর চেয়েও বেশী কষ্ট পেলেও আমি বিচলিত হবনা বিয়ের আগে বেশ ভয় করত যে কে জানে কেমন হবে জীবনটা। তখন মনে হত হয়ত এতটুকু কষ্টও আমি সইতে পারব না। কিন্তু যখন দেখলাম সত্যি সত্যি কষ্ট কাকে বলে, তখন মনে হল ব্যস? এই মাত্র? এরজন্য এত ভয়?' এমন শিক্ষয়িত্রীর ভাষায় কথা বলে ফেলে ও নিজেই বোধহয় লজ্জা পেয়ে গেল, চোখ নামিয়ে নিল। আমার মনে হল যেন ওর মুখের চারপাশে দীপ্ত তেজের রক্তিম আভায় জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি হয়েছে।

'না প্রভা আমিও পরাজয় স্বীকার করবনা। ও সব আমি এমনিই বলছিলাম। তুমি দেখে যাও শুধু, সব করে ফেলব আমি। তোমার জন্য কি করব, কতটা আমি করতে পারি তা তুমি জাননা এখনও...' আমার দু হাতে যেন কাঁটা দিয়ে উঠেছে। ওর নত মুখখানা তুলে ধরেছি। ওর অর্ধনিমিলিত চোখের পাতা, ওর মুখ দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা মাথায় এল... এর মধ্যে যদি ও মা হয়ে পড়ে তাহলে? আমার মনে হল প্রভাও কি করে যেন বুঝতে পেরেছে আমার মনের ভাবনাটাকে আর তাই ওর মুখখানা হয়ে উঠেছে একেবারে টুকটুকে গোলাপী।

আট

ক্লান্তিরও একটা অদ্ভুত নেশা আছে। আমার ঘরের সামনের ছাদে একটা ছোট্ট খাটিয়ার ওপর এমনভাবে পড়ে আছি যেন জলের মধ্যে একটা নৌকোয় শুয়ে ভাসছি। মাথাটা ঝুলছে, হাত দুখানা ছড়ানো, পা মাটিতে ঠেকছে, সারাটা দেহ যেন নির্জীবের মত এলিয়ে পড়েছে— নিচে বাড়ির সবাই কথাবার্তা বলছে শুনতে পাচ্ছি। এবার অমরের বিয়ের কথা চলছে ...।

বাড়িতে পা দিয়েই চমকে উঠেছিলাম পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে। বৈঠকখানায় উঁকি মেরে দেখি মামাজী এসেছেন। আশ্চর্য লাগল, আমার বিয়ের পর উনি এই প্রথম এলেন। একটু চটেছিলেন তখন। সামান্য ইতস্তত করে আমি চলে এলাম ওপরে।

তখনি নীচে থেকে ডাক পড়ল, 'ওরে ও সমর, তুই যে আমার সঙ্গে দেখাই করলিনে রে...'! আমি এসেছি তা টের পেয়ে গেছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে নিচে যেতে হল। বাইরের ঘরেই বসে আছেন, এখনও বোধহয় রাগটা সম্পূর্ণ পড়েনি, তাই ভিতরে আসেন নি। আমি পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই উনি একহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে পাশে বসিয়ে দিলেন এবং বাবুজীর সঙ্গে কথা বলে চললেন — 'তা ঠাকুর সাহেব, যা করতে চান আপনি নিজে দেখে শুনেই করুন। মেয়েটি আমার চোখে লেগেছে তাই আপনাকে খবরটা দিলাম। ব্যাপার কি জানেন, আমি হয়তো ভাল ভেবে কিছু করতে গেলাম কিন্তু লোকে ভাববে নিশ্চয় কিছু খারাপ মতলব আছে। সমরের বিয়ের পর দিদি যা কথা শুনিয়েছিল তাতে তো আমার ডুবে মরাই উচিত ছিল।' বাবুজীর কথার জবাবে উনি বেশ রাগতঃ সুরেই বললেন কথাগুলো।

বাবুজী মুখখানা নানাভাবে বিকৃত করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান খোঁচাচ্ছেন। মনে হচ্ছে যেন ইচ্ছা করেই নিজেকে কিছু একটা কাজে ব্যস্ত রাখার ভান করছেন। শেষপর্যন্ত আঙুল দিয়ে কান ঝেড়েঝুড়ে বলে উঠলেন, 'আরে চন্দজী, তুমিও যেমন? ওসব মেয়েলি কথায় কান দিতে আছে নাকি? ওদের আরতো কোন কাজকর্ম নেই, একবার এদিকে কথার বাড়ি মারছে, একবার ওদিকে। তারপর একটু মোলায়েম সুরে বলেন, 'মেয়ে তুমি নিজে দেখেছ তো? ঘর কেমন, বংশ কেমন এসব একটু খোলসা করে বলবে তো?'

আচ্ছা, আবার কোনো মেয়ে নিয়ে কথাবার্তা চলছে! আমি চুপচাপ শুনে যাই।

'ও সব বাজে কথা,' উনি ময়ূরের পাখার মত দুই বাহু ঊর্ধে মেলে দিয়ে বলেন, 'তুমি দেখে নাও মেয়েটিকে, অমরকে দেখাও, দুচারজন পাড়া প্রতিবেশীকেও দেখাতে পার — তবে কথাবার্তা সব নিজেরা বলে নাও বাপু। আমাকে তারা কথা পাড়তে বলেছে, তিনদিন ধরে একেবারে নাছোড়বান্দা, তাই বাধ্য হয়ে আসতে হল, কিন্তু এর বেশী কিছু আমার দ্বারা হবেনা।

'আহা, সে সব তো ঠিক কথা...কিন্তু...।'

আমি আর থাকতে না পেরে বলে উঠলাম, 'বাবুজী কি এত তাড়া আছে? এই তো এবার ফেল করে বসল, এর ওপর এখন যদি বিয়ে হয় তো আবার পরের বছরও ফেল করে...।'

বাবুজী ধমকে উঠলেন, 'তুই থাম দেখি। কিছু বুঝবার তো মুরোদ নেই, কেবল মাঝখান থেকে ফোড়ন কাটা...আরে বিয়ে কি এখনি হচ্ছে নাকি? কথাবার্তা চলতে চলতে তো বছর ঘুরে যায়। আমি চোখ বোজার আগে সব কাজ মিটিয়ে ফেলতে পারলে তো গঙ্গাস্নান করব। কি যে আছে কপালে জানিনে!' গলা ধরে এল, নিজেকে সামলাতে উনি তাড়াতাড়ি হুঁকোর নলে টান দিতে লাগলেন। মামাজী গুড়গুড়ির নলটা ওঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। একটান দিয়ে বাবুজী মন্তব্য করলেন, 'পাশ ফেল তো লেগেই আছে, তারজন্য জীবনে কোন কাজটা আটকে থাকে? কিন্তু চন্দজী, তুমি কিছু

মনে কোরনা আবার, এই সমরের বিয়ের মত গোলমেলে ব্যাপার এবার আর যেন না ঘটে এইটেই আমি চাই। দেনাপাওনার কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার...'।

বাবুজীর ধমক খেয়ে অপমানে মনটা তেতো হয়ে উঠল আর চোখে জল এসে গেল আমার। আমার দফা তো সেরেছে, এবার অমরটাকেও বিয়ে দিয়ে দাও! বাড়িতে এখনই অশান্তির অন্ত নেই, তারওপর আবার একটা বাড়তি লোকের খরচা! ঠিক কথা, বিয়ে তো কারো বাকি থাকে না, কিন্তু আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবার অবস্থা হোক! না, তা কেন শোনা হবে? এখানে তো কথার মাঝে কথা বলা দারুণ পাপকাজ। এখন দেনা-পাওনা নিয়ে কত পরিষ্কার কথা হবে, তারপর আবার তাই নিয়ে ঝগড়াও হবে। যতই চেষ্টা কর, বারণ কর, এঁরা শোনবার পাত্রই নন। এসব বিষয়ে আলোচনা করার অধিকার তো কেবলমাত্র এঁদেরই আছে কিনা! আমরা তো বোকা আহাম্মক আর নয়ত বলির পাঁঠা। এতদিন আমি মরছিলাম, এবার অমরের পালা। এখানে বসে থেকে লাভ কি? দিব্যি একটু বিশ্রাম করছিলাম।

উঠতে গেছি, আবার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন মামাজী, 'আরে চললে কোথায়? বস এখানে, কখন থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি, তুমি এতক্ষণ গিয়েছিলে কোথায়?'

ঢোঁক গিলে বলি, 'কলেজ গিয়েছিলাম মামাজী'। এই সময় অমর ভাইসাহেবের মেয়েকে এনে বাবুজীর কোলে বসিয়ে দিয়ে নেহাৎ নির্লিপ্তভাবে চলে গেল যেন এখানে এইসব আলোচনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই।

মামাজী বলে উঠলেন, 'বাঃ বাঃ, কলেজে যেতে শুরু করেছ? খুব ভাল কথা, পড়ো বাবা খুব পড়ো! বিদ্যাই হল আসল সম্পদ।'

আমি চুপ করেই রইলাম।

'তা আর সব খবর ভাল তো? বড় রোগা দেখাচ্ছে যেন, কি ব্যাপার? শরীরের দিকে একটু নজর দিতে হয়।' এবার একটু অর্থপূর্ণ হাসির সঙ্গে বলেন, 'আজকাল সংঘে গিয়ে ভোরবেলা প্যারেড চলছে কিনা?'

'বেলা ন'টার আগে কুমার সাহেবের সকালই হয়না। প্যারেড করতে কি দুপুরবেলা যাবে নাকি?' বাচ্চাটাকে কোলে নাচাতে নাচাতে নিচুগলায় বাবুজী মন্তব্য করেন, কিন্তু কথাটার খোঁটা এতই তীক্ষ্ণ যে আমার গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়। এ সেই সেদিনের খোঁটা। একবার ইচ্ছা হল মাথা সোজা করে উত্তর দিই, 'হ্যাঁ, বেলা দশটার আগে আমার ঘুম ভাঙেনা। আর কি বলবেন বলে ফেলুন।' কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, 'না মামাজী, তা নয়। এবার গরমটা এত বেশী পড়েছে যে কিছুই করা হয়ে উঠছে না।'

'হ্যাঁ তা বটে, তা বটে' বলতে বলতে বাবুজীর হাত থেকে গড়গড়ার নলটা নিজের হাতে নিয়ে ঠোঁটে লাগাতে লাগাতে বলেন, 'এবার বাড়ির দিকেও একটু নজর দাও বাবা! এদিকেও একটু সাহায্য করার কথা তো ভাবতে হবে। মা বাপের প্রতি কর্তব্য হল

সবচেয়ে বড়। এখন বড় হয়েছ, সংসারী হয়েছ, এবার ছোটভাইদের তুমি পড়াও। একলা বড়ভাই কতদিন সামলাবে?'

বাবুজী আবার ফোঁস করে উঠলেন, 'ও কারো জন্য চিন্তা করে নাকি? ওর নিজেরটুকু আর ওঁর বউরাণীরটুকু হলেই হল, বাকি সংসার চুলোয় যায় ওর কিচ্ছু যাবে আসবে না।' আরো কিছু কটুকথা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু এবার মামাজী ওঁকে ঠুকলেন, 'ঠাকুর সাহবে, আমি বলি কি আপনি থামুন! আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি, আর জবাব দিচ্ছেন আপনি। ও তো আর ছোটবাচ্চা নয় যে কিছুই বুঝবেনা। দেখ বাবা তোমাকে লেখাপড়া শেখানো হয়েছে, বিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর কতদিন বাপ মা তোমাদের পালন পোষণ করবেন বল তো? নিজেরা কত রকম কষ্ট করে বাপ মা যে ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শেখান, তাদের ওপর বাপ মায়ের আশা থাকে না?' উনি আবার আমায় নিজের কাছে টেনে নিলেন।

বাবুজী নিশ্চয় মামাজীর কাছে এইসব কাঁদুনি গেয়েছেন, না হলে ইনি জানবেন কি করে? তাই বোধহয় মামাজী আশ্বাস দিয়েছেন আমাকে বোঝাবেন। আগে থেকে সব কিছু ঠিক কবা হয়েছে, প্ল্যানটা বেশ বুঝলাম। কিন্তু আজ প্রায় দুবছর পরে আমার বাড়ির কেউ আমার সঙ্গে এমন আদর করে কথা বলছে, বোঝাচ্ছে। সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পেরেও মামাজীর এই আপনজনের মত ব্যবহারে আমার চোখে জল এসে গেল, কোন কথা না বলে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল নাড়াতে নাড়াতে চুপচাপ ওঁর কথা শুনতে লাগলাম। বিয়ে-থা তো সবারই হয়, তাই বলে কি কেউ নিজের ভাই বোন, বাপ মাকে ত্যাগ করে? দু চারখানা বাসনপত্র একত্র থাকলে ঠোকাঠুকি লাগবেই। মেয়েদের কথা বাদ দাও তারা তো কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে। বুদ্ধিমান পুরুষ কখনও মেয়েমানুষের কথায় চলে না। তুমি তো আমাদের চেয়ে কত বেশী পড়াশোনা করেছ, সবই তো বোঝ। সে তো এসেছে অন্য বাড়ী থেকে, অন্য পরিবার থেকে। তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধের মধ্যে তাকে আনবে কেন? নিজের বাড়ীর লোকের সঙ্গে তোমার রক্তের সম্পর্ক। সেটাতো আর কোনদিন বদলে যাবে না? তাই তো বলছি বাবা এসব হল পারিবারিক সমস্যা, খুব বুঝে সুঝে সাবধানে পা ফেলতে হবে।' মামাজী আমার পিঠে কাঁধে হাত বুলিয়ে চলেছেন।

আমার ভিতর থেকে যেন একটা চিৎকার উঠে আসতে চাইছে, 'মামাজী এ বাড়ির অবস্থা তুমি কিছুই জাননা। যদি জানতে তা হলে আর অমরের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসতে না।' কিন্তু কথাগুলো ভিতরেই থেকে গেল। বাইরে শুধু অপরাধীর মত মাথা নিচু করে শুনেই গেলাম।

'শাশুড়ী বউয়ে ঝগড়া? তুমিই বল ভায়া কোন বাড়িতে সেটা হয়না? বড় বড় লাখপতিদের ঘরের কেচ্ছাও জানা আছে আমার। ঘরে ঘরে মাটির উনুন — বুঝলে?' মামাজীর আদরের হাত আমার পিঠের ওপর ঘুরছেই।

জানিনা কেন কেবলই কান্নায় আমার ভিতরটা যেন ফুলে ফুলে উঠছে। ইচ্ছে করছে বাবুজীর পায়ে পড়ে কেঁদে ক্ষমা চাই, বলি আমি অনেক অসভ্যতা করেছি, বাড়াবাড়ি করেছি। এইভাবে সমস্ত বিষয়টা আজ পর্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। অনেক কষ্টে আমি কেবল এইটুকুই উচ্চারণ করতে পারলাম, 'মামাজী, আমি আরো অনেকদূর পড়তে চাই'।

'পড়তে কে আর না চায় বল? কিন্তু বাবা বাড়ির অবস্থার কথাও তো ভাবতে হবে? অবস্থা বুঝেই তো ব্যবস্থা করতে হয়? তোমার বড়ভাইকে দেখ, সে তো তার কর্তব্য করেই চলেছে। সংসারে থাকলে সব কথাই বিবেচনা করতে হয় বাবা! তুমি এখন সংসারী হয়েছ, বুঝে দেখ সংসারে কি ভাবে চলতে হয়। বউকে একটু শাসনে রাখ, আদব কায়দা শেখাও। এই সময় যদি বেশী সোহাগ দেখিয়ে মাথায় তোল তাহলে আর কোনদিনই কিছু শিখবে না। শ্বশুরঘর করতে এলে তবেই তো মেয়েরা সবকিছু শেখে। বাপের বাড়িতে তো শুধু হেসে খেলে কাটায়, কোন কাজই করতে হয়না তাদের।' মাখনের মত নরম আর মধুর মত মিষ্টি মিষ্টি কথায় মামাজী আমাকে অনেক জ্ঞান দিলেন, কি ভাবে 'মেয়েমানুষকে সামলে' রাখতে হয়। বুঝতেই পারছিলাম এগুলো শুধু নির্দোষ উপদেশমাত্র নয়, আমার এবং প্রভার নামে যে সব নিন্দা করা হয়েছে সেইগুলোরই পুনরুল্লেখ। প্রতিবাদ করার ইচ্ছা অনেকবারই হচ্ছিল।

'তাছাড়া তোমার বাবুজী বলছেন তুমি নাকি আজকাল পূজো পাঠ, ধর্ম কর্ম সব ছেড়ে দিয়েছ? এটা কি হচ্ছে? লেখাপড়া শেখার কি এই ফল? ধর্ম ছাড়লে সংসারটা টিঁকবে কি করে? আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা ভেবে দেখ, কত বিপদ, কত সঙ্কট এসেছে, সেই বীরপুরুষেরা প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু আপন ধর্ম ছাড়েননি। হকীকত রায়, বান্দা বাহাদুর এঁদের ওপর কত অত্যাচার হয়েছে। ওহে, এই আমাদের ধর্মের কল্যাণেই তো আজ তুমি আমি এখানে বসে রয়েছি, না হলে তো হয় পাকিস্তানে গিয়ে থাকতে হত, নয় কোন গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করতে হত। আমার চেয়ে তো তুমি ঢের বেশী পড়েছ। তুমি নিজেই জান, জার্মানরা আমাদের দেশ থেকে বেদ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল বলেই তো এই সব নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে পেরেছে? সব তো চুরি করা বিদ্যে। হ্যাঁ, নিজেদের বুদ্ধিতে যদি উড়োজাহাজ আর রেডিও বানিয়ে ফেলতে পারত তাহলে বুঝতাম!' নিজেদের অতীত গৌরবের স্মৃতিচারণে ওঁর চোখে জল এসে গেল।

কি উত্তর দেওয়া যায় এইসব কথার সেইটেই চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ উচ্চকণ্ঠের আওয়াজে সমস্ত পরিবেশ যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। 'চন্দন, তুমি একটা পাথরকে এতকথা বোঝাবার চেষ্টা কেন করছ বল তো? কথায় বলে 'শিক্ষা যাকে মানায় তাকেই দাও,...বাঁদরকে শিক্ষা দিতে যেওনা, সব বেকার হবে।' এখানে কোন ফল হবেনা ভায়া, জলবিন্দুর মত সব গড়িয়ে পড়ে যাবে। চুপচাপ শুনে যাবে সব কথা, কিন্তু করবে যা ওর নিজের খুশি, আর যা বলবে ওর বউ। কেন শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ? ওরও বউয়ের কাছে যেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে।' একটু চুপ থেকেই আবার বলে উঠেন, 'যা ইচ্ছে

তাই করতে দাও ওদের। আমাদের কপালে যা আছে আমরা ভুগব। এতদিন ধরে তো ভুগে আসছি।'

এই আকস্মিক বিস্ফোরণে মামাজীও একটু ভ্যাবাচ্যাকা, এটা বোধহয় ওঁদের প্ল্যানের মধ্যে ছিলনা। মামাজী আমার পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, 'আরে না-না, আমাদের সমর কি কচি খোকা নাকি? ও সবই বোঝে, তবে ছেলেমানুষ তো হাজার হোক। কি রে তাই না? বাপের কাছে ক্ষমা চেয়েনে বাবা, উনি গুরুজন।' মনের মধ্যে যে নম্রতা, ভদ্রতাবোধ জোগে উঠছিল, একটা কাতর আদ্র অনুভূতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল, খট করে একটা সুইচ টিপে কেউ যেন এক নিমেষে সেসব ভিতরে গুটিয়ে নিল। বাবুজীর কথাগুলো মনটা যেন চিরে দু ফালা করে দিয়েছে। সমস্ত শিষ্টতা সভ্যতার মাথায় লাথি মেরে কটুতম ভাষায় জবাব দেবার জন্য একটা তীব্র বাসনায় জিভ যেন লক লক করে উঠল। এতক্ষণের নত মাথা উদ্ধতভাবে এক ঝটকায় উঁচিয়ে তুলে একটিও শব্দ উচ্চারণ না করে বেপরোয়াভাবে চলে এলাম ওপরে। হ্যাঁ, আমি যা, তাই থাকব। কর তোমরা যা করতে পার।

ছাদে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কি করা যায়, আবার বাইরে বেরিয়ে পড়ব না খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ব। এমন সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এল প্রভা, ব্লাউজ বদলাচ্ছিল বোধহয়, সামনের বোতাম লাগাতে লাগাতে কাছে এসে একটু আমার দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে?' গালে হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখে বলল, 'শরীর ভাল আছে তো?'

কোনরকম প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রভা আবার প্রশ্ন করল, 'কি বলছিলেন মামাজী?'

'বলছিলেন আমার মাথা আর মুণ্ডু,' ঝাঁঝিয়ে উঠলাম আমি। কিন্তু তারপরই প্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, এ বেচারার কি দোষ? ওর ওপর ঝাল ঝাড়ছি কেন? ও তো জানেই না কিছু। একটু নরম হয়ে বলি, 'উনি বোঝাচ্ছিলেন বউকে কি করে শাসনে রাখতে হয়। আমি জানি বাবুজী খুব করে লাগিয়েছেন আমাদের নামে। না হলে, উনি তো আর জ্যোতিষী নন যে মুখ দেখেই সব বুঝে ফেলবেন! আসতে না আসতে এত কথা উনি জানলেন কি করে?'

প্রভা আদর করে কাঁধে হাত রেখে বলে, 'আহা বলেছেন তো কি হয়েছে, তাই নিয়ে এত মন খারাপ করা কেন? যাও না, বাইরে একটু ঘুরে এস, ভাল লাগবে। গুরুজন তো! বোঝানোই তো ওদের কর্তব্য।'

'ওঃ ভারি সব বোঝানেওয়ালা এসেছেন। অন্যদের তো বোঝাতে পারেন না?' একটু ভেবে নিয়ে আবার বলি, ' না প্রভা, আসল মুশকিল হচ্ছে আমার স্বভাবটা ভারি দুর্বল, তাই যার ইচ্ছে সেই আমার ওপর চাপ দিতে শুরু করে। উনি একটু স্নেহের সুরে কথা বলতেই আমি একেবারে গলে যাচ্ছিলাম। তুমিই বলতো কি এমন দোষ করেছি যে বাবুজীর কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে? আমার অন্যায়টা ঠিক করে বুঝিয়ে তো দাও

যাতে আমি বলতে পারি, 'বাবুজী আমি এই অপরাধ ভুলকরে করে ফেলেছি, আমায় মাফ করে দিন।' আমি আজ পর্যন্ত ওঁর মুখের উপর কোন চোটপাট জবাব করিনি, ওঁর সামনে বেয়াড়া কিছুই করিনি, কারো কাছে ওঁর নামে কোন উল্টোপাল্টা কথাও বলিনি। সবসময় এই কথাই শুনে যাচ্ছি, 'বউ শেখাচ্ছে, বউ শেখাচ্ছে।' কি শেখাও তুমি আমাকে শুনি? কেউ কোন কথা বলতে চাইলেই তারওপর হাঁউমাঁউ করে গর্জন করতে হবে এ কেমনধারা নীতি? 'বউ এই করেছে, বউ তাই করেছে'। এদিকে রাত তিনটেয় উঠে কাজ শুরু কর, ওদিকে রাত বারোটার আগে শুতে পাওনা, তুমি তো মরতে বসেছ। অন্যদেরও সাধ আহ্লাদ বলে কিছু থাকতে পারে একথাটা কি কেউ ভেবেও দেখবে না? তুমি ভেবে দেখ, এ বাড়িতে কেউ কি কারো কথা ভাবে একটুও?' আমি গজগজ করেই চলেছি।

প্রভা বোঝাবার চেষ্টা করে, 'ঠিক আছে, এখন এইসব নিয়ে রাগ করে লাভ কি? অল্পদিনেরই তো ব্যাপার। চিরকাল তো এইভাবে চলবে না।'

আমি রাগের ঝোঁকে তখনও বলেই চলেছি, 'আমাকে ধর্ম বোঝাতে এসেছেন। আগে নিজে তো বুঝে দেখুক একটু। ধর্মের দোহাই দিয়ে দিয়ে মানুষকে খুন করে ফেলবে এরা। দুনিয়াটা কোনদিকে চলেছে তা কারোকে দেখতেও দেবে না। মন্দিরে বসে বসে কেবল খোল করতাল বাজাও, ব্যস আপনা থেকে সব কিছু হয়ে যাবে, ভগবান করে দেবে সব! যদি কেউ একটু বুদ্ধিমানের মত কথা বলে তাহলেই তাকে নাস্তিক বদনাম দিয়ে সবাই মিলে তার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোল!

প্রভাও এবার একটু ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আরে বাবা না হয় বলেইছে, তাতে হয়েছেটা কি শুনি? যাও, গিয়ে নিজের কাজ কর। ওঁরা বয়সে বড়, ওঁদের অনেক কিছু বলার অধিকার আছে।' একটু হাল্কা সুরে এবার যোগ করে, 'তোমার বিয়েটাও তো ওঁরাই দিয়েছেন, একটু কথাবলার অধিকার থাকবে না ওঁদের?'

'খুব ভাল কাজই করেছিলেন,' আমি তেড়ে উঠি, 'বাড়ির অবস্থা তো এখন খুবই চমৎকার কিনা, তাই আবার আর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে চলে এসেছেন। এবার নজর পড়েছে অমরের দিকে, যার নেই কোন রোজগারের ঠিকানা। সেও এসে তোমারই মত দুর্গতি ভোগ করবে, এক পয়সার ছুঁচসুতোও হয়ত জুটবেনা তার ছেঁড়াশাড়ী সেলাই করে পরার জন্য। একজন রোজগার শুরু করতেই আমার বিয়ে দিয়ে ফেলা হল। এখন আমি কিছু রোজগার শুরুই করিনি বলতে গেলে, এরমধ্যেই তৃতীয়টিকে ফাঁসাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। যে আসবে তার কপালে ভাগ্যের মার আছে সুতরাং মার খেতে হবে তাকে।'

প্রভা এবার খুব হেসে উঠল, 'ওরে বাবা, এখন থেকেই তোমার এইরকম হালচাল, বুড়ো হলে তো দেখছি ওঁদের থেকেও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে!'

ওর কথার ধরণে রাগটাগ ভুলে হেসে ফেললাম। ইচ্ছে হল ছোট্ট একটি চাপড়

মেরে বলি, 'দুষ্টু কোথাকার'। কিন্তু বেশ গম্ভীরভাব দেখিয়ে বললাম, 'না প্রভা, আমি বুঝেছি আসল কথাটা। আজ হল এগারো তারিখ, ওঁরা ভাবছেন আমি মাইনে পেয়ে গেছি, কিন্তু একটা টাকাও সংসারে দিইনি। তারপর আজকেও যখন এ প্রসঙ্গে কিছু বললাম না তখন ওঁদের ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে গেল।'

'ওমা, তাই তো, আমিও তো জিজ্ঞাসা করতে ভুলেই গেছি। গতকালই তো টাকা পাবার কথা, কি করলে?' বেশ দায়িত্বশীলা গৃহিনীর মত ও প্রশ্ন করে।-

আমার গলা আবার তেতো হয়ে ওঠে, 'শালা প্রেসওয়ালা, কিছু তো দিল না। এরচেয়ে টিউশনি জোটালেও ভাল হত। ও শালার গুষ্টিশুদ্ধ মরুক! ব্যাটা কি ভাবছে কে জানে। এদিকে ধার হয়ে গেছে প্রায় একষট্টি টাকা। এখন আটটা টাকাও যদি বাবুজীকে দিই তাহলে চিনেবাদাম কেনার পয়সাও থাকবেনা নিজের কাছে। কি জ্বালা বল দেখি? কাল যদি না দেয় তো স্পষ্ট বলে দেব, আমার টাকাটা ফেলেদে, দিয়ে তুই চুলোয় যা। আমার কি বাড়িতে টাকার গাছ আছে? তোর ভাবনা কি বাবা? কত মক্কেল তো আসছে যাচ্ছে। এইরকম করে যদি মাইনে আদায় করতে হয় তো রইল তোদের প্রুফরিডারী, আমি অন্য কিছু খুঁজে নেব এখন। এমন চাকরির মুখে আগুন। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।' শালার গাঁট থেকে পয়সা বের করাই যায়না...' প্রভা এবার মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে থাকে। আমার মনে হয় ও যেন আমার মন ভাল করার জন্য নকল হাসি হাসছে। প্রভা বলে, 'তুমি যে সত্তর বছরের বুড়িদের মত গালাগাল শুরু করলে, কেউ শুনতে পেলে কি ভাববে বল তো?' এবার ও আমাকে *ঠেলেঠুলে* বাইরে পাঠায়, 'যাও যাও, খোলা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে এস। তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু, খাবার নিয়ে বসে থাকব আমি।'

নিজের বোকামি দেখে আর প্রভার কথা শুনে তখনকার মত হাসতে হাসতে বাইরে এলাম বটে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মামাজী আর বাবুজীর কথাগুলো আবার নতুন করে ঘুরপাক খেতে লাগল মাথার মধ্যে। একটা কথা ভেবে আশ্চর্য লাগছে, বাবুজী রূঢ়ভাবে যা বলেছেন আর মামাজী মধু মাখিয়ে যা বলেছেন দুটোরই মর্মার্থ কিন্তু একই। দুজনের বলার কায়দা দুরকম বটে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে এক।

এইসব চিন্তা নিয়ে পথে পথে ঘুরছিলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। আপনমনে চলতে চলতে হঠাৎ মনে হল কেউ যেন আমার পিছু নিয়েছে। পিছন ফিরে তাকাতেই দিবাকর হেসে উঠল। ওর সঙ্গে আরো একজন রয়েছে। ওকে ভালভাবে দেখতে পাবার আগে আমি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। দিবাকর বলে উঠল, 'কোথায় চলেছ, কেন যাচ্ছ এসব কথা কি খেয়াল থাকে তোমার পথে বেরিয়ে? প্রায় দু ফার্লং রাস্তা আমরা আসছি তোমার সঙ্গে সঙ্গে। নিজের মনে কি সব বিড় বিড় করছিলে, হাত নাড়ছিলে। একা একা নিজের মনে রাগ, একা একা ঝগড়া করা — এসব কি হচ্ছে?'

লজ্জা পেয়ে খুব থতমত খেয়ে গেলাম। নজর করে দেখি, অন্ধকারে শিরীষভাই

দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। টান দিলেই ওঁর চোখের নীচে একটি আগুনের ফুল ঝিলিক দিয়ে উঠছে। আমি তাড়াতাড়ি নমস্কার জানালাম ওঁকে। কতদূর থেকে আমাকে লক্ষ্য করতে করতে অনুসরণ করছিল ভেবে খুব লজ্জা করছে। নিজের মনে কত কি যে বলেছি, কি কি অঙ্গভঙ্গি করেছি কে জানে। সেইসব দেখে এরা কি না জানি ভেবেছে আমাকে। মুখে একটা বিব্রত হাসির ভাব এনে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা এলে কোথা থেকে?' দিবাকর আবার বলে, 'ঐতো বললাম আধঘন্টা ধরে পিছন পিছন আসছি। তুমি আপনমনে কত কি বলতে বলতে পথ চলছ তাই শুনতে শুনতে আসছিলাম।'

'বুঝতেই পারছিলাম গুরুতর কোন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছ। কি ব্যাপার? ভারতীয় সংস্কৃতিতে কোন জটিল গিঁট পড়েছে নাকি?' বলতে বলতে বেশ জোরেই হেসে ওঠেন শিরীষভাই, তারপর আমার গম্ভীর মুখ দেখে সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করেন, 'কি এমন উৎকট সমস্যায় পড়েছ বল তো?' দিবাকর একা থাকলে সে সময় হয়ত কথাটা এড়িয়ে যেতাম বা কিছু একটা বানিয়ে বলে দিতাম। কিন্তু এঁকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি তাই সঙ্কুচিতভাবে বললাম, 'তেমন বিশেষ কিছু নয় শিরীষভাই! আসলে আমার মনের মধ্যে কোন একটা চিন্তা দেখা দিলে সেটা সহজে তাড়াতে পারিনা।'

'দেখ, যে সমস্যা নিয়ে তোমার মন আর আত্মা পীড়িত হচ্ছে সে সমস্যা সর্বদা কারো না কারো কাছে খুলে বলা উচিত। তারফলে তোমার নিজের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব অনেকটা কমে যাবে। খৃষ্টানদের মধ্যে পাদরীর কাছে নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি করার একটা রীতি প্রচলিত আছে। এরফলে মনের ভার লাঘব হয়, সম্ভবত এই কারণেই এই প্রথা প্রচলিত হয়েছিল।' আমার কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে উনি বললেন, 'অবশ্য তোমার কোন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আমি বলতে বলছি না তোমাকে।'

দিবাকর অন্য কাঁধে হাত রাখল, 'তা যদি ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, আর ও যদি বলেই দেয় তাহলেই বা ক্ষতি কি?'

শিরীষ কিন্তু দিবাকরের কথায় হেসে বললেন, 'ওরকম পুলিশী কায়দায় স্বীকারোক্তি আদায় করা আমার ভাল লাগেনা।'

এরা হয়ত কিছু মনে করছে এই ভেবে বলে উঠলাম, 'না না এমন কিছু সমস্যা নয় ভাই।' একটুক্ষণ ভেবে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'দিবাকর, তুই তো জানিস আমাদের বাড়িতে কতরকম ঝামেলা, রোজ কিছু না কিছু লেগেই আছে। আমার বিয়ের ঝঞ্ঝাট চুকতে না চুকতেই এখন অমরের বিয়ের কথা হচ্ছে। এ নিয়ে কিছু বলতে গেলেই রাজ্যের উপদেশ শুনতে হয়।'

শিরীষভাই প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা সবাই তো একসঙ্গেই থাক, তাই না?'

'কাকারা আলাদা থাকেন, আমরা থাকি একসঙ্গেই,' আমি বলে দিই।

'কিছু মনে কোরনা ভাই, তোমাদের পরিবার সম্বন্ধে কিছু ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করছি'— পথ চলতে চলতে শিরীষভাই আমাদের বাড়ির সবাইকার সম্বন্ধে অনেক

প্রশ্নই করলেন এবং আমিও লুকোবার চেষ্টা না করে সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। পারিবারিক কলহের কথা যখন উঠল আমি ব্যাথিতভাবে স্বীকার করলাম যে আমার বিয়ের দিন থেকেই লড়াই ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রভা কতদূর পড়েছে, তার স্বভাব কেমন? তার আশা আকাঙক্ষা কি রকম? বাড়িতে কি কি অসুবিধা? এসব প্রশ্নও হল। ওঁর এই ডাক্তারের মত জেরা করার ধরণে আমি বিব্রত বোধ করছিলাম বটে কিন্তু প্রভার বুদ্ধি বিবেচনা, শিক্ষা, সাধ এসবের কথা বলতে খুব ভালও লাগছিল। তবে সবশেষে যে প্রশ্নটি এলো তার উত্তর দিতে পারলাম না আমি।

সিগারেটে টান দিতে দিতে উনি প্রশ্নটা করলেন এইভাবে 'বুঝলাম তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন, তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস না স্বামী হিসেবে তোমার কর্তব্য পালনের জন্যই তার সম্বন্ধে এইভাবে চিন্তা করছ?'

'আমি...আমি' আমি তোৎলাতে শুরু করলাম। সত্যিই তখন আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না প্রভার প্রতি আমার যে মনোভাব তা কি সত্যিই প্রেম, না আমার নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতাপ অথবা প্রভার অসহায় অবস্থার প্রতি করুণা। কি উত্তর দেব বুঝতে পারছিলাম না। তবু কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'ওর ইচ্ছাতেই আমি পড়া চালিয়ে যাচ্ছি। ও না থাকলে আমি এতদিনে নিশ্চয় কোথায়ও শ'খানেক বা সওয়াশ টাকার একটা কেরানীগিরিতে ঢুকে পড়তাম। ওর খুব আশা যে আমি অনেকদূর পড়ব এবং তারপর বড়গোছের একটা চাকরি করব। আমার জন্য ও যে কত কষ্ট সহ্য করছে সে আর কি বলব শিরীষভাই। এখন ও ভোর তিনটেয় উঠে আমার খাবার তৈরী করে দেয়, ওদিকে খাটে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত।'

তিনজনেই চুপচাপ চলেছি। আমি খুঁজছি প্রশ্নের উত্তর। হঠাৎ একটা কথা মনে এল, এটাও শিরীষভাইকে জানাতে ইচ্ছা হল, আমার, 'ও আমার জন্য নিজেকে যেন লুপ্ত করে দিচ্ছে, ওর নিজের দুঃখ, সুখ, আকাঙক্ষা কিছু যেন নেই।' কিন্তু এটা তো ওর সম্বন্ধে বলা হল, আমার নিজের মনোভাব প্রভার প্রতি কেমন এ কথার উত্তর তো এখনও দেওয়া গেল না? কিন্তু প্রভার কথা ভাবলেই মনটা যেন বেদনায় টন টন করে ওঠে, মনের এই ব্যাকুলতা বাইরে কি করে প্রকাশ করব? অস্থির হয়ে তাকালাম শিরীষভাইয়ের দিকে। উনি আপনমনে কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছেন, কিছু একটা বলবেন নিশ্চয় আমি জানি। তারই প্রতীক্ষা করছি।

পথে লোকজন নেই। কোন রাস্তায় চলে এসেছি কে জানে। ভাল করে লক্ষ্য করলে জায়গাটা চিনতে পারব ঠিকই। পথের পাশের উঁচু দেওয়ালে বড় বড় কাল রং এর অক্ষরে জুতো আর কাপড়ের বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে থেমে গেলাম। চারপাশ থেকে একটা কুয়াশা যেন জড়িয়ে ধরছে। বোধহয় রাত্রি সাড়ে আটটা ন'টা হবে। চাঁদের আলোর বন্যায় আকাশ আর পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে, সেইজন্যই বোধহয় পথের আলোও জ্বলেনি। শুক্লপক্ষে আলো জ্বালা হয়না রাস্তায়, একটা অদ্ভুত ব্যাপার— চাঁদনীরাতে যেখানেই থাকি না কেন প্রভার কথা ভাবলেই আমার ওর সেই জড়োসড় হয়ে ছাদে বসে কান্নার ছবিটা মনে পড়ে যায়। এখনও ঠিক তাই হল।

শিরীষভাই যেন অনেকদূর থেকে কথা বলে উঠলেন, 'দেখ ভাই সমর, তোমার, দিবাকরের, তোমাদের সবাইকার প্রকৃত অবস্থাটা জানার পর একটাই কথা আমার মনে হচ্ছে — এই একান্নবর্তী পরিবার প্রথাকে ভাঙা দরকার। যদি নিজে বাঁচতে চাও, যদি নিজের স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও তো আলাদা থাক, এ ছাড়া অন্য পথ নেই। যেমন করে পার আলাদা হয়ে যাও...।'

এই কথাটা (অর্থাৎ পরামর্শটা) এতই অপ্রত্যাশিত যে আমি একেবারে চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। থতমত খেয়ে বলে ফেললাম, 'আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না শিরীষভাই।'-

'সমরভাই, কিছু মনে কোরনা, সত্যি কথাটা হচ্ছে এই যে তোমার স্ত্রীর সমস্ত আশা আকাঙক্ষা এবং তোমার সমস্ত চেষ্টা ঐরকম পরিবেশে ব্যর্থ হয়ে যাবে, দমবন্ধ হয়ে মরবে। একটার পর একটা সমস্যা দেখা দেবে এবং তোমাদের স্বপ্নগুলো সারাজীবন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে।'

'অর্থাৎ আপনি একান্নবর্তী পবিবারের সম্পূর্ণ বিপক্ষে?' ব্যক্তিগতভাবে আমি তো নিজেই বুঝছি ওঁর কথার সত্যতা, কারণ আমাদের সংসারের সমস্যা তো সত্যিই অন্তহীন। কিন্তু তবু পরিবারজীবনের এই ব্যবস্থা বা ধারাটি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে এরকম একটা ঘোষণা ঠিক যেন গলা দিয়ে নামতে চাইছে না।

'হ্যাঁ ধরে নাও তাই', বেশ জোর দিয়েই বললেন উনি, 'আজকের দিনেব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একান্নবর্তী পরিবার চলতে পারেনা। যদি চালানো যায় জোর করে তাহলে বাইরে থেকে যেমনই দেখাক না কেন ভিতবে ভিতরে তা ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়বেই। এই তুচ্ছ ভাবাবেগের পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর হয় তা কল্পনাও করতে পারবে না। দিবারাত্রি অশান্তি, লড়াই ঝগড়া মারপিট সব চলতে থাকবে, তবু একসঙ্গে থাকা চাই, না হলে মান ইজ্জত থাকবে না, যাই হোক কিছুতেই হাঁড়ি আলাদা করা চলবে না। এই সব লোকদেখানো ভাবাবেগের পিছনে চলতে থাকবে হীনস্বার্থবুদ্ধির টানাটানি। এরই জন্য প্রতিদিন কত যে হত্যা আর আত্মহত্যা ঘটে যাচ্ছে। সেসব ছেড়ে দিলেও, আর একটা পরিণাম এত নিদারুণ যে তার সঙ্গে আর কিছুর তুলনাই চলেনা!'

'সেটা কি?' এমন জায়গায় থামলেন উনি যে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে। উনিও বুঝলেন আমরা মন দিয়ে শুনছি ওঁর কথা। বললেন, 'একান্নবর্তী পরিবার' শব্দটা শুনতে খুবই মহৎ এবং উচ্চ আদর্শের প্রতীক কিন্তু এর সবচেয়ে বড় দোষ এইটেই যে এরকম পরিবারে কোন সদস্যই তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারেনা। সমস্তক্ষণ তো চলছে সমস্যা খাড়া করার চেষ্টা অথবা যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো সামাল দেবার প্রয়াস। কলহ-বিবাদ, স্বার্থের টানাটানি, পরস্পরের ওপর শোধ তোলার ভাবনা গ্লানিবোধ সব মিলিয়ে পরিবেশ এমন শ্বাসরোধী আর বিষাক্ত হয়ে ওঠে যে সেখানে নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আর এইসব কিছুর মূলে থাকে টাকা এ

তো জানাই আছে ফলে আমরা যেন ভেঙে দুটো টুকরো হয়ে যাই, একটা ভাগকে বাইরের দুনিয়ায় রোজগারের ধান্দায় লড়াই চালাতে হয় অন্যটাকে পারিবারিক জীবনের লড়াই চালাতে হয়। সাধাসিধে সরল বুদ্ধি এবং হৃদয়সম্পন্ন মানুষ এই পরিস্থিতির পেষণে ধ্বংস হয়ে যায়।'

এতক্ষণে দিবাকর একটা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কিন্তু এটা তো হল পরিস্থিতি, পরিণামটা কি হল?'

'বললাম তো পরিণামে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না। নিজের ক্ষমতা এবং প্রতিভাকে ঠিকপথে চালনা করবার অবসরই পাওয়া যায়না। বলা যেতে পারে, আমরা এমন সব সমস্যা খাড়া করে তার পিছনে নিজেদের শ্রান্ত ক্লান্ত করে ফেলি যে আমাদের স্বপ্নগুলোকে সাকার করে তুলবার মত বুদ্ধি, শক্তি, উদ্যম কিছুই আর অবশিষ্ট থাকেনা। লেখাপড়ার চর্চা, বুদ্ধি ও মননের বিকাশ এসবের শক্তি আসবে কোথা থেকে? আমাদের দেশে এখন যে অতি উৎকৃষ্ট প্রতিভার আবির্ভাব ঘটছেনা আর তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এইটি। যা হোক খানিকটা মুখস্ত করে পরীক্ষায় পাশ করে গেলেই মনে করা হয় মস্ত একটা কাজ হল। অন্যের চর্বিতচর্বন খানিকটা মুখস্ত করা ছাড়া আর কোন লাভ হয়না। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য দর্শনের জগতে কিছু দিতে পাবা তো দূরের কথা, সেই জগত যে কতদূর এগিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত ঘটেনা আমাদের। যেটুকু আমরা শিখি তা পঞ্চাশবছরের পুরোন ঐ চর্বিতচর্বনমাত্র। নিজেদের এই দৈন্য আর ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য তখন আমরা বলতে শুরু করি, অত জ্ঞান বিজ্ঞান শিখবার আমাদের দরকারটা কি? আমরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী জাতির বংশধর, বিশ্বকে আমরা কত কিছু দিয়েছি! সব ব্যাপারে রক্ষণশীলতায় অটল বিশ্বাসী এইরকম মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরী হচ্ছে।' যাই হোক নিজের বক্তব্যের সার কথাটি এবার উনি আবার বলে দিলেন, 'আলাদা থাক, এবং পরিবারের প্রতি যে দায়িত্ব নিজে অনুভব করছ তা পালন করার চেষ্টা কর।'

এই মানুষটির বিশ্লেষণ করে দেখার ক্ষমতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। কত সহজে সব কথা আমার মগজে উনি প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এই সোজা কথাগুলো নিজের বুদ্ধিতে এতদিন বুঝতে পারিনি কেন? হঠাৎ একটা কথা মনে হল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু শিরীষভাই, এটা কি খুব স্বার্থপরতা হবে না? বাপ মা তো কত আশা নিয়ে সন্তানদের পালন পোষণ করেন, লেখাপড়া শেখান। ভাবেন বুড়ো বয়সে এরাই দেখবে, বিপদে আপদে সহায় হবে, বংশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু ছেলে যদি সক্ষম হয়েই আলাদা হয়ে যায় সেটা কি স্বার্থপরতা হবে না?'

একটু দ্বিধা করে উনি বললেন, 'হ্যাঁ সেভাবে দেখলে স্বার্থপরতা বটে, কিন্তু বাপ যদি ছেলেকে নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ না দিয়ে, তাকে উন্নতি করার অবসর না দিয়ে ঐ সবের জন্য তাকে নিজের সঙ্গে বেঁধে রাখে তার চেয়ে এটাই কি বেশী ভাল নয়

যে, ছেলেকে তার পূর্ণবিকাশের সুযোগ দেওয়া হোক তখন, তুমি যা বলছ সেই কতব্যগুলো সম্বন্ধে সে নিজেই সচেতন হয়ে উঠবে। আমার মনে হয় সন্তান যদি দুটি একটি হয় তাহলে সঙ্কট এত তীব্র হয়ে ওঠে না। একান্নবর্তী পরিবার তখনই হয়ে ওঠে অভিশাপ যখন সন্তান হয় অনেকগুলি, এবং পরিবারের উপার্জনক্ষমতা হয় অত্যন্ত অল্প। এইরকম ক্ষেত্রেই বাপ মা ভাবতে শুরু করেন যে ছেলের ওপর আমাদেরই পূর্ণ অধিকার, ওদিকে পত্নী ভাবেন, সে পুত্র যারই হোক না কেন পতি তো তারই, সুতরাং তার উপার্জনে পত্নীরই প্রথম দাবী। কর্তব্য যদি করতে হয় তো আলাদা থেকে নিজের কোন ছোটভাই বা বোনকে নিজের কাছে রাখ। এভাবে বাপ মায়ের বোঝাও হালকা করতে পারবে। তাছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় এর ফলে পারস্পরিক সম্পর্কও ক্রমশঃ অনেক ভাল হবে। শেষপর্যন্ত ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা তো হয়েই যায়, কিন্তু তার আগে বিরাট কলহ, কোন দুর্ঘটনা এবং মুখ দেখাদেখি আর বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। বাপ মায়ের উচিত ছেলেপিলেকে মানুষ করে তুলে তারপর তাদের নিজেদের শক্তি পরীক্ষার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া এবং প্রয়োজনে সাহায্য করা। 'সবাইকে একসঙ্গে থাকতেই হবে' এইসব ভাবাবেগের পূর্ণ ধারণা যে কতদূর ক্ষতিকারক সেটা তাঁরা বুঝতেই পারেন না।'

আহা, এসব কথা প্রভা যদি শুনত! সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এলাম যে এই সব কথা প্রভাকে বলতেই হবে। শিরীষভাই, বাবুজীকে যদি এই সব কথা বোঝাতে যাই তাহলে যা গালাগাল খেতে হবে না — 'এমন খাসা শিক্ষা দিচ্ছেন যে বন্ধুটি তিনি কে শুনি একবার? যত সব বজ্জাত বখাটে ছোকরা, এদের সঙ্গে মিশলে এই সব ছাড়া আর কি শিখবে?...'

মামাজী আমাদের বাড়িতে সত্যিই আহার না করেই চলে গেছেন।

নয়

প্রভার প্রতি আমার যে মনোভাব সেটাকে কি প্রেম বলা যায়? না তার কষ্টের জন্য করুণাবোধ অথবা তারপ্রতি নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতাপ?...সেই প্রশ্নটা আরো কতদিন যে মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াত কে জানে কিন্তু সেদিন এমন একটা ব্যাপার ঘটল যাতে আমার সমস্ত দেহ যেন শিউরে উঠল। আর তখনই আমার মনে হল যেন কতকাল ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি একা, আমার আশে পাশে কেউ নেই কোথাও।

'আজ তুমি অনেক কাজ করেছ, এস তোমার পা টিপে দিই একটু' বলতে বলতে প্রভা আমার পায়ের কাছে এসে বসতেই তন্দ্রা ভেঙে গেল; তাড়াতাড়ি পা টেনে নিয়ে বললাম, 'না — না, মোটেও আমার পা টিপতে হবেনা নিজে একটু আরাম করতো। একটু কাজ করেছি তো হয়েছেটা কি? তুমি তো সারাদিন ধরে এত এত কাজ করছ।' আকাশের দিকে একনজর দেখে বলি, 'রাত বোধহয় সাড়েদশটা কি এগারোটা হবে। এতক্ষণে তোমার রান্নাঘরের পর্ব শেষ হল?' 'কি করব, দাদা তো এতক্ষণে খেতে এলেন। কার সঙ্গে যেন কি কাজে গিয়েছিলেন। ওঁর জন্যে সত্যি আমার বড় কষ্ট হয়। এত ভালমানুষ। কারোকে কিছু বলেন না, সারাটা দিন খেটে চলেছেন।' খাটের ওপর বসে পা দোলাতে দোলাতে প্রভা বলে, 'ওঁকে খাইয়ে বাসন মেজে রান্নাঘর ধুয়ে, সকালের জোগাড় করে—খুব গরম লাগছিল তাই একটু স্নানও করে নিলাম।'

'তাই বল, তাই তো বেশ ফরসা কাপড় পরে দিব্যি রাণী সেজে আসা হয়েছে। কেমন যেন নতুন নতুন লাগছিল তাই, আবার খাসা গন্ধও পাচ্ছি, কি আতর মেখেছ শুনি?' প্রভাকে কাছে টেনে নিই আমি।

প্রভা লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে চেয়ে বলে 'একটুখানি খস আতর ছিল, খুব ইচ্ছে হল তাই' তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে ওঠে, 'সত্যি বলছি আজ আমার খুব ইচ্ছে করছে তোমার একটু পা টিপে দিই। তুমি যখন বালতি ভরে ভরে ওপরে জল আনছিলে তখনি আমি ভাবছিলাম, এখন তো জিদ করে সমানে বালতি টানছে এরপর রাত্রে কষ্ট পাবে।'

কত ভাবে আমার জন্য প্রভা! মনটা নরম হয়ে এল, ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলি, 'না প্রভা, এই বয়সে একটু কাজ করলে যদি কষ্ট হয় তাহলে বাবুজীর মত বয়সে কি দশা হবে? দেখেছ তো এখনও বিশসের করে গম দুহাতে দুই থলিতে ভরে বাজার থেকে নিয়ে চলে আসেন।'...আজ গরমও ছিল খুব।

আজ সন্ধ্যা থেকেই মনে হচ্ছিল খুব গরম পড়েছে, তাই নিচে থেকে বালতি ভরে ভরে অনেক জল এনে সারা ছাদে ছড়িয়েছি। আমার শোবার জন্য যে জায়গাটা বেছে নিয়েছি সেটায় তো আড়াল আছে। আমার ঘর আর রাস্তার দিকের আলসের মাঝখানে যে সরুমত খোলা জায়গাটুকু আছে সেইখানেই শুই আমরা। এটা এমন একটা কোণের দিকে যে বিশেষ দরকার না পড়লে কেউ এদিকে আসবে না তাই কারো চোখে পড়ার আশঙ্কা থাকেনা। ভাইয়া আর ভাবী শোয় অন্যদিকে, ওদের একটা আড়াল লাগাতে হয়। অমর, কুঁয়ার মা বাবুজী সবাই সিঁড়ির সামনে একেবারে খোলা ছাদে শুয়ে ঘুমোন। আজ আমি কেবল ছাদেই জল দিইনি, সারাদিন যে খাটিয়াগুলো ছাদে রোদে পড়ে ভাজা ভাজা হয় সেগুলোর ওপরেও এক এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছি। তাই এখন ওগুলো একটু ঠাণ্ডা রয়েছে। ভিজে খাটিয়ায় শুধু একটা বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে শুয়ে আমি আকাশ দেখছিলাম। সারা আকাশে তারার আলপনা, মাঝে মাঝে এক একটা তারা

একটা জলন্ত আলোর রেখা টেনে খসে পড়ছে কোন মহাশূন্যে। অবাক হয়ে আমি ভাবছিলাম একটা তারা খসে গেল, এটা দেখতে আমার সময় লাগল মাত্র এক মুহূর্ত কিন্তু বাস্তবে ঐ তারাটার অন্য কোন সৌরমণ্ডলে পৌঁছতে হয়ত কত সহস্র আলোকবর্ষ সময় লেগেছে। এমন যদি সম্ভব হত, মানুষ তার এই জীবনেই ঐসব নক্ষত্রলোকে যাত্রা করে দেখে আসতে পারত ওখানকার জীবনটা কিরকম? তারপরই মনে হল নিজেদের এই পৃথিবীর সম্বন্ধেই কিছু জানিনা এদিকে নক্ষত্রলোকের খবর নেবার সাধ হচ্ছে। সেদিন শিরীষভাই তো বলেই দিলেন জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুনিয়াকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তো অনেক পরের কথা, অন্যেরা ইতিমধ্যে যা করে ফেলেছে সে সব বিষয়েও তো আমরা কিছুই জানিনা...'।

এইসব ভাবতেই ভাবতেই ঘুম এসে গেল। তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম নীচের তলায় বাসনপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ, টুকরো টুকরো কথার আওয়াজ, আন্দাজ করতে চেষ্টা করছিলাম কে এল, কে গেল সংসারের পাট সারা হতে আর কত দেরী। ছাদের অন্য কোণে ভাবী তার বাচ্চার সঙ্গে কথা বলছে তারও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমাদের যখন আলাদা বাড়ি হবে তখন ছাদে কিভাবে শোওয়া হবে? কিন্তু সেখানে তো লনও থাকবে...।

'কি এত ভাবছ শুনি?' কনুই দিয়ে হালকা একটা ঠোকর মেরে বলল প্রভা। ওর হাতখানা আপনা থেকেই এসে গেল আমার পায়ে। ওর কণ্ঠস্বরে তন্দ্রা ভেঙে একটু চমকে উঠে হাই তুলে বলি, 'তোমার খাওয়া দাওয়া হল?'

'হয়েছে নিশ্চয়, তোমার সে খোঁজে কি দরকার?' একটু নালিশের সুরে বলে ও। ওর গলার সেই আন্তরিকতা ভরা অসহায় নালিশের সুরে আমার মনটা যেন গলে গেল। বললাম, 'প্রভা তুমি এরকম ভাব কেন বল তো? এ বাড়ির অসুবিধাগুলো তো তুমিও জান, আমিও জানি। আমার কত যে ইচ্ছে করে, আমরা দুজনে একসঙ্গে খেতে বসব। প্রফেসর হয়ে যখন আমরা আলাদা বাড়িতে থাকব তখন দেখো তোমাকে কোনরকম নালিশ করার সুযোগই দেবনা। এখানে তো তোমার খাওয়া হয়েছে কিনা সেটা কারোকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করারও উপায় নেই। এ নিয়েই তাহলে আবার একটা হাঙ্গামা বেধে যাবে।'

প্রভা খিলখিল করে হেসে উঠল, 'আরে, আমিতো ঠাট্টা করছিলাম। আজ তো আমি তোমার চেয়েও ভাল খাবার খেয়েছি — পায়েস, লুচি, হালুয়া। তোমরা যা একটু একটু পেয়েছিলে সেগুলো কি তোমাদের জন্য হয়েছিল নাকি?'

রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে ওর মিষ্টিগলার হাসি ভারি ভাল লাগল, মনে হল যেন ছোট্ট ছোট্ট রূপোর কতগুলো ঘন্টা বাতাসের দোলায় বেজে উঠে দূর দূরান্তরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দুজনারই মনে পড়ে গেল বাবুজীর সেদিনকার তিরস্কার, ওর হাসির উচ্ছ্বাস থেমে গেল মাঝপথেই। ওর মনটা অন্যদিকে ঘোরাবার উদ্দেশ্যে আমি প্রশ্ন করি, 'কেন, আজ কি ব্যাপার? আমি তো ভাবছিলাম কারো বাড়ি কোন বিয়ে-থা ছিল হয়তো তাই পাঠিয়েছে।'

এতক্ষণে খেয়াল হল, 'আমার আস্তে আস্তে কখন থেকে যেন প্রভা সত্যি আমার পা টিপতে শুরু করেছে। ওর হাত চেপে ধরে বলি, 'তোমার কি হয়েছে বল তো? আমি বলেছি না, এসব আমার ভাল লাগেনা? তুমিই তো সারাটা দিন গরুর মত খেটে চলেছ। পা টিপতে হলে, আমারই উচিত তোমার পা টিপে দেওয়া।' তারপর একেবারে প্রসঙ্গ পালটে ফেলে বলি, 'কিসের জন্য আজ এত আয়োজন বললে না তো? মামাজী কোথাও অমরের বিয়ে একেবারে স্থির করে ফেলেছেন নাকি?'

'না গো সেসব কিছু নয়', প্রভা খুব বিজ্ঞের মত বলে, 'আজ আমরা ব্রত করলাম যে— আমি, ভাবী আর ও পাশের বাড়ির অবস্থীজীর বউ...'

'তাই বল, সেইজন্য আজ এত পতিসেবার ঘটা' আমি ঠাট্টার সুরে বলে উঠি, 'তা ব্রতটা কিসের জন্য দেবী?' 'যে জন্যই হোক না কেন, তোমার অত খোঁজে কি দরকার? এ সব মেয়েদের ব্যাপার', আমি পাছে রেগে যাই তাই যেন বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে ও, 'তুমি ভাল করে পড়াশোনা করবে, বড় চাকরি করবে তার জন্য আমারও তো কিছু করা উচিত, তাই না?

কথা বলতে বলতে পা টিপে চলেছে প্রভা। বেশ আরাম লাগছে কাজেই হাত সরিয়ে নেবার জন্য জিদ করিনা। বাহুতে মাথা রেখে প্রভার দিকে পাশ ফিরে বলি, 'তুমি এর আগে কি কিছু কম কাজ করছিলে যে এখন আবার তারওপর ব্রত, পূজোপাঠ আরম্ভ করছো? নিজের শরীরের দিকেও তো মাঝে মধ্যে একটু নজর দেওয়া দরকার। এইসব করতে গিয়ে যদি অসুখে পড় তখন আমার তো ওষুধ কিনবারও পয়সা জুটবে না।'

প্রভা মাথা-ঝাঁকিয়ে বলে, 'ওমা, ব্রত করলে আবার অসুখ করে নাকি? ওতে শরীর ভাল থাকে। উপোস করা শরীরের পক্ষে কত উপকারী তা জান তুমি?'

আমি একটু রুক্ষভাবে বলি, 'হতে পারে, কিন্তু আমার এসবে বিশ্বাসও নেই আর এসব কথা শুনতেও ভাল লাগে না।' নিজের রুক্ষস্বরে নিজেই চমকে উঠে কথাটা একটু ঘুরিয়ে নিলাম,'ব্রত করে যদি খাওয়া দাওয়া ভাল হয় — ফল দুধ, মেওয়া এসব খাও তাহলে উপকার হতে পারে। সারাদিন জলস্পর্শ করবেনা এটা কি ব্রত হল না শাস্তি?'

প্রভা কথা ঘোরাবার জন্য বলে, 'রোজ রোজ তো কেউ ব্রত করে না, ছ'মাসে বা বছরে দু একবারই তো করা হয়'...।

'কথাটা ছ'মাস বা একবছরের নয়, আমার এইসব বুজরুকিতে বিশ্বাস নেই। তুমি যে এসবে বিশ্বাস কর তাতো বলনি কখনো? একসময়ে আমি এসব খুবই বিশ্বাস করতাম, নিয়মিত মন্দিরে যেতাম, পূজো-মানত করতাম। কিন্তু এখন এ সবে আর একেবারেই বিশ্বাস নেই।' হয়তো শিরীষভাই আর দিবাকরের সংস্পর্শে এসেই এটা হয়েছে, নিজের মনেই ভাবলাম।

প্রভা একটু ভারি গলায় বলল, 'বিশ্বাস তো আমিও করিনা, কিন্তু একবাড়িতে থাকতে গেলে ইচ্ছে না থাকলেও অনেককিছুই করতে হয়। ভাবী করছে, অথচ আমি

যদি না করি তাহলে কতরকম কথা উঠত ভাব তো! যাকগে, একটা শুভচিন্তা করে ব্রত করেছি, এখন তাই নিয়ে তুমি আর তর্ক তুলোনা', আবার আমাকে বোঝানোর সুরে বলে ওঠে, 'একটা সঙ্কল্প করলে সেটা যাতে স্মরণে রাখতে পারি এইজন্যেই তো ব্রত করা, আর কিছু নয়।'

'কিছু নয় না আরো কিছু!' বেশ রাগ হচ্ছে আমার। যা পছন্দ করিনা তাই করা হচ্ছে, আবার আমাকেই জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে, 'আমি বলে দিচ্ছি, এসবে আমার কোন বিশ্বাস নেই। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর আবার এই ...'

এবার আমার পায়ের ওপর টপ টপ করে ঝরে পড়ল অশ্রুর ফোঁটা, 'দোহাই তোমার, আজ কিছু বলোনা, কালকে না হয় যত ইচ্ছে বকে দিও'।

কান্না আর মিনতিভরা সুরে ওর এই কথাগুলো সহসা যেন আমার মনে একটা আবেগের জোয়ার এনে দিল, ওকে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে। এত গ্লানিবোধ হতে লাগল এই ভেবে যে, বেচারি মেয়েটা আমার জন্য, আমাদের দুজনের ভবিষ্যতের চিন্তায় সারাদিন উপোস করেছে আর আমি কিনা ওকে বকাবকি করছি? কোন আজে বাজে উদ্দেশ্য নিয়ে তো ব্রত করতে যায়নি। আর তাছাড়া কারো যদি ওসব ব্যাপারে বিশ্বাস থাকেই, তাতে কি এমন যায় আসে? এটুকু সহ্য করে নেওয়া যায়না? কারো নুন ভাল লাগে কারো বা চিনিই পছন্দ। কিন্তু জোর করে ঘাড় ধরে কারোকে চিনিই পছন্দ করাতে হবে, এটা কি উচিত কাজ? আমি সত্যিই মাঝে মাঝে বেশ বাড়াবাড়ি করে ফেলি।

প্রভা বেশ কিছুক্ষণ ধরে কাঁদল। আমি সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিলাম, 'আরে, তোমাকে তো একটু খ্যাপাচ্ছিলাম। এই সব সামান্য সামান্য কথা নিয়ে এত দুঃখ পাও কেন বলতো? অনেক কিছুই করতে হয় শুধু লোকদেখানোর জন্য এটা কি আর বুঝি না আমি?' কিন্তু ওর গাল বেয়ে নেমে আসা অশ্রুর ফোঁটাগুলো ক্রমাগতই আমার বুকে ঝরে পড়ে পড়ে আমার বুকের পাঁজরগুলোকেও ভিজিয়ে দিচ্ছে। বুঝতে পারছি এ অশ্রু দুঃখেরও নয়, ক্ষোভেরও নয়, এ অশ্রু জীবনের সার্থকতা আর কৃতার্থম্মন্যতার। ওর মনে যে উচ্ছ্বাস জেগেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি প্রভার নেই। নিজের অস্তিত্ব আর জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস পর্যন্ত ও আমাকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। আমারও চোখের পাতা ভিজে এল। প্রভার দেহের আতরের সুগন্ধ আমার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। আমার মনে হচ্ছিল এমন একটি স্ত্রী পেলে কে না সুখী হবে? ঝাপসা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম মাথার ওপরের আকাশ তারার মেলায় ঝলমল করছে...এক পলকের জন্য হঠাৎ মনে হল ঐ তারারা সব আমাদের এই সুখলগ্নটির সাক্ষী রইল, ওরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবছে? ওদের মধ্যে কোন একটি নক্ষত্রে হয়তো আমাদেরই মত কোন দুটি নরনারী তাদের গৃহের ছাদে সারাদিনের ব্যর্থতার গ্লানি আর ক্লান্তির বোঝা হালকা করছে পরস্পরের সান্নিধ্যে, তাদের আকাশে যে সব নক্ষত্র উঠেছে তার মধ্যে

হয়তো আছে আমাদের এই পৃথিবীও...ঠিক এই মুহূর্তটিতে তারাও হয়তো ঠিক এই কথাই ভাবছে। আচমকা যেন একটা অদ্ভুত উপলব্ধি ঘটল— এই তারায় খচিত মহাকাশ, এই চতুর্দিক এই-সব কিছু যেন আমারই অস্তিত্বের অংশ, আমারই আত্মার বিস্তার, এই সব কিছুর মধ্যেই আছি আমি। প্রভার কানের পাশে, গালের ওপর আদর করে চলেছে আমার হাত, ওর ওষ্ঠে, অধরে, চোখের পাতায় ঝরছে আমার চুম্বন...'না প্রভা, আর কেঁদনা, দেখ এদিকে...এখন আর কাঁদেনা...'।

বাচ্চাটার কি কষ্ট হচ্ছে কে জানে, আজ রাতে খুব কাঁদছে। হঠাৎ ভাইসাবের গর্জনে আমার তন্দ্রা ছুটে গেল। উনি ভাবীকে বকছেন, 'চুপ করাতে না পার তো ফেলে দাও রাস্তায়। ওদিকে নিয়ে যাও আমাকে ঘুমোতে দাও এখন।' বাবুজীরও বোধহয় ঘুম ভেঙে গেছে। ভাবী মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বাচ্চার কান্না থামাবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ ঘুমের চেষ্টা করেও আর ঘুম এল না। নিজের মনেই প্রশ্ন করলাম 'কটা বাজল কে জানে?' প্রভাও জেগে উঠেছে। আমার ভোরে বেরোতে হয় বলে ওকেও তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হয়। বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে থেকে নিজের ঘড়ি বের করে দেখে ও বলল 'এখন তো সবে দেড়টা বেজেছে।' 'তাহলে ঘুমোও এখন' বলে আবার আমি শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে থাকলাম। আন্দাজে আন্দাজে সপ্তর্ষি আর ধ্রুবতারাকে চেনবার চেষ্টা করছি, এই সময় লক্ষ্য করলাম আকাশের একটা দিক যেন একেবারে আলো হয়ে উঠেছে, কোথাও যেন দ্রুত উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠেছে আর তারই আভা ছড়িয়ে পড়েছে ঐ দিকের আকাশে। আমার মনে পড়ে গেল আগে এখানে এয়ারোড্রোমের সার্চলাইটের আলো দেখা যেত। একটুক্ষণ পর পরই যেন একটা তীব্র আলোক সারা আকাশভরা অন্ধকারকে লেহন করে করে ফিরত। রেলওয়ে ইঞ্জিনের হুইসল আর ট্রেনের দূর থেকে ভেসে আসা ঝিক-ঝিক শব্দে আমার মনে পড়ে গেল সেই রাতের কথা যে রাতে আমি ঘরের মধ্যে লণ্ঠনের আলোয় বসে পড়ছিলাম 'সোরাব ও রুস্তম' আর অভিমানিনী প্রভা পড়েছিল ঘরের এক কোণায়। মনে হচ্ছে সে দিনগুলো যেন কতকাল আগে পিছনে ফেলে এসেছি।...এর পরের গ্রীষ্মকালে এই সময়ে কোথায় শুয়ে থাকব কে জানে! আমরা যখন আলাদা থাকব তখন আমাদের জীবনযাত্রার ধরণটা কেমন হবে কে জানে। শিরীষের কথাগুলো প্রভাকে জানাতে খুব ইচ্ছে করছে।

প্রভার বাহুতে হাত রেখে বলি 'ঘুম আসছে না প্রভা' প্রভাও সম্ভবত জেগেই ছিল। বলল 'তাহলে গল্প কর না! কিন্তু তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লে ভোরে ঘুম ভাঙবে না। তোমার সেই বন্ধুর কথা তো শুনিনি অনেকদিন?'

'কার কথা বলছ, দিবাকরের?' আমি উৎসাহিত হয়ে বলি, 'ওর ওয়াইফ কতবার বলেছে তোমাকে নিয়ে যেতে। তুমি তো যেতেই চাও না। একদিন চলো না? আর জানো, শিরীষভাইও এখন ওখানেই আছেন।'

'শিরীষভাই আবার কে? সেই যাঁর বোন...তিনি নাকি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ তিনিই। বেচারি কি মুশকিলেই পড়েছেন। ডাক্তারেরা বলে দিয়েছে ওঁর বোন আর সারবে না। কাল উনি যে সব কথা বললেন তাতে আমার চোখ খুলে গেছে।'

ঘুম যখন আসছে না, প্রভাকে এই সময়ই না হয় ওঁর কথাগুলো বলা যাক। আমি বলতে শুরু করি, 'সারাটা পথ আমরা তো প্রথমে একান্নবর্তী পরিবার নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সবাই একত্রে বাস করার উনি একান্ত বিরোধী। ওঁর মতে, এর ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না। মানুষ নিজের প্রতিভা এবং ক্ষমতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেনা। শুধু তাই নয়, নিজেদের মধ্যে এত কলহ বিবাদ, বদলা নেওয়ার প্রবৃত্তি, এইসব মাথা চাড়া দেয় যে মানুষ নিজের কর্তব্যপালন করতেও ভুলে যায়। আলাদাভাবে থেকে নিজেকে গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যপালন করে যাওয়া কি সম্ভব নয়? আচ্ছা তুমিই বল, আমরা একসঙ্গে থেকেও কি কর্তব্যপালন করতে পারছি? মনের মধ্যে ক্রমাগত তিক্ততাই কি বেড়ে উঠছে না? এখন তো না হচ্ছে কর্তব্যপালন, না থাকছে সদ্ভাব। আলাদা থাকলে হয়ত দুটোই বজায় রাখা সম্ভব, যদি তা নাও হয় অন্তত একটা তো থাকবেই।

প্রভা অপলক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়েছিল, বলল, 'কথাটা তো ভুল মনে হচ্ছে না।'

'আমিও ঠিক এই কথাই বলেছি ওঁকে প্রভা। আমি বলেছি, কথাগুলো তো ঠিকই মনে হচ্ছে, কিন্তু আত্মা যে মানতে চায়না। মনে হচ্ছে এটা বোধহয় ঘোর স্বার্থপরতা হবে। তখন তিনি মন, আত্মা, সংস্কার এসব নিয়ে অনেক কথা বললেন। ওঁর বক্তব্য, আত্মা বলে কোন বস্তু নেই। চিরাচরিত অভ্যাস, প্রভাব, গতানুগতিক আচার আচরণের ধারা, অনুকরণ এইসব মিলেমিশে মনের মধ্যে একধরণের সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে বসে যায়। এই সংস্কারই সবকিছু নতুন কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর আমরা মনে ভাবি আমাদের আত্মা ভিতর থেকে আমাদের বারণ করছে। আত্মা যেন দরজায় বাঁধা পোষা কুকুর, অচেনা লোক দেখলে লাফাবে ঝাঁপাবে, ঘেউ ঘেউ করবে আব চেনালোক দেখলে ল্যাজ নাড়বে। যে মাংস খায়না তার আত্মা মাংস খেলে ক্রুদ্ধ হবেন, আবার পেঁয়াজ খেতে যার মানা, সে জানে তার আত্মা পেঁয়াজের বিরোধী। অর্থাৎ যারা মাংস বা পেঁয়াজ খায় তাদের বোধহয় আত্মা থাকেই না, আত্মা কেবল কিছু বিশেষ মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি। অথবা সংস্কারেরই অন্য নাম আত্মা। এক সময় ছিল যখন কলের জল পান করলে গোঁড়া পণ্ডিতদের আত্মা কান্নাকাটি করত, হাত ধোবার মাটিও তাঁরা নিজেদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। তাহলে এটাই কি মেনে নিতে হবে যে পুরোনকালেই কেবল আত্মার অস্তিত্ব ছিল? আসল কথা হল প্রাচীন প্রথাগুলোকে আঁকড়ে থাকতে চাওয়া, এবং নতুনকে স্বীকার না করতে পারার মূঢ়তা ও আলস্য — এইটিকেই আমরা আপন 'অন্তরাত্মা' নাম দিয়ে ফেলেছি। আসলে এটা সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং সংস্কারের স্বরূপটি একবার চিনতে শিখলে সংস্কারের পরিবর্তন ঘটানোও আমাদের পক্ষে সম্ভব।'

আমি কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা তুলে এইসব বলে যাচ্ছি আর অবাক হয়ে শুনছে প্রভা। ওকে এইভাবে যদি মাঝে মাঝে এ সব বিষয় বলতে পারি তাহলে ও কতকিছু শিখে যাবে। কোথাও একটা সুবিধেমত কাজে লেগে গেলে, একটু সময় করে ওকে আমি নিজেই তো পড়াতে পারি। এরপর যখন আমাদের চারপাশে কতসব বি.এ. এম.এ. ডিগ্রীধারী লোক থাকবে, তাদের স্ত্রীরাও নিশ্চয় খুবই শিক্ষিতা হবেন। প্রভাকে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, কাজেই ওকে এটু পড়ানো খুবই দরকার। এগুলো ধরা যাক তারই মানসিক প্রস্তুতি। তারপর কলেজে যখন ভর্তি হবে তখন তো কথাই নেই। এখন অন্তত শিরীষভাইয়ের সঙ্গে দেখা করাতে যে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম সেটা তো দূর করা যাক। ওকে বেশ কিছুক্ষণ সময় দিলাম চিন্তা করে প্রশ্ন করবার। ও বলল, 'শুনে তো সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু আজই যদি বল ঘুরিয়ে শাড়ী পরে, ঘোমটায় মুখ না ঢেকে তোমার সঙ্গে রাস্তায় বেরোতে হবে তাহলে আমার তো সাহস হবেনা বাপু।'

কথাগুলো ও বুঝতে পেরেছে দেখে ভারি আনন্দ হল। বললাম, 'তাহলেই বোঝ, একেই তো বলা হচ্ছে সংস্কার, তাই না? শিরীষভাই এই সব সংস্কার অথবা অন্তরাত্মা সম্বন্ধে একটা খাসা উদাহরণ দিয়েছেন। উনি বললেন, 'মনের মধ্যে চেপে বসে থাকা সংস্কারকে ট্রেনের কামরায় আরামে বসে থাকা যাত্রীদের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভরাভর্তি কামরার মধ্যে ঢোকার চেষ্টা কর, ভিতরের প্রতিটি লোক চেষ্টা করবে ধাক্কা মেরে তোমাকে বাইরে রাখতে, কিছুতেই যাতে ভিতরে না ঢুকতে পার। কিন্তু তোমারও প্রয়োজন ভিতরে আসা, তাই ধাক্কাধাক্কি করে কোনমতে তুমি ঢুকবেই। যেই তুমি ঢুকলে তখনি তুমি স্বীকৃতি পেয়ে গেলে, সব বিরোধ চুকে গেল। তুমিও হয়ে গেলে ওদেরই একজন। কিছুক্ষণের মধ্যে অবস্থাটা এইরকম দাঁড়াবে — যে স্থানটুকুর জন্য তোমাকে এত যুদ্ধ করতে হয়েছিল সেটুকু এখন তোমারই জন্য সুরক্ষিত, একটু এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে এলেও ঠিকই থাকবে। কিন্তু এইখানেই রয়েছে আর এক বিপদ। যেই তুমি ভিতরের লোকেদের সঙ্গে একদলের হয়ে গেলে তখন থেকে তুমিই আবার নতুন আগন্তুক যাত্রীদের বাধা দিতে শুরু করবে। একটু আগে তোমার সঙ্গেও যে ঐরকম ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা তুমি বেমালুম ভুলে যাবে...'।

এবারে প্রভা এই প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন না করে হঠাৎ একেবারে অন্য প্রশ্নে চলে গেল, 'তোমার এই শিরীষভাই কোন জিনিসগুলোকে স্বীকার করেন সেটাই এখন আমার জানতে ইচ্ছে করছে। এত ইচ্ছে হচ্ছে ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে, কিন্তু লজ্জাও করছে। কি কথা বলব ওঁর সঙ্গে? আমার তো বোধহয় মুখ দিয়ে কথাই বেরোবে না।'

'তা কেন? আমি নিশ্চয় আলাপ করিয়ে দেব।' আমি বললাম। তারপর প্রভার প্রশ্নের জবাবে জানালাম যে আমিও শিরীষভাইকে ঠিক ঐ প্রশ্নই করেছি। বলেছি, শিরীষভাই, আপনি তো সব কিছুরই বিরুদ্ধে, কোন জিনিসটার স্বপক্ষে আপনি, তা বলুন তো? খুব হেসে উঠে শিরীষভাই জবাব দিয়েছেন, 'ঈশ্বর, ধর্ম, অন্তরাত্মা আর

সংস্কার বাদ দিলে আর যা কিছু থাকে আমি মানি।' আমি বললাম, 'অর্থাৎ আপনি কিছুই মানেননা'। তাতে ওঁর জবাব, 'যা কিছু মানবার মত বিষয় তা যদি শুধু ঐ চার পাঁচটা শব্দের পৈতৃক সম্পত্তি হয়, তাহলে বুঝে নাও যে সত্যিই আমি কিছু মানিনা।' আমি আরও উসকে দিই, 'তা কি করে সম্ভব? কোন কিছুতেই বিশ্বাস না থাকলে মানুষ নিজেকে কি করে বিকশিত করবে? কোনদিকে যাবে সে?' উনি উত্তর দিলেন, 'যে কোন অবস্থায়, যে কোন স্থানে মানুষ নিজেকে বিকশিত করতে পারে, পুরাতনকে পিছনে ফেলে সে নবীনকে গ্রহণ করে — এইটে মেনে নিলেই যথেষ্ট। মানুষের পায়ের গঠন সামনের দিকে এগিয়ে চলার উপযুক্ত, তা এইজন্যই যে তাকে সামনে এগিয়ে চলতে হবে। বলা হয়ে থাকে, ভূতেদের পা নাকি পিছন দিকে, অর্থাৎ অতীতকে নিয়ে যারা বাঁচতে চায় তারা ভূত। সত্যি কথা যদি শুনতে চাও, যাকে তোমরা ভারতীয় সংস্কৃতি আর ভারতীয় গরিমা এই সব বলে থাক — আমার মনে হয় সেগুলো সব একধার থেকে ঐ অতীতজীবী ভূতেদের সভ্যতা আর সংস্কৃতি ওর কোন কিছুতেই আর আমার বিশ্বাস নেই।' তারপর, বুঝলে প্রভা, উনি এমন একটা কঠিন কথা বলে দিলেন যে আমার একেবারে রক্ত গরম হয়ে উঠল। ওঁকে নেহাৎ খুবই শ্রদ্ধা করি, না হলে হয়তো মেরেই বসতাম। কোনরকমে হজম করলাম কথাটা।'

প্রভা যেন একটু উদ্বেগ আর ঔৎসুক্য মিশিয়ে প্রশ্ন করল, 'কথাটা কি?'

উনি বললেন, 'বুঝলে সমর, আমার তো মনে হয় আমরা সকলেই ঐ সব মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর ঠগ আর নপুংসকদের সন্তান যারা অতীত নিয়েই বেঁচে থেকেছে। নিজেদের যুগ আর নিজেদের সমাজের সমস্যাগুলো সম্বন্ধে তাদের কোন হুঁশই ছিলনা। সারা দুনিয়া থেকে নিজেদের পৃথক করে রেখেছে তারা, নিজেরাই নিজেদের কপালে চন্দনের তিলক পরিয়ে নিজেদের পূজো করে চলত আর ভাবত, আহা, কি মহান আমরা! আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি, ওরা যাঁদের পূজো করত, যাঁদের 'হিরো' বানিয়েছিল তাঁরা কি জন্য মহান, আর কিসের জন্য 'হিরো' বলে সম্মানিত? এইজন্যই তো যে তাঁরা নিজেদের যুগ ও সমাজের সমস্যাগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন বুক ফুলিয়ে, আত্মবিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হয়ে তারা নেমেছিলেন তাঁদের যুগের চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে। বসে বসে রামনামের সংকীর্তণ করে তাঁরা 'হিরো' হয়ে যাননি।' আমি ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, 'সে যাই হোক নিজেদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে এসব কথা চিন্তা করতে ভাল লাগেনা। তাঁরা যেমন ছিলেন, ভালই ছিলেন।' শুনে শিরীষভাই বললেন, 'তুমি একথা বলতে চাও তো বল, কিন্তু আমি তো নিজেকে পর্যন্ত গালাগাল দিই এইজন্য যে কিছুই কেন করতে পারিনা? আমাদের এইসব পূর্বপুরুষেরা তো ঐ গোবরসংস্কৃতির পুরাতত্ত্বশালা। আমরা তাদের সন্তান, স্রেফ খড়ের পুতুল — হয় পুড়ে মরি আর নয়তো আবর্জনার মত জায়গা জুড়ে পড়ে থাকি, যা একদিন পুড়িয়ে ছাই করে সাফ করে ফেলা হবে। কিছুই যদি না পারি তো অন্তত এটুকু চেষ্টা করা উচিত যে, আমাদের মধ্যে যে এক

আধটা লোহা বা সোনার টুকরো আছে তাদের আমাদের ঐ জ্বলে মরার আগুনে তপ্ত করে ইস্পাত বা জড়োয়াতে পরিণত করে দিয়ে যাই।'— বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাই। শিরীষভাইয়ের প্রভাব আমাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে! আজকাল আমি যেন আর নিজের ভাষায় চিন্তাও করতে পারিনা। মাথার ভিতরটা সমস্তক্ষণ যেন ছেয়ে রেখেছেন শিরীষভাই। সেই প্রভাবকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করি, 'ওঁর রাগ দেখে মাঝে মাঝে আমারও যেন ঝোঁক চেপে যায় — মনে হয় আমিও এইভাবে ভাবতে পারি না কেন? কোনো বিষয় আমাকে ওঁর মত এত বেশী বিচলিত করেনা কেন? আমি যেন ক্রমশঃ জড়বস্তু হয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে কষ্ট হয় এই ভেবে যে বেচারা বড় দুঃখী, বড় বিপদগ্রস্ত, সেই জন্যেই সবকিছুর ওপর এমন ক্ষেপে উঠেছেন। কিন্তু সে যাই হোক, ওঁর কথা এবং কথা বলবার ভঙ্গি আমাকে প্রভাবিত করেছে গভীরভাবে।' বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে মনে মনে আমি ওঁর কথাবলার ভাবভঙ্গি কল্পনানেত্রে দেখতে থাকি।

হঠাৎ মনে হল প্রভা বোধহয় কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা বেচারী সারাদিন খেটে খেটে ক্লান্ত, ঘুমোক এখন। শিরীষভাইয়ের কাছ থেকে ফেরার পথে আমার কেমন লাগছিল মনের সেই অবস্থাটা ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। আমার অতীতে যা কিছু ঘটে গেছে সেসব তখনকার মত আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, সেসব যেন আমার জীবনের ব্যাপারই নয়। নতুন নতুন শোনা কথাগুলোই গুঞ্জিত হচ্ছিল মাথার মধ্যে। মনে হচ্ছিল যেন আমার মাথার মধ্যে কতগুলো অন্ধ কুঠুরী হাজার বছর ধরে বন্ধ পড়েছিল — শিকল তোলা, ধুলো আর আবর্জনায় ভরা, গুমোট ভ্যাপসা গন্ধ, মাকড়শার জাল, কে জানে কত কি আজেবাজে জিনিস ভরা তারমধ্যে। কুঠুরীগুলোর বদ্ধ বাতাস যেন বিষাক্ত, তার শূন্যতা যেন নিজেকেই গিলে খেতে আসছে। আজ কে এসে ভারী বুটপরা পায়ের সজোর ধাক্কায় খুলে দিয়েছে সেই অন্ধ কুঠুরীর দরজা, বুকচাপা গুমোট গন্ধ বেরিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। কত বছরের জমাট ধুলো প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় তুলে উড়তে শুরু করেছে, তার তীব্র গুঞ্জন শুনে মনে হচ্ছে যেন মৌমাছির চাকে ঢিল মেরেছে কেউ। বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে আমি আপনমনে বলে উঠেছিলাম, 'আজ থেকে আমি আর অতীতজীবি ভূত নই। আমার ভবিষ্যৎ এখন সমস্তরকম আবর্জনামুক্ত। কিন্তু এবার এই খালি কুঠুরীগুলোতে কোন স্বপ্নগুলোকে সাজাব? সে কোন স্বর্গলোকের সঙ্গীত এখন বাজবে ভৈরবী রাগিনীতে? সে কোন উদার বিশাল ভবিষ্যৎ, যার দিকে আমরা তালে তালে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলব ছোট ছোট পদক্ষেপে? কোথায় সে যুগ, কত দূরে? আমাদের জীবনকালে সে কি এসে পৌঁছবে, তাকে কি দেখতে পাব সত্যিই? যার প্রতীক্ষায় কেটেছে কত বিনিদ্র রাত, সে যখন আসবে তাকে চিনে নিতে পারব তো?

যুগ পরিবর্তনের আশায় সেই অধীর চঞ্চলতাকেই আমি যেন মুক্তি দিতে চাইছিলাম কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে, তাই বালতি ভরে ভরে জল এনে ছাদসিঞ্চনের অত উৎসাহ। এখন

আবার প্রভার কাছে সেইসব কথা বলতে বলতে চঞ্চল হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু কি করা যায়? প্রভা বোধহয় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। একবার ভাবলাম খাটিয়ার দড়ি থেকে একটা পাতলা আঁশ বের করে নিয়ে ওর কানে সুড়সুড়ি দিই। আমি জেগে বসে আছি আর উনি দিব্যি ঘুমোচ্ছেন! হঠাৎ মনে হল ওর কোমরে সুড়সুড়ি দেওয়া যাক, আমি জানি কোমরে সুড়সুড়ি দিলেই ও একেবারে ছটফটিয়ে উঠে পড়বে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেও পারে, সে ভয় আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইচ্ছেটা এত দুর্নিবার হয়ে উঠল যে শুরু করলাম ওর কোমরে আঙুল চালিয়ে সুড়সুড়ি দিতে, 'এই প্রভা, ওঠ ওঠ, আমি গল্প করছি আর তুমি বেশ ঘুমিয়ে পড়লে?'

'এই, কি হচ্ছে কি?' প্রভা ধড়ফড় করে উঠল, 'কে বলল আমি ঘুমোচ্ছি?'

আমি হয়ত আরো সুড়সুড়ি দিতাম কিন্তু হঠাৎ আমার হাতে ঠেকল ওর কোমরে গোলমত কি একটা বাঁধা, সম্ভবত সুতো দিয়ে বাঁধা আছে। দু আঙুলে সেটা ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি গো?'

'কিছু না, কিছু না, ছেড়ে দাও' প্রভা যেন ঘাবড়ে গিয়ে অনুনয়ের সুরে বলে উঠল।

'তবে তো মোটেই ছাড়ব না, আগে বল এটা কি?' হাতে টিপে টিপে বোঝবার চেষ্টা করি বস্তুটা কি? একটা সুপারীর মত কিছু মনে হচ্ছে।

প্রভা আমার হাতটা সরাবার চেষ্টা করতে করতে বলে, 'দোহাই তোমায়, ছেড়ে দাও, কিছু নয় ওটা।' কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নয়। ও এমন ব্যস্ত হয়ে বারণ করছে বলেই আমিও কেবলই জানতে চাইছি। শেষে ও বলে 'আমার পেটে কষ্ট হয়, তাই মা ওষুধ দিয়েছেন।'

বাজে কথা! আমি একটু কড়াসুরে বলি 'ওষুধ বাঁধতে হয়না, খেতে হয়। ঠিকঠাক বল, না হলে ছিঁড়ে ফেলে দেব কিন্তু।'

'আমার মাথার দিব্যি, ওরকম কোরনা,' ও মিনতি করতে থাকে।

আমার রাগ চড়ে যাচ্ছে, এবার গর্জে উঠি, 'বলবে কি না?' এবার ও খুব ভয়ে ভয়ে জানায়, ভাবী আর মা দুজনেই কিছুতেই কথা শোনেনি, ও বলেছে 'এ সবে আমার বিশ্বাস নেই,' তাতে ওরা গালাগালি করেছে। ওদের সন্তুষ্ট করতে এটা পরতে হয়েছে।

আমি কথার মধ্যেই বলে উঠি, 'ওদের মন রাখতে ব্রত করতে হল তা তো বোঝা গেল, কিন্তু ওটা কি জন্য তা স্পষ্ট বলছ না কেন?'

'ওরা বলল...বলল যে,' প্রভা এবার কাঁদ কাঁদ হয়ে তোৎলাতে থাকে। 'কি বলল সেটা বলবে তো?' আমি রাগ আর যেন চাপতে পারছি না।

'ওরা বলল সৈয়দবাবার ধুনি নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে,' প্রভা কোনমতে কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতে নিজের কনুইটা মুখের সামনে আড়াল করছে যেন আমার চড়ের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

আর থাকতে না পেরে ওর দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠি, 'তা পেটের কষ্ট সেরে গেছে এতে? সোজাসুজি বলছ না কেন? অসুখ করেছে তো আমাকে বলতে কি হয়েছিল?'

প্রভা এবার কাঁদতে শুরু করেছে। 'অবস্থীজীর বউ বলেছে ওর বিয়ের চারবছর পরে সৈয়দবাবার ধুনীর ছাই থেকেই ওর প্রমোদ জন্মেছে...'

ব্যাপারটা বোঝা গেল, ওর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে এবার আমি পাগলের মত হেসে উঠি। 'এই ব্যাপার! এরই জন্য এত ব্রত উপবাস। সৈয়দপীরের পূজো দেওয়া? কাপড়ে আতর লাগানো?' এত জোরে দাঁতে দাঁত ঘষছি যে নিজেই শুনতে পাচ্ছি। 'বাচ্চার শখ?...নিজেদের খাওয়া পরার সংস্থান নেই, তার ওপর ট্যাঁকে একটা ঝোলাতে হবে?'...বলতে বলতে একটানে সেই ধুনীর ছাইয়ের পুঁটলি কোমর থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিই রাস্তায়। কত আকাশে প্রাসাদ গড়ছিলাম এতক্ষণ...আসলে তো এই...।

বাকি রাতটা নিষ্ফল ক্রোধে পুড়তে পুড়তে আমি মাথা ঠুকছিলাম খাটের কিনারায় আর প্রভা কাঁদছিল হাঁটুতে মুখ গুঁজে, 'তুমি বলে দাও কি করব আমি? সারাটা দিন ওরা আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে...বাঁজা, বাঁজা — কেবল এই কথা বলে খোঁটা দেয় মা আর ভাবী। ভাবী তো আমাকে ওর বাচ্চার কাছে পর্যন্ত ঘেঁসতে দেয়না। আমার ছায়া থেকেও সরিয়ে রাখে ওর মেয়েকে...।'

মাথা ঠুকে ঠুকে কেবলই ভাবছি, কত নিঃসঙ্গ আমি। ভেবেছিলাম প্রভা আমার সঙ্গিনী হবে, কিন্তু এই...এই...এই সেই প্রভা যে একবার গণেশঠাকুর দিয়ে বাসন মেজে ফেলেছিল...আর আজ? এরই ওপর ভরসা করে আমি কত বড় বড় স্বপ্ন রচনা করছিলাম.. ?

দশ

'সকাল থেকে এমন করে বসে আছ যে? আজ কি কাজকর্ম নেই? কলেজে যাবে না আজ?' প্রভা এসে খুব নরম গলায় জিজ্ঞাসা করে।

আমি প্রেস থেকে ফিরে খুব মনমরা আর উদাসভাবে বসেছিলাম ছাদের আলসেতে। ঘরের দেওয়ালের পাশে এ জায়গাটায় ছায়া আছে — চুপচাপ, কারো সঙ্গে কথা বলা বা কথা শোনার প্রয়োজন হয়না। বসে বসে দেখছিলাম কাঠবিড়ালি কুট কুট করে কি যেন খাচ্ছে। আমার মুখখানা বোধহয় খুব শুকনো আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাই প্রভা

কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখল জ্বর হয়েছে কিনা? আমি শূন্যদৃষ্টিতে প্রভার দিকে চেয়েছিলাম, মুখে কথা ছিলনা। সেদিনের ব্যাপারটা আমার ভিতরে যেন কি একটা বস্তুর শিকড় আলগা করে দিয়েছে। আজকাল আমার চারপাশের কোন কিছুকেই যেন সত্য বলে ভাবতে পারিনা। মনে হয় মিথ্যা আর ছলনা দিয়ে তৈরী একটা সীমাহীন জালের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, একটা ফাঁস যেই কেটে বাইরে আসতে চাই তখনি আর একটা ফাঁস সামনে এসে যায়। এই প্রভা — এও শেষে ঐ একই রকম? একে নিয়েই আমি সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিলাম? ওর দিকে তাকালেই এই প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ওঠে।

কোন কথা না বলে নিচের উঠোনের দিকে দেখতে লাগলাম। সেখানে নানারকম চুড়িতে ভরা বিরাট এক ডালা রাখা রয়েছে। এপাশে ওপাশে ময়লা কাপড় গোঁজা যাতে চুড়িগুলো ভেঙে না যায়। সবুজ, নীল, সোনালী লাল কত রংএর চুড়ি মালার মত করে গেঁথে সাবধানে শুইয়ে রাখা। চুড়িওয়ালী বসেছে একটু আড়ালে, ঝুঁকে পড়ে দেখলে তবে তাকে দেখা যায়। নীলচে ফুল পাতার নকশা তোলা উল্কিতে ভরা তার হাত দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। উল্কি আঁকা হাত দুখানা যে হাতখানিতে চুড়ি পরাচ্ছে সে হাত ভাবীর তা বুঝতে পারছি, ওর বুড়ো আঙুলের পিছনে একটা কালোদাগ আছে।

আমার এরকম মৌনতায় প্রভা বেশ ঘাবড়ে গেছে। ঐখানেই মাটিতে বসে পড়ে আমার কাঁধে হাত রেখে বলে ওঠে, 'কথা বলছ না কেন? আমার দিব্যি, বলনা কি হয়েছে? কারো সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি?'

'কিছু হয়নি', নীরস শুষ্কস্বরে জবাব দিই, তারপর ঐ ভাবেই বসে থাকি। শূন্যদৃষ্টিতে যে দিকে এতক্ষণ তাকিয়েছিলাম সেই দিকেই তাকিয়ে থাকি। অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা প্রশ্নটা এখন হঠাৎ আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে — এবার?...এবার কি হবে?

'তবুও শুনি?' প্রভা একটু অধীর, আমার হাত ধরে নাড়া দিয়ে আন্তরিক মিনতি ভরা গাঢ়স্বরে বলে ওঠে, 'এখনও সেই কথা নিয়ে রাগ করে বসে আছ?' ওর আধফোটা পদ্মকলির মত চোখদুটি থেকে গলিতরজতধারার মত নেমে আসে অশ্রুর ধারা। ক্ষমা প্রার্থনা আর অনুনয় ভরা দৃষ্টিতে ও চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে। ওর ভিজে গলার করুণ স্বরে আমি আস্তে আস্তে মুখ ফেরাই, তারপর আবার দৃষ্টি সরিয়ে নিই অন্যদিকে। চাপাগলায় বলে উঠি, 'প্রভা, আমার চাকরিটা গেছে'।

'চাকরি গেছে? কেন?' চমকে ওঠে প্রভা, এক পলকের মধ্যে বোধহয় ওর চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে ওঠে এর দারুণ পরিণাম।

এরই মধ্যে নিচে থেকে মায়ের ডাক শোনা যায়, 'বউমা ও বউমা', খুব স্নিগ্ধসুরে আহ্বান, 'একবার নিচে নেমে আয়তো বিটিয়া।'

প্রভা একটু ঝুঁকে সাড়া দেয়, 'যাই মা' আমি এবার বলি, 'এমনিই। শালা বলে কিনা প্রথম পনের দিন তো কাজ শিখেছ, সেইসময়ের জন্য তাই কিছু পাবেনা। মাইনের

কাগজে লিখতে হবে পঁচাত্তর, কিন্তু দেওয়া হবে ষাটটাকা। এই নিয়েই ঝগড়া হয়ে গেল।' আমি বেশী বিচলিত ভাব না দেখিয়ে প্রভাকে বললাম, 'নামেই পার্টটাইম, কাজ তো একেবারে পুরো, তারওপর আবার এইসব।'

'কেন? এরকম করবে কেন? পঁচাত্তর লিখিয়ে ষাট টাকা দিতে এসেছে! তুমি দিবাকরকে গিয়ে বললে না কেন? ওর বাবার তো খুব বন্ধু সে লোকটা!' প্রভার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে, 'কি সর্বনাশ হল বল তো!'

'সর্বনাশ তো বটেই' বড় দুঃখেই ঠোঁটের ওপর একটা করুণ হাসি ফুটে ওঠে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলি, 'ওদের আর কি বলব গিয়ে! একটা কিছু তো করতেই হবে। কাল শেষবারের মত যাব একবার। পনের দিনের মাইনে — তাই সই, ব্যাটা কিছু তো দিক। এই চাকরির ভরসায় তো রাজ্যের ধার করে বসে আছি, যেখান থেকে হোক সেগুলো তো শোধ দিতেই হবে।'

মায়ের গলা আবার শোনা গেল, 'আরে, কি করছিস কি, এখনও এলিনে? পরেই কথা বলিস না হয়', কি আশ্চর্য, এবারেও মায়ের গলার স্বর বেশ মোলায়েম স্নেহমাখা।

'মা সেই থেকে ডাকাডাকি করছে, যাচ্ছ না কেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'কি করি বলতো? চুড়ি পরতে ডাকছেন। আজকাল তো আমার ওপর খুব দরদ কিনা,' প্রভা বিব্রতভাবে বলে।

'হুঁ', আমি গম্ভীর হয়ে যাই, শক্তগলায় বলি, 'না প্রভা, আর চুড়ি টুড়ি নয়। আর কোন মিথ্যে আশা করা চলবে না, কারো কাছে কিছু নিওনা...।' আমার মুখ একেবারে ভাবলেশহীন।

আবার মায়ের ডাক আসাতে বাধ্য হয়ে প্রভা করুণ চোখে চাইতে চাইতে আনমনা ভাবে নিচে নামতে লাগল, মাঝপথ থেকে ফিরে এসে মৃদুগলায় সান্ত্বনা দিল, 'অত ভেবোনা তুমি, চাকরি গেছে তো যাক, তাই নিয়ে এত মন খারাপ কবলে কি চলে? আমার ঘড়ি রয়েছে সোনার চুড়ি কানের দুল আছে এসব আর কবে কাজে লাগবে? পরে না হয় আবার গড়িয়ে নেব। পড়েই তো থাকে সিন্ধুকের মধ্যে, রোজ রোজ কি আর গয়না পরা হয়? একটু পরে এসে বের করে দেব। পড়া তো চালিয়ে যেতেই হবে...' বলতে বলতেই ফিরে চলে যায়। অন্যসময় হলে ওর এই কথায় আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করতাম, চোখে জল এসে যেত হয়তো, কিন্তু এখন শুধু শুনেই গেলাম, কিছু যেন ভাবতে পারছিনা, শুধু বসেই আছি একভাবে।

নিচে থেকে মায়ের আদরের বকুনি শোনা গেল, 'আমার কি এটুকুও জোর নেই তোমাদের ওপর? মনহারিন তুমি দাও তো পরিয়ে ওকে। বল না কি রকম চুড়ি পরবি? নিজেই পছন্দ কর।' অর্থাৎ প্রভা নিচে পৌঁছে গেছে।

'না-না মা, আমার ইচ্ছে করছে না। ওপরে এসে দেখনা, আমার বাক্সে কত চুড়ি রাখা আছে...' প্রভার গলা।

'আরো চারটে না হয় পরলেই গো — চুড়ি তো সবাইকার কাছেই আছে। আমাদেরও তো পেট চালাতে হবে?' চুড়িওয়ালীর সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির আওয়াজ শোনা গেল। চুড়ির মালাগুলো খুলে খুলে ও চুড়ি দেখাচ্ছে আরো কিছু কিছু টুকরো কথা ভেসে আসে — 'খুব মানাবে — এই রকম হাতে...ফরসা ফরসা হাতেই তো এমন চুড়ির বাহার খোলে...'।

ভাবীর গলা শোনা গেল এবার, 'পরে নে না প্রভা, কেন যে আপত্তি করছিস — মার কথা রাখতে অন্তত পরে ফেল।'

এরপর আর কোন শব্দ নেই। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করছি ওদের কথা শোনার জন্য। আমার বিশ্বাস প্রভা চুড়ি পরবে না। আহা, এখন সব আদর করে চুড়ি পরানোর কথা ভাবছেন, এতদিন প্রভা যে আছে সেটাই কারো খেয়াল থাকত না। একটু ঝুঁকে নিচে তাকালাম। মা আর ভাবীর চুড়ি পরা হয়ে গেছে, ওরা বেশ প্রসন্ন উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছে প্রভাকে। প্রভা হাঁটুর ওপর হাত রেখে চুড়িওয়ালীর দিকে বাড়িয়ে রেখেছে অন্য হাতখানা পায়ের পাতার ওপর রাখা, সে হাতে একরাশ চুড়ি পরানো হয়ে গেছে। অন্য হাতের মুঠি চেপে চেপে মনহারিন চুড়ি পরাচ্ছে। কয়েকটা আস্ত চুড়ি আর ভাঙা চুড়ির টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। ব্যথা লাগছে বলে প্রভা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে চোখ বুজে, মুখে দুচারবার শোনা যাচ্ছে উঃ আঃ। অন্য হাতটা দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলটা কষে চেপে ধরে আছে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ের একটা ধারালো তীর যেন মস্তিষ্কের সবকটা স্তর চিরে দিয়ে চলে গেল। 'বারণ করেছিলাম না আমি!' নাকের ডগা ফুলে উঠে একটা ঝড়ের মত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল আর এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম আমি। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ হচ্ছে আর ঠোঁট কামড়াচ্ছি। দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এসে দাঁড়ালাম চুড়িওয়ালীর সামনে।

প্রভার চুড়িপরা শেষ, দু হাতের কব্জী রঙীন কাচের দীপ্তিতে ঝলমল করছে। আমাকে দেখেই যেন ইলেকট্রিক শক লাগল ওর, ভয়ে মুখ সাদা হয়ে গেল। চেষ্টাকৃত একটা বিব্রত হাসি মুখে এনে কোন মতে উচ্চারণ করল, 'দেখ, কেমন লাগছে, মা আর ভাবী পছন্দ করেছেন...' ভাবী আর মায়ের সামনে ও যে আমার সঙ্গে কথা বলেনা সেটাও তখন আর ওর মনে নেই।

তীব্র কঠিন দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে দেখলাম, তারপর এক ঝটকায় ওর চুড়িপরা দুই কবজী চেপে ধরলাম। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল প্রভা। সেই সময় আমার দুই হাতে যেন কোন এক দুর্দান্ত দৈত্য এসে ভর করেছিল। আমি ওর দুই হাতের কব্জী সজোরে একসঙ্গে ঠুকে দিলাম আর দুই হাত মুচড়ে সমস্ত চুড়িগুলো মড়মড়িয়ে করে দিলাম চূর্ণ বিচূর্ণ। অজস্র চুড়ির টুকরো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। আকাশের দিকে মুখ তুলে আমি পাগলের মত হেসে উঠলাম অট্টহাসি। একটা পোকাকে যেন কচলে মেরে ফেলে দিলাম এইরকম একটা ভঙ্গিতে আমি ছেড়ে দিলাম প্রভার হাতখানা। আমার

হাতের তালু আর আঙুলে অনেক চুড়ির টুকরো ফুটে গেছে, হাত রক্তে মাখামাখি প্রভারও দুই কব্জী দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। রক্ত দেখে হাসি আমার আরো বেড়ে গেল। এবার এদিক ওদিক দেখে বেশ নিশিন্ত আরামের ভঙ্গিতে হাত দোলাতে দোলাতে উঠে এলাম ওপরে। পিছন ফিরে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি চুড়িওয়ালী, ভাবী, মা সবাই চক্ষু ছানাবড়া করে চেয়ে আছে আমার দিকে।

বাবুজী প্রতীক্ষা করেছিলেন অনেকক্ষণ, ভাবছিলেন আমি নিজে থেকেই কিছু বলব। শেষ পর্যন্ত হার মেনে নিজেই রাত্রে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই তো দশ তারিখ থেকে কাজ শুরু করেছিলি, তাই না সমর?'

আমি বেপরোয়া ভাবে জবাব দিলাম, 'বাবুজী, সে চাকরি চলে গেছে।'

মা মাঝখান থেকে বলে বসল, 'তা তোর কাছে কি কেউ কিছু চেয়েছে যে চাকরি চলে যাওয়ার খবর দিচ্ছিস?'

আমিও উদ্ধতসুরে বলে উঠলাম, 'স্পষ্ট করে চায়নি বটে, তবে সবারই মতলব আমার বেশ জানা আছে।'

বাবুজী এবার যেন ক্ষেপে গেলেন। হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জানা আছে তো কি ফাঁসিতে ঝোলাবি নাকি? ওঃ ভারি আমার জাননেওয়ালা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম তার সোজা উত্তর দেওয়া নয়, একেবারে যেন কামড়াতে আসছে। নে, কি করবি কর!' মাথায় হাত চাপড়ে তারপর বলে উঠেন, 'আমি তো তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি বাবা, আমারই চোখের ওপর তো বড় হয়েছ। কি সাহস দেখ ছেলের, চাওয়ার খোঁটা দিচ্ছে। ওরে, আমরা প্রথম রোজগারের টাকা এনে বাপের হাতে দিতাম, সে সব আদবকায়দা তো চুলোয় গেছে, উল্টে চাওয়া নিয়ে খোঁটা দিচ্ছে ছেলে হারামী কোথাকার! তোকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম এইজন্যে যে তোর হাতেই শেষপর্যন্ত মানইজ্জত খোয়াতে হবে? একেবারে মাথায় চড়ে বসেছে। সাদাসিধে একটা কথা বলতে গেলাম তা খ্যাপা কুকুরের মত তেড়ে কামড়াতে এল একেবারে?'

এবার আমি সংযতস্বরে একটু দুঃখিত ভাবে বলি, 'বাবুজী, আমি কি এমন বললাম যে এত রেগে উঠলেন?'

'ওহে নবাবপুত্তুর, তুমি আবার বলবেটা কি? আমরা কি অন্ধ? চোখে কিছু দেখি না? লেখাপড়া শেখা হয়েছে, বিয়ে-থা হয়ে গেছে, ব্যস এখন আর বাপ মায়ের দরকার কি? জাহান্নামে যাক, চুলোয় গিয়ে মরুক সব! তুমি তোমার আমোদ ফূর্তি ছাড়বে কেন?' তারস্বরে কথা শোনাতে থাকেন উনি।

'বাবুজী আমি তো বলেছিলাম এখন আমার বিয়ে দেবেন না। তখন তো আপনারাই জোর জবরদস্তি করে...'

শোরগোল শুনে বাড়ির সবাই এসে জমা হয়েছে। ভয়ে ভয়ে এক জায়গায় ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে দেখছে।

'বিয়ে...বিয়ে...বিয়ে!' আর কিছু বলবার মত খুঁজে না পেয়ে তীব্র বিতৃষ্ণার সঙ্গে

বার বার বলতে থাকেন কথাটা। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছেন বাবুজী। যদি জানা থাকত যে এইরকম দাঁড়াবে তুমি বড় হয়ে, তাহলে জন্মাবামাত্র জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম। কি অবস্থা করে তুলেছে! লেখাপড়া শিখিয়ে হাতির মত বড় করা হল এখন আমারই বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে। এই হল দুনিয়ার রীতি বুঝলে তো? এমনি করেই পূর্বপুরুষদের নাম উজ্জ্বল করতে হয়। এখন তো ডানা গজিয়েছে, বাড়ির সঙ্গে আর কিসের সম্পর্ক? নিজের মর্জি মত চলতে আর বাধা কি? অন্যেরা চেঁচায় তো চেঁচাক, কুকুর তো, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্লান্ত হয়ে চুপ করবেই।...সকালে চুড়ি পরানো, তা লাট সাহেব ভেঙে শেষ করলেন। তোমার আর তোমার বউ এর ওপর আর কারো কোন অধিকার আছে নাকি? ঈশ্বর স্বয়ং বোধহয় তোমাকে এনে নামিয়ে দিয়েছেন এই জগতে। আমি আবার ভাবছিলাম, নিজে মুখে আমাকে বলতেই বা হবে কেন? বুদ্ধিমান ছেলে, সবই তো বোঝে। কিন্তু বোঝাবুঝির কোন ধার ধারেনা এ ছেলে, নিজের খাওয়াদাওয়াটি তো বেশ ভালই চলছে কিনা! নিজের পড়া চলছে, কাপড় চোপড় আসছে, বউএর সাজগোজের জিনিস আসছে...। শুধু নিজেদেরটুকু হলেই হল, ব্যস। কেউ কিছুই বলছে না দেখে ক্রমেই একেবারে মাথায় চড়ে বসা হচ্ছে।'

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করি, 'বউয়ের সাজগোজের জিনিস কি এনেছি আমি?'

'কেবল মুখের উপর কথা, কেবল জবাব দেওয়া...?' রাগের চোটে তোৎলাচ্ছেন বাবুজী। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সহসা উনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমার ওপর, ভাইসাব আর অমরও ওঁকে আটকাতে পারল না, আমি নিজেকে বাঁচাবার আগেই লাথি, চড় ঘুঁসির বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল। হাঁফাচ্ছেন আর প্রহার করে চলেছেন — 'নে, নে, আর জবাব দিবি? দে আর কত জবাব দিবি দেখি — বুড়ো হয়েছি, মরতে বসেছি, কিন্তু এখনও তোকে ঢিট করতে পারি। তুই একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস...' চুপচাপ মার খেলাম, ভিতরটা রাগে যেন পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুখে একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি। এতেই সম্ভবত ওঁর ক্রোধাগ্নিতে আরও ঘি পড়ছিল — আমি কাঁদছি না, নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টাও করছি না। ভাইসাব আর অমর দুজনে মিলে বাবুজীকে ধরে ফেলেছে, কিন্তু ওরা নিজেরাই ভয়ে কাঁপছে ঠক ঠক করে।

'বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে — দূর হয়ে যা চোখের সামনে থেকে — কুয়ো পুকুর যেখানে হোক ডুবে মরগে যা। হতচ্ছাড়া বজ্জাত কোথাকার! কত তামাশা চলছে সব লক্ষ্য করে যাচ্ছি আমি — লেখাপড়া শুরু করেছেন উনি...'

'বাবুজী এবার চুপ করুন, আর রাগ করবেন না, শান্ত হোন,' ভাইসাব বোঝাবার চেষ্টা করেন। ওরা ওঁকে দুদিক থেকে ধরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, রাগের ঝোঁকে মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে ওঁর, চোখ কপালে উঠে গেছে আর মুখে কটূক্তির বর্ষণ চলেছে অজস্রধারায়। মেয়েরা কোনমতে কান্না চেপে ফিস-ফাস করছে, 'কি হল কি?' 'কি

বলেছে?'— সম্ভবত প্রতিবেশিনীরাও কেউ কেউ এসে গেছে। তাদের আঁচল ধরে এসে হাজির হয়েছে শিশুরাও, এবং এখানকার দৃশ্য দেখে তারা কান্না জুড়ে দিয়েছে।

'হ্যাঁ বাবুজী, এবার চলেই যাব আমি' আস্তে আস্তে মাথা তুলে ভারী গলায় বলি আমি। কথাটা শোনামাত্র বাবুজী ওদের দুজনকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে আবার আমার ঘাড়ে এসে পড়লেন — 'সেটা তো আগেই জানতাম, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। আমরা যদি সত্যিই তোর বাপ মা হই তো বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা এখনি, এই মুহূর্তে! তোর নিজের সুবিধেমত যাবি কেন — আমিই তোকে রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি। ফেলে দাও — ওর জিনিসপত্তর সব বের করে দাও — বিদেয় করে দাও দুটোকেই। ওরা আমাদের কেউ নয়। আমাদের কাছে ওরা জন্মেই মরে গেছে। যাও, ওঠো, নিজেদের জিনিসপত্তর নাও, নিয়ে বিদায় হও — এই হাতজোড় করে বলছি।' সজোরে একটা তালি বাজিয়ে উনি জোড়হস্ত হলেন। এরপর আমার বাহু ধরে এক হ্যাঁচকাটান মেরে বলে উঠলেন, 'অনুগ্রহ করে এবার বিদেয় হোন, আমার এখানে আপনাদের জায়গা হবেনা আর। খবরদার, যদি আর কোনদিন এ বাড়িতে পা দিয়েছো। তাহলে দেখে নেব আমি। যেখানে ইচ্ছে মর গিয়ে, রাস্তায় পড়ে থাক, আমার কিচ্ছু যায় আসেনা, ষাঁড় পোষা আমার কর্ম নয়।' ততক্ষণে ভাইসাহেবরা আবার ধরে ফেলেছেন ওঁকে এবং বুঝিয়ে সুঝিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

মেয়েরা সবাই আমাকে ছি ছি করছে। মা আমাকে দুটো চাপড় মেরে বলল, 'তুই চুপ করে কি থাকতে পারিস না সমর? মুখ খুলবি না একেবারে। সমানে বাপের মুখে মুখে জবাব দিয়ে যাচ্ছে,...নির্লজ্জ কোথাকার।'

কারো কথায় কান না দিয়ে এবার আমি গর্জে উঠলাম, 'খুব হয়েছে মা থাম। স্পষ্ট করে শুনতে চাইছিলাম, আজ শোনা হয়ে গেল। এই নরকে আমি নিজেও আর চাইনা থাকতে। রাতে ঘুম নেই, দিনে শান্তি নেই! মা বাপ হয়েছেন সব নিজের স্বার্থ দেখতে। কুয়োয় হোক, চুলোয় হোক যেখানে হোক গিয়ে পড়ব। কালই চলে যাব...নিজেদের রাজ্যপাট নিয়ে থেক তোমরা।' রাগ অশান্তি আর হৈ হল্লার মধ্যেও ভিতরে ভিতরে কিন্তু অনুভব করছিলাম যে আমি অনুচিত কথা বলছি, মা, বাপের সঙ্গে এ ভাবে কথা বলা উচিত নয়। এই ঘটনাটায় মনের মধ্যে আর একটা অদ্ভুত চিন্তা এল — মনে হল, রামসীতাও হয়তো এমনি এক কলহের পর ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলেন। নিজের মনেই একটু হাসি পেল কথাটা ভেবে।

আমার কথা কানে যেতেই বাবুজী আবার তেড়ে আসছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে ছাড়ল না। ওঁকে বাইরে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে মনে মনে শপথ নিলাম— কুয়ো, চুলো, পথ — ফুটপাথ যেখানে হোক পড়ে থাকব, কিন্তু এখানে আর নয়, কিছুতেই নয়। যেখানে হোক, যেমন হোক — মাথার ওপর ছাদ আর নিচে মাটি থাকলেই হল — কিন্তু এই নরকে আর নয়। ভিক্ষা করব — চুরি করব...দুনিয়া অনেক বড়...।

কান্নাকাটি থেমে গেছে, ঘরে বাইরে সবাই একসঙ্গে মিলে আমায় তিরস্কার করে চলেছে, আমার অসভ্যতার নিন্দা করছে কিন্তু আমি একেবারে চুপ করে বসে আছি হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে। মাথার মধ্যে গুঞ্জন করছে একটি কথা — এখানে নয়... এখানে নয়। বিশ্বের কোন এক কোণে, ধরণীর কোন এক প্রান্তে — যেখানে হোক। একটা ছবি কেবলই ভেসে উঠছে চোখের ওপর — টিনের তোরঙ্গ হাতে আগে আগে চলেছি আমি আর জড়োসড়ো পদক্ষেপে পিছনে আসছে প্রভা...তার পিছনে হয়ত ফেরাবার চেষ্টা করতে করতে আসছে কুঁয়ার...(লক্ষ্মণ!! - ?)

লোহার শিকে গেঁথে গেঁথে যেমন করে কাবাব বানায় তেমনিভাবে সারারাত যেন কেউ আগুনে ঝলসাতে লাগল আমায়। কত বিচিত্র শব্দ কানে আসছে, এক পলকের জন্য চোখ বুজতে পারিনি। কিন্তু একটা আচ্ছন্নভাব যেন ছেয়ে রয়েছে আমার সমস্ত চেতনায় — নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি একটা স্তরে আমি পড়ে রইলাম সারাটা রাত্রি। মনে হচ্ছে আমার হৃদপিণ্ডের ওপর কেউ যেন একখানা ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়েছে তাই দমবন্ধ হয়ে আসছে আমার। হার্ট এ্যাটাক হলে কেমন অনুভূতি হয় জানিনা, কিন্তু মাঝে মাঝেই আমার ভয় হচ্ছে বোধহয় আমার হার্টফেল হতে চলেছে। সারা দেহে অদ্ভুত একটা শূন্যতাবোধ, মনে হচ্ছে যেন মমির মত আমাকে একটা খোলসের মধ্যে বন্ধ করে ফেলা হয়েছে। একটা কাঁকড়ার মত কোন জীব যেন তার কাঁটাওয়ালা দাড়াগুলো দিয়ে চেপে ধরে আমার মাথার মধ্যে শুঁড় ঢুকিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত চুষে খাচ্ছে। আমি কাঁদছি আর ছটফট করছি, কিন্তু তার জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দৃষ্টির দ্বারা আমি যেন সম্মোহিত, জীবটা আমাকে খেয়েই চলেছে। মাথার মধ্যে শোঁ শোঁ ভোঁ ভোঁ শব্দ উঠছে, মনে হচ্ছে যেন ডুবে যাচ্ছি। জলস্তরের ওপর আমাকে শুইয়ে ফেলে কেউ যেন বুকে পায়ের চাপ দিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে। সারারাত ধরে মনে হচ্ছে ঘোর বর্ষণ হয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে চমকে উঠে দেখছি বৃষ্টি থামল কিনা।

কে যেন স্পর্শ করল, ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম। কেউ যদি এসে ইঙ্গিত করে তার পিছু পিছু আমি চলে যাব। বহুকষ্টে চোখমেলে দেখতে চেষ্টা করি কে এসেছে। কব্জিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে প্রভা আমার গায়ে হাত দিয়ে জাগাতে এসেছে —'চারটে বেজে গেছে, আজ কি যাবে না?'

এখন মনে হচ্ছে রাত্রে বোধহয় প্রভা অনেকবার আমার মাথায় হাত রেখেছে, কিছু মালিশ করছিল যেন। উঠে বসলাম, মুখ হাত ধুতে ধুতে ভাবছিলাম আজ কেমন যেন একটু অন্যরকম লাগছে সব। আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত সব কাজ করে চলেছি অথচ নিজের ইচ্ছায় কিছু করছি না। আমার হাত পাগুলো যে আমার নিজের নয় ..., আমি যেন দূরে — বহুদূরে উঁচু কোন জায়গায় চলে গেছি। সেখান থেকে সব কিছু খুব অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে, কেমন যেন অস্বাভাবিক। কোনরকম শব্দ শোনা যাচ্ছে না। মুখ ধুতে ধুতে হঠাৎ পিছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম 'রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল নাকি?'

আমি আর প্রভা ছাড়া নিচে কেউ নেই। প্রভা উনুন ধরিয়ে কিছু করছে, আমি রয়েছি কলতলায়। প্রভা একটা পিচবোর্ডের টুকরো দিয়ে উনুনে হাওয়া দিচ্ছিল, সেটা বন্ধ করে বলল, 'বৃষ্টি আবার কখন হল?' ওর এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে পড়ে গেল এ বাড়ি আজ আমি ছেড়ে যাব, এর প্রতি কোন মোহ নেই আমার। বাড়ি খুঁজতে হবে — যেখানে হোক — যত কষ্ট করেই হোক। প্রভা অ্যালুমিনিয়মের ছোট কৌটোতে খাবার ভরে খাটের ওপর রেখে দিয়েছে। রোজকার অভ্যাসমত সেটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরলাম। কোটপরার সময় হাতে এই প্রথম ব্যথা লাগল, কাল যে চুড়ি ফুটে গিয়েছিল তারই ব্যথা।

আলো নিভিয়ে এক পা এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে নামছি, মনে হল পা দুটো যেন কাঁপছে — জুতোর আওয়াজও কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। নিচের সিঁড়ি থেকে পিছন ফিরে দেখলাম প্রভা আমাকে লক্ষ্য করছে কিনা। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। সবাই ঘুমোচ্ছে এখনও।

এই সময় বাইরে কে যেন শিকল নাড়ল, এমন চমকে উঠলাম যেন আমি খুনী আর বাইরে পুলিশ এসেছে। মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, দরজা খুলব কি খুলব না? তারপর মাথা চুলকোতে চুলকোতে এগিয়ে গেলাম।

আবার শিকলের আওয়াজ, সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'টেলিগ্রাম, সাহেব!'

'দরজা খুলি, লাল সাইকেল নিয়ে খাঁকি পোষাক পরা পিয়ন দাঁড়িয়ে আছে তার নিয়ে। সই করে নিলাম। পিয়ন সাইকেল চড়ে চলে গেল। 'তার' বাবুজীর নামে।

অল্প অল্প আলো ফুটছে। টেলিগ্রামখানা একবার উল্টে পাল্টে দেখে প্রথমে ভাবলাম যেমন আছে দিয়ে আসি। তারপর কি জানি কি ভেবে খামখানা খুলে ফেললাম। গোলাপী কাগজেব ওব তারের টাইপ করা খবর সাঁটা রয়েছে — 'মুন্নী একসপায়ার্ড', মুন্নী মারা গেছে!

একবাব পড়লাম, আবার পড়লাম, ঐ ছোট্ট কথা দুটোর মানে বুঝতে পারছি না যেন, কি এর অর্থ? ঐ টেলিগ্রাম শুনেই ভাইসাব আব বাবুজী ঘাবড়ে গিয়ে নিচে নেমে এসেছেন — 'কোথাকার তার?' 'কি লিখেছে?'

আমার মুখে একটা অস্বাভাবিক হাসি ফুটল, কাগজখানা এগিয়ে দিলাম ওদের দিকে। বললাম লিখেছে, 'মুন্নী মারা গেছে। ওকে খুন করেছে তা আর স্পষ্ট করে লেখেনি।'

ওদের কি প্রতিক্রিয়া হল তা আব লক্ষ্য না করেই চলে এসেছি...চেতনাহীনের মত। বাড়িতে নিশ্চয় কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল তখনি। প্ল্যাটফর্ম কোনদিকে পড়বে তা জানি, তাই ইচ্ছে করেই উল্টোদিকে বসেছি, যাতে লোকে যাতায়াত করে বিরক্ত না করে। গাড়ী চলেছে আর আমি জানালা দিয়ে মাথাটা বাইরে করে বিস্ফারিত নেত্রে দেখছি সকালের আলো ফুটছে। — কি অদ্ভুত সকাল আজকের।

মাথার ভিতরটা একেবারে অন্ধকার, এমন নিঃশব্দ যেন ইলেকট্রিকের কারখানায় হঠাৎ ফিউজ উড়ে গিয়ে সব কিছু থেমে গেছে, অন্ধকারে ডুবে গেছে। ট্রেনের একঘেয়ে ঝকর ঝকর শব্দটা মাথায় যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে আর কানের মধ্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত একটানা ধ্বনি উঠছে, মুন্নী মরে গেছে...মুন্নী মরে গেছে...মুন্নীকে মেরে ফেলেছে... মুন্নীকে মেরে ফেলেছে...।

পুরানো গম্বুজের মধ্যে চামচিকেদের পাখার ঝটপটানি যখন একের পর এক প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তোলে শূন্যতার মধ্যে সেই শব্দতরঙ্গ ঘুরে ঘুরে ছেয়ে ফেলে সমস্ত বাতাবরণ...তারপর আবার মৃত্যুর মত স্তব্ধতায় ডুবে যায় সব কিছু — তারপর শুধু অখণ্ড অভেদ্য অন্ধকা...র...

কি হয়েছে আজ আমার! নিজের কপালে হাত বুলিয়ে চাপড় মারি।

হঠাৎ একটা ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গেল ট্রেন। ওদিকে স্টেশন এসে গেছে, আমার নামবার কথা এখানেই। ওদিকে প্ল্যাটফর্মের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম, তারপর বসে বসেই আমার দিকে প্ল্যাটফর্ম দেখতে লাগলাম, এ পাশে আরো তিনটে লাইন চক চক করছে তার ওপারে প্ল্যাটফর্মের অঙ্গন। অন্ধকার আর নেই, কিন্তু স্টেশনের বাতিগুলো জ্বলছে এখনও। সামনের প্ল্যাটফর্মের ওপাশে জমাদার ঝাঁট দিতে শুরু করেছে তার চারপাশে উঠছে ধুলোর কুণ্ডলী। জমাদারের মুখে একটা কাপড় বাঁধা। আমি এমনভাবে বসে আছি যেন নামতেই হবে না। হঠাৎ ট্রেন হুইসল দিল। এতক্ষণে হুঁশ হল, 'আরে নামতে হবে যে।' চট করে উঠে দরজা খুলে নেমে পড়ি নিচে বিছানো খোয়ার ওপরে। পাশের লাইনে পা দিয়েই দেখি অন্যদিক থেকে বোধহয় দিল্লীর গাড়ী আসছে — পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া উঠছে আর ঝকঝকে লোহার রেল লাইন কেঁপে কেঁপে উঠছে। যেন একটা বিরাট দৈত্যের মত ছুটে আসছে ট্রেনটা।

হঠাৎ চিন্তাটা ঝিলিক দিয়ে উঠল — এই ট্রেনের সামনে নিজেকে ফেলে দিই তো কেমন হয়? সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক হাতে সেই দারোগা সাহেবের ছবিটাও খেলে গেল চোখের ওপর, সামনে ছিল ঘোড়াটা — সারা জীবনের সব কষ্টের থেকে মুক্তি —। মনে হল যেন অজানা একটা ইলেকট্রিক শকের ধাক্কায় গিয়ে পড়লাম ইঞ্জিনের সামনে, লাইনের ওপর পড়ে যাওয়ার মুহূর্তের এক ভগ্নাংশে আচ্ছন্ন চেতনার মাকড়শার জালের মত অস্পষ্ট কুয়াশা ছিঁড়ে গেল, যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম...এ কি করলাম? ততক্ষণে বরফের মতো ঠাণ্ডা লোহার লাইনের ওপর আমি আটকে গেছি, এগিয়ে আসা ইঞ্জিনের পাখা আমাকে ছুঁয়েছে...দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে চেপে ধরেছি পাখাটা...প্রভার নিরীহ সুন্দর চোখ দেখতে পাচ্ছি...। কিন্তু ইঞ্জিনের গতিবেগ আমাকে ঘসটে নিয়ে চলেছে... এক মুহূর্ত, দু মুহূর্ত...হাতে আর জোর নেই, হাত ছেড়ে গেল — খুব জোরে ডাকতে চেষ্টা করলাম — প্রভা-আ-আ। আমার খোলা মুখের ওপর দিয়ে ভারী ভারী চাকাগুলো ঘুরতে ঘুরতে ছুটে চলেছে ...।

সমস্ত ছবিটা এত জীবন্তভাবে চোখের ওপর ভাসছে যে ভয় হচ্ছে সত্যিই না এই রকম করে বসি। আমি লাইন থেকে পা সরিয়ে নিয়েছিলাম, আর ট্রেনটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমার সামনেই একটা খালি জায়গা যেখানে দুটো কামরা জোড়া থাকে, মোটা মোটা তার আর ভারী ভারী আংটা থেকে বেরিয়ে আসা ডাণ্ডাগুলো পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে, ঐ দিয়েই কামরাগুলোর মধ্যে একটু দূরত্ব রাখা হয়। এক লালাজী জানলা দিয়ে মুখ বের করে দাঁতন করছেন। দুটো ট্রেনের মাঝখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছি যেন দুদিকের থেকে দুটো দেওয়াল আমাকে ঘিরে ধরেছে।

মনে হল, আচ্ছা ধরা যাক হ্যাণ্ডেল ধরে এখনই যদি ঐ সামনের কামরার দরজাটা খুলে উঠে পড়ি? তারপরেই মনশ্চক্ষে নিজেকে দেখতে পেলাম বোম্বাইতে, বিদেশগামী একটা জাহাজে — পরণে খালাসির পোষাক — কিন্তু একটু পরেই বদলে গেল ছবিটা — পরণে কৌপীন, লম্বা দাড়ি হাতে কমণ্ডলু...আমি যেন বাবা কালী কমলীওয়ালার আশ্রমে কম্বল জড়িয়ে পড়ে আছি — হৃষিকেশের এক মস্ত গাছের তলায় আমার কুটির...কতকাল কেটে গেছে কে জানে, তারপর একদিন বিধবার বেশধারিনী এক নারী আরো কয়েকটি বৃদ্ধার সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে আমার কুটিরের সামনে...। না-না, হর কি পেয়ারীতে স্নানরতা এক মহিলাকে দেখে যেন...'আরে, এ যে প্রভা'— আমি ঠিক চিনেছি প্রভাকে কিন্তু ও আমাকে চিনতে পারছেনা এই দাড়ি আর মোটা কম্বলের জন্য...তারপর আবার দেখছি যেন অনেক লোক আমাকে মারধোর করছে — জুতো আর লাঠি দিয়ে...স্নানরতা এক মহিলার কাছে গিয়ে আমি 'প্রভা-প্রভা' বলে ডাকাডাকি শুরু করেছিলাম।

তারপর এই সব ছবিগুলো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল একটা মস্ত বড় ছবির মধ্যে, ফুটে উঠল — খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে আমার ছবি — 'প্রিয় সমর, বেটা, তোমার মা গুরুতরভাবে অসুস্থ, তোমাকে একবার দেখতে চান।'

সামনের ট্রেনটার হুইসল শুনে যেন তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল — সামনের ট্রেনটার চাকা ঘুরতে শুরু করেছে আস্তে আস্তে — দুটো কামরার মাঝখানে ঐ খালি জায়গাটায় লাফিয়ে পড়ি? একলাফে গিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে একটা কামরায় উঠে পড়লে কি হয়?

আমার পিছনের ট্রেনটাও এবার চলতে শুরু করেছে। দুটো ট্রেন দুই বিপরীত দিকে চলেছে, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সজোরে ঘূর্ণায়মান একটা কুমোরের চাকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি...ভিতর থেকে ক্রমাগত কে যেন বলে চলেছে — লাফিয়ে পড়!...উঠে পড়!...লাফিয়ে পড়!...উঠে পড়...!

দিশাহারা আমি মুখ তুলে চাই ঊর্ধ্বে...সারা আকাশ ঘুরছে বন-বন করে। —

□□